

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ

নবম-দশম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ

নবম-দশম শ্রেণি

রচনা
মুনীর চৌধুরী
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

সম্পাদনা
ইব্রাহীম খলিল
ডেটর কাজী দীন মুহম্মদ
শিবপ্রসন্ন সাহিত্যী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫

পুনর্মুদ্রণ : জুন, ২০১৬

পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৭

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অঙ্গরিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্প্যাদাবোধ জাহাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

কল্পকল্প-২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামূল্ক করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ আমাদের সম্মুখে। তাই সময়, দেশ ও সমাজের চাহিদার প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে পাঠ্যপুস্তকটি উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জিন করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে বাংলা একটি আবশ্যিক বিষয়। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা রাষ্ট্রভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম। মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা বাংলায় দক্ষতা অর্জন করতে হলে এ ভাষায় ব্যবহারিক ও সূজনশীল-উভয় দিকেই শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা থাকা আবশ্যিক। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বাংলা ভাষার ধারণশক্তি ও প্রকাশক্ষমতা বৃদ্ধি করে এর যুগোপযোগী, ভাবোপযোগী ও বিষয়োপযোগী শুল্ক প্রয়োগ করতে হবে; সেজন্য বাংলা ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি। যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে সংশোধিত ও পরিমার্জিত ‘বাংলা ভাষার ব্যাকরণ’ নথীন ও আঞ্চলীয় শিক্ষার্থীদের এ প্রয়োজন অনেকাংশে মেটাতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নয়না প্রশান্তি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আঙ্গরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়		
প্রথম পরিচেদ	ভাষা	১
ছিতীয় পরিচেদ	বাংলা ব্যাকরণ ও এর আলোচ্য বিষয়	৮
দ্বিতীয় অধ্যায়		
প্রথম পরিচেদ	ধ্বনিতত্ত্ব	১৩
ছিতীয় পরিচেদ	ধ্বনির পরিবর্তন	২৭
তৃতীয় পরিচেদ	ণ-ত্ত্ব ও ষ-ত্ত্ব বিধান	৩১
চতুর্থ পরিচেদ	সংজ্ঞি	৩৪
তৃতীয় অধ্যায়		
প্রথম পরিচেদ	পুরুষ ও জ্ঞাবাচক শব্দ	৪৫
ছিতীয় পরিচেদ	দ্বিবৃক্ত শব্দ	৪৯
তৃতীয় পরিচেদ	সংখ্যাবাচক শব্দ	৫৩
চতুর্থ পরিচেদ	বচন	৫৬
পঞ্চম পরিচেদ	পদাশ্রিত নির্দেশক	৫৯
ষষ্ঠ পরিচেদ	সমাস	৬১
সপ্তম পরিচেদ	উপসর্গ	৭২
অষ্টম পরিচেদ	ধাতু	৭৯
নবম পরিচেদ	কৃৎ-প্রত্যয়ের বিস্তারিত আলোচনা	৮৩
দশম পরিচেদ	তদ্বিতীয় প্রত্যয়	৮৮
একাদশ পরিচেদ	শব্দের শ্রেণিবিভাগ	৯৫
চতুর্থ অধ্যায়		
প্রথম পরিচেদ	পদ-প্রকরণ	৯৭
ছিতীয় পরিচেদ	ক্রিয়াপদ	১১২
তৃতীয় পরিচেদ	কাল, পুরুষ এবং কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ	১১৯
চতুর্থ পরিচেদ	সমাপিকা, অসমাপিকা ও যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োগ	১২৫
পঞ্চম পরিচেদ	বাংলা অনুজ্ঞা	১৩২
ষষ্ঠ পরিচেদ	ক্রিয়া-বিভক্তি : সাধু ও চলিত	১৩৬
সপ্তম পরিচেদ	কারক ও বিভক্তি এবং সবক্ষ পদ ও সমোধন পদ	১৪৭
অষ্টম পরিচেদ	অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দ	১৫৯
পঞ্চম অধ্যায়		
প্রথম পরিচেদ	বাক্য প্রকরণ	১৬৩
ছিতীয় পরিচেদ	শব্দের যোগ্যতার বিকাশ ও বাগ্ধারা	১৭৭
তৃতীয় পরিচেদ	বাচ এবং বাচ পরিবর্তন	
চতুর্থ পরিচেদ	উক্তি পরিবর্তন	
পঞ্চম পরিচেদ	যতি বা ছেদ-চিহ্নের লিখন কৌশল	
ষষ্ঠ পরিচেদ	বাক্যের শ্রেণিবিভাগ	
সপ্তম পরিচেদ	বাক্যে পদ-সংজ্ঞাপনার ক্রম	

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচেদ

ভাষা

ভাষার সংজ্ঞা

মানুষ তার মনের ভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করার জন্য কষ্টখনি এবং হাত, পা, চোখ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে ইঙ্গিত করে থাকে। কষ্টখনির সাহায্যে মানুষ যত বেশি পরিমাণ মনোভাব প্রকাশ করতে পারে, ইঙ্গিতের সাহায্যে ততটা পারে না। আর কষ্টখনির সহায়তায় মানুষ মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবও প্রকাশ করতে সমর্থ হয়। কষ্টখনি বলতে মুখগহর, কষ্ট, নাক ইত্যাদির সাহায্যে উচ্চারিত বোধগম্য ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে বোঝায়। এই ধ্বনিই ভাষার মূল উপাদান। এই ধ্বনির সাহায্যে ভাষার সৃষ্টি হয়। আবার ধ্বনির সৃষ্টি হয় বাগ্যঙ্গের দ্বারা। গলনালি, মুখবিবর, কষ্ট, জিহ্বা, তালু, দাঁত, নাক ইত্যাদি বাক্ প্রত্যঙ্গকে এক কথায় বলে বাগ্যঙ্গ। এই বাগ্যঙ্গের দ্বারা উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনির সাহায্যে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যমকে ভাষা বলে।

সকল মানুষের ভাষাই বাগ্যঙ্গের দ্বারা সৃষ্টি। তবুও একই ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির অর্থ বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হতে পারে। এ কারণে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর জন্য আলাদা আলাদা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।

মানুষের কষ্টনিঃসৃত বাক্ সংকেতের সংগঠনকে ভাষা বলা হয়। অর্থাৎ বাগ্যঙ্গের দ্বারা সৃষ্টি অর্থবোধক ধ্বনির সংকেতের সাহায্যে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যমই হলো ভাষা।

দেশ, কাল ও পরিবেশভেদে ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থান করে মানুষ আপন মনোভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বস্তু ও ভাবের জন্য বিভিন্ন ধ্বনির সাহায্যে শব্দের সৃষ্টি করেছে। সেসব শব্দ মূলত নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের বস্তু ও ভাবের প্রতীক (Symbol) মাত্র। এ জন্যই আমরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষার ব্যবহার দেখতে পাই। সে ভাষাও আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়ে এসেছে। ফলে, এ শতকে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে যে ভাষা ব্যবহার করে, হাজার বছর আগেকার মানুষের ভাষা ঠিক এমনটি ছিল না।

বর্তমানে পৃথিবীতে সাড়ে তিন হাজারের বেশি ভাষা প্রচলিত আছে। তার মধ্যে বাংলা একটি ভাষা। ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ মাতৃভাষা। বাংলাদেশের অধিবাসীদের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলাদেশের ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ এবং ত্রিপুরা, বিহার, উত্তরিয়া ও আসামের কয়েকটি অঞ্চলের মানুষের ভাষা বাংলা। এ ছাড়া যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের অনেক দেশে বাংলা ভাষাভাষী জনগণ রয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ত্রিশ কোটি লোকের মুখের ভাষা বাংলা।

বাংলা ভাষারীতি

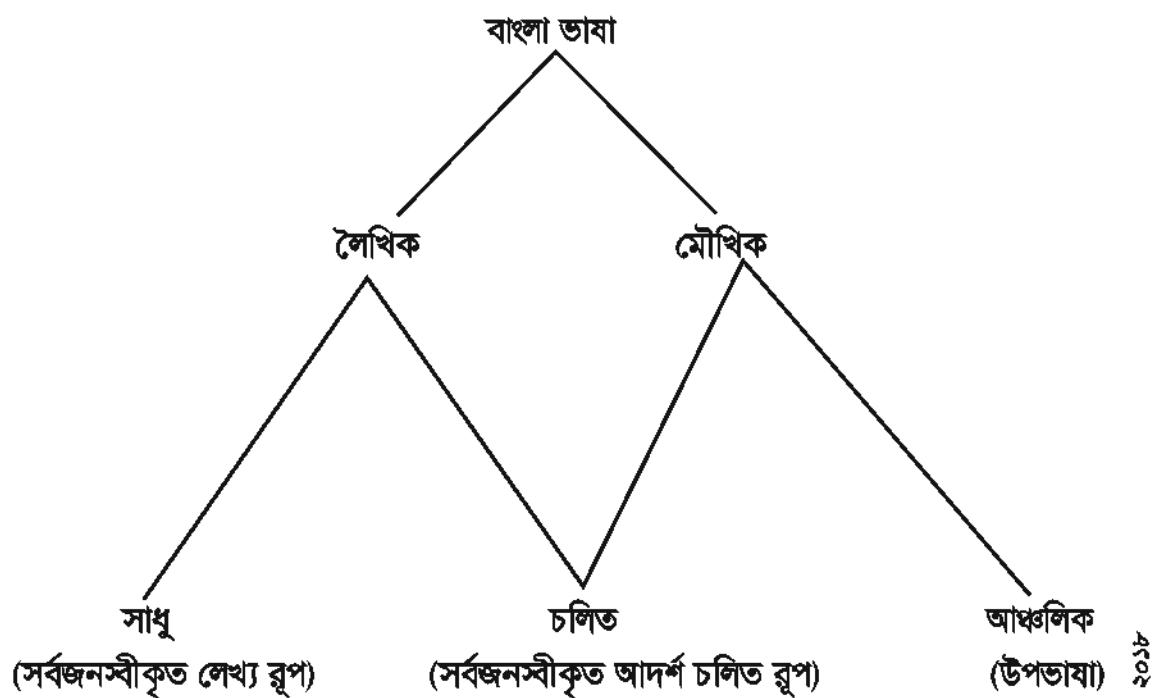
কথ্য, চলিত ও সাধু রীতি

বিভিন্ন ক্ষেত্র অঞ্চলের জনগণ নিজ নিজ অঞ্চলের ভাষায় কথা বলে। এগুলো আঞ্চলিক কথ্য ভাষা বা উপভাষা। পৃথিবীর সব ভাষায়ই উপভাষা আছে। এক অঞ্চলের জনগণের মুখের ভাষার সঙ্গে অপর অঞ্চলের জনগণের মুখের ভাষার যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। ফলে এমন হয় যে, এক অঞ্চলের ভাষা অন্য অঞ্চলের লোকের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাধারণের কথ্য ভাষা দিনাঙ্গপূর্ব বা রংপুরের লোকের পক্ষে খুব সহজবোধ্য নয়। এ ধরনের আঞ্চলিক ভাষাকে বলার ও লেখার ভাষা হিসেবে সর্বজনীন স্বীকৃতি দেওয়া সুবিধাজনক নয়। কারণ, তাতে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাভাষীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। সে কারণে, দেশের শিক্ষিত ও পঞ্জিসমাজ একটি আদর্শ ভাষা ব্যবহার করেন। বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষিত জনগণ এ আদর্শ ভাষাতেই পারস্পরিক আলোগ-আলোচনা ও ভাবের আদান-প্রদান করে থাকেন। বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষার কথ্য রীতি সমন্বয়ে শিষ্টজনের ব্যবহৃত এই ভাষাই আদর্শ চলিত ভাষা।

বাংলা, ইংরেজি, আরবি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার মৌখিক বা কথ্য এবং লৈখিক বা লেখ্য এই দুটি রূপ দেখা যায়। ভাষার মৌখিক রূপের আবার রয়েছে একাধিক রীতি : একটি চলিত কথ্য রীতি অপরটি আঞ্চলিক কথ্য রীতি।

বাংলা ভাষার লৈখিক বা লেখ্য রূপেরও রয়েছে দুটি রীতি : একটি চলিত রীতি অপরটি সাধু রীতি।

বাংলা ভাষার এ প্রকারভেদ বা রীতিভেদ এভাবে দেখানো যায়



সাধু ও চলিত বাচ্চির পার্থক্য

১. সাধু বাচ্চি

- (ক) বাল্লা লেখ্য সাধু বাচ্চি সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে চলে এবং এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট।
- (খ) এ বাচ্চি গুরুগঙ্গীর ও তৎসম শব্দবহুল।
- (গ) সাধু বাচ্চি নাটকের সঙ্গাপ ও বক্তৃতার অনুপযোগী।
- (ঘ) এ বাচ্চিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এক বিশেষ গঠনপদ্ধতি মেলে চলে।

২. চলিত বাচ্চি

- (ক) চলিত বাচ্চি পরিবর্তনশীল। একশ বছর আগে যে চলিত বাচ্চি সে যুগের শিক্ষা ও ভদ্রজনের কথিত ভাষা বা মুখের বুলি হিসেবে প্রচলিত ছিল, কালের প্রবাহে বর্তমানে তা অনেকটা পরিবর্তিত রূপ লাভ করেছে।
- (খ) এ বাচ্চি তত্ত্বব শব্দবহুল।
- (গ) চলিত বাচ্চি সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য এবং বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা ও নাট্যসঙ্গাপের জন্য বেশি উপযোগী।
- (ঘ) সাধু বাচ্চিতে ব্যবহৃত সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ চলিত বাচ্চিতে পরিবর্তিত ও সহজতর রূপ লাভ করে। বহু বিশেষ্য ও বিশেষণের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে।

৩. আঞ্চলিক কথ্য বাচ্চি

সব ভাষারই আঞ্চলিক রূপের বৈচিত্র্য থাকে, বাল্লা ভাষারও তা আছে। বিভিন্ন অঞ্চলে কথিত বাচ্চির বিভিন্নতা সংক্ষিত হয়; আবার কোথাও কোথাও কারো কারো উচ্চারণে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার মিশ্রণও সংক্ষয় করা যায়।

সাধু, চলিত ও কথ্য বাচ্চির উদাহরণ

ক. সাধু বাচ্চি

পরদিন প্রাতে হেডমাস্টার সাহেবের প্রস্তুত লিস্ট অনুসারে যে তিনজন শিক্ষক সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন, তাহারা আটটার পুর্বেই ডাক-বাল্লায় উপস্থিত হইলেন। একটু পরে আবদুল্লাহ আসিয়া হাজির হইল। তাহাকে দেখিয়া একজন শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন— আপনি যে? আপনার নাম তো হেডমাস্টার লিস্টে দেন নাই।

—কাজী ইমদাদুল হক

খ. চলিত বাচ্চি

পুল পেরিয়ে সামনে একটা বাঁশ বাগান পড়ল। তারি মধ্য দিয়ে রাস্তা। মচমচ করে শুকনো বাঁশ পাতার রাশ ও বাঁশের খোসা জুতোর নিচে তেঙ্গে যেতে লাগল। পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় বুনো গাছপালা লতা ঝোপের ঘন সমাবেশ। সমস্ত ঝোপটার মাথা জুড়ে সাদা সাদা জুলোর মতো রাখালতার ফুল ফুটে রয়েছে।

—বিভূতিভূষণ বলদ্যাপাখ্যায়

ওপরের ‘ক’ ও ‘খ’ অনুচ্ছেদ দুটির ভাষার উপাদানে সাধু ও চলিত নীতির পার্থক্য নিচে দেখানো হলো—

<u>পদ</u>	<u>সাধু</u>	<u>চলিত</u>
বিশেষ্য	মস্তক	মাথা
বিশেষ্য	জুতা	জুতো
বিশেষ্য	তুলা	ভুলো
বিশেষণ	শুষ্ক/শুকনা	শুকনো
বিশেষণ	বন্য	বুলো
সর্বনাম	তাঁহারা/উহারা	তাঁরা/ঁরা
সর্বনাম	তাহাকে/উহাকে	তাকে/ওকে
সর্বনাম	তাহার/তাঁহার	তার/তাঁর
ক্রিয়া	করিবার	করবার/করার
ক্রিয়া	পাইয়াছিলেন	পেয়েছিলেন
ক্রিয়া	হইলেন	হলেন
ক্রিয়া	আসিয়া	এসে
ক্রিয়া	হইল	হল/হলো
ক্রিয়া	দেখিয়া	দেখে
ক্রিয়া	করিলেন	করলেন
ক্রিয়া	দেল নাই	দেননি
ক্রিয়া	পার হইয়া	পেরিয়ে
ক্রিয়া	পড়িল	পড়ল/পড়লো
ক্রিয়া	করিয়া	করে
ক্রিয়া	ভাঙ্গিয়া যাইতে সাগিল	ভেঙ্গে যেতে সাগল
ক্রিয়া	ফুটিয়া রহিয়াছে	ফুটে রয়েছে
অব্যয়	পূর্বেই	আগেই
অব্যয়	সহিত	সঙ্গে/সাথে।

বাংলা ভাষার শব্দ ভাড়ার

বাংলা ভাষা গোড়াপত্তনের যুগে স্বল্প সংখ্যক শব্দ নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও নানা ভাষার সংস্পর্শে এসে এর শব্দ-সম্পর্ক বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে তুর্কি আগমন ও মুসলিম শাসন পতনের সুযোগে ক্রমে প্রচুর আরবি ও ফারসি শব্দ বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। এরপর এলো ইংরেজ। ইংরেজ শাসনামলেও তাদের নিজস্ব সাহিত্য এবং সংস্কৃতির বহু শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ লাভ করে। বাংলা ভাষা এই সব ভাষার শব্দগুলোকে আপন করে নিয়েছে। এভাবে বাংলা ভাষায় যে শব্দসম্ভারের সমাবেশ হয়েছে, সেগুলোকে পদ্ধিতগণ কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন –

১. তৎসম শব্দ

২. তৎব শব্দ

৩. অর্ধ-তৎসম শব্দ

৪. দেশি শব্দ

৫. বিদেশি শব্দ

১. তৎসম শব্দ : যেসব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে এবং যাদের রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তৎসম শব্দ। তৎসম একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ [তৎ (তার)+ সম (সমান)]=তার সমান অর্থাত সংস্কৃত। উদাহরণ : চন্দ, সূর্য, নক্ষত্র, তবন, ধর্ম, পাত্র, মনুষ্য ইত্যাদি।

২. তৎব শব্দ : যেসব শব্দের মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়, কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তৎব শব্দ। তৎব একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ, ‘তৎ’ (তার) থেকে ‘ভব’ (উৎপন্ন)। যেমন – সংস্কৃত-হস্ত, প্রাকৃত-হথ, তৎব-হাত। সংস্কৃত-চর্মকার, প্রাকৃত-চষ্টান, তৎব-চামার ইত্যাদি। এই তৎব শব্দগুলোকে ধাটি বাংলা শব্দও বলা হয়।

৩. অর্ধ-তৎসম শব্দ : বাংলা ভাষায় কিছু সংস্কৃত শব্দ কিপিং পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়। এগুলোকে বলে অর্ধ-তৎসম শব্দ। তৎসম মানে সংস্কৃত। আর অর্ধ তৎসম মানে আধা সংস্কৃত। উদাহরণ : জ্যোত্স্না, ছেরাদ, গিলী, বোষ্টম, কুচ্ছিত- এ শব্দগুলো যথাক্রমে সংস্কৃত জ্যোত্স্না, শ্রাদ্ধ, গৃহিণী, বৈকুণ্ঠ, কুট্সিত শব্দ থেকে আগত।

৪. দেশি শব্দ : বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের (যেমন : কোল, মুংডা প্রভৃতি) ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান বাংলায় রাখিত রয়েছে। এসব শব্দকে দেশি শব্দ নামে অভিহিত করা হয়। অনেক সময় এসব শব্দের মূল নির্ধারণ করা যায় না; কিন্তু কোন ভাষা থেকে এসেছে তার হদিস মেলে। যেমন—কুড়ি (বিশ)-কোলভাষা, পেট (উদর)-তামিল ভাষা, চুলা (উনুন)-মুংডারী ভাষা। এরূপ-কূলা, গঞ্জ, চোঙা, টোপুর, ডাব, ডাগুর, টেকি ইত্যাদি আরও বহু দেশি শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়।

৫. বিদেশি শব্দ : রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতিগত ও বাণিজ্যিক কারণে বাংলাদেশে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বহু শব্দ বাংলায় এসে স্থান করে নিয়েছে। এসব শব্দকে বলা হয় বিদেশি শব্দ। এসব বিদেশি শব্দের মধ্যে আরবি, ফারসি এবং ইংরেজি শব্দই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে কালের সমাজ জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণবূপে বিদেশি শব্দ এ দেশের ভাষায় গৃহীত হয়েছে। এছাড়া পর্তুগিজ, ফরাসি, তুলদাজ, তুর্কি— এসব ভাষারও কিছু শব্দ একইভাবে বাংলা ভাষায় এসে গেছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারত, মায়ানমার (বার্মা), মালয়, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশেরও কিছু শব্দ আমাদের ভাষায় প্রচলিত রয়েছে।

ক. আরবি শব্দ : বাংলায় ব্যবহৃত আরবি শব্দগুলোকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—

- (১) ধর্মসংক্রান্ত শব্দ : আল্লাহ, ইসলাম, ঈমান, ওজু, কোরআনি, কুরআন, কিয়ামত, গোসল, জানুআত, জাহান্নাম, তওবা, তসবি, জাকাত, হজ, হাদিস, হারাম, হালাল ইত্যাদি।
- (২) প্রশাসনিক ও সাম্রাজ্যিক শব্দ : আদালত, আলেম, ইনসান, ঈদ, উকিল, ওজর, এজলাস, এলেম, কানুন, কলম, কিতাব, কেচ্ছা, খারিজ, গায়েব, দোয়াত, নগদ, বাকি, মহকুমা, মুস্কেফ, মোস্তার, রায় ইত্যাদি।

খ. ফারসি শব্দ : বাংলা ভাষায় আগত ফারসি শব্দগুলোকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি।

- (১) ধর্মসংক্রান্ত শব্দ : খোদা, গুনাহ, দোজখ, নামাজ, পয়গম্বর, ফেরেশতা, বেহেশত, রোজা ইত্যাদি।
- (২) প্রশাসনিক ও সাম্রাজ্যিক শব্দ : কারখানা, চশমা, জবানবল্দি, তারিখ, তোশক, দফতর, দরবার, দোকান, দম্পত্তি, দৌলত, নালিশ, বাদশাহ, বাদ্দা, বেগম, মেথর, রসদ ইত্যাদি।
- (৩) বিবিধ শব্দ : আদমি, আমদানি, জানোয়ার, জিস্দা, নমুনা, বদমাশ, রফতানি, হাঙ্গামা ইত্যাদি।

গ. ইংরেজি শব্দ : ইংরেজি শব্দ দুই প্রকারের পাওয়া যায়—

- (১) অনেকটা ইংরেজি উচ্চারণে : ইউনিভার্সিটি, ইউনিয়ন, কলেজ, টিন, নতেল, মোট, পাউডার, পেঙ্গল, ব্যাগ, ফুটবল, মাস্টার, লাইব্রেরি, স্কুল ইত্যাদি।
- (২) পরিবর্তিত উচ্চারণে : আফিম (Opium), অফিস (Office), ইস্কুল (School), বাক্স (Box), হাসপাতাল (Hospital), বোতল (Bottle) ইত্যাদি।

ঘ. ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য ইংরোপীয় ভাষার শব্দ

- (১) পর্টুগিজ : আনারস, আলপিন, আলমারি, গির্জা, গুদাম, চাবি, পাউরাটি, পাটি, বালতি ইত্যাদি।
- (২) ফরাসি : কার্তুজ, কুপন, ডিপো, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি।
- (৩) ওল্ডসাজ : ইস্কাপন, টেক্কা, তুরপ, বুইতন, হরতন ইত্যাদি।

ঙ. অন্যান্য ভাষার শব্দ

- (১) গুজরাটি : খদ্দর, হরতাল ইত্যাদি।
- (২) পাঞ্জাবি : চাহিদা, শিখ ইত্যাদি।
- (৩) ভুক্তি : চাকর, চাকু, তোপ, দারোগা ইত্যাদি।
- (৪) চিনা : চা, চিনি ইত্যাদি।
- (৫) মায়ানমার (বার্মিজ) : ফুঁকি, লুঁকি ইত্যাদি।
- (৬) জাপানি : রিজ্জা, হারিকিরি ইত্যাদি।

মিশ্র শব্দ : কোনো কোনো সময় দেশি ও বিদেশি শব্দের মিলনে শব্দসমূহের সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন – রাজা-বাদশা (তৎসম+ফারসি), হাট-বাজার (বাংলা+ফারসি), হেড-মৌলতি (ইংরেজি+ফারসি), হেড-পণ্ডিত (ইংরেজি+তৎসম) শ্রিষ্টান্দ (ইংরেজি+তৎসম), ডাঙ্কার-খানা (ইংরেজি+ফারসি), পকেট-মার (ইংরেজি+বাংলা), চৌ-হান্দি (ফারসি+আরবি) ইত্যাদি।

পারিভাষিক শব্দ : বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিদেশি শব্দের ভাবানুবাদমূলক প্রতিশব্দকে পারিভাষিক শব্দ বলে। এর বেশিরভাগই এ কালের প্রয়োগ।

উদাহরণ : অক্সিজন-oxygen; উদ্যান-hydrogen; নথি-file; প্রশিক্ষণ-training; ব্যবস্থাপক-manager; বেতার-radio; মহাব্যবস্থাপক-general manager; সচিব-secretary; স্নাতক-graduate; স্নাতকোন্তর-post graduate; সমাপ্তি-final; সাময়িকী-periodical; সমীকরণ-equation ইত্যাদি।

জ্ঞাতব্য : বাংলা ভাষার শব্দসমূহের দেশি, বিদেশি, সংকৃত- যে ভাষা থেকেই আসুক না কেন, এখন তা বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদ। এগুলো বাংলা ভাষার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে, বাংলা থেকে আলাদা করে এদের কথা চিন্তা করা যায় না। যেমন-টেলিফোন, টেলিফ্রাফ, রেডিও, স্যাটেলাইট ইত্যাদি প্রচলিত শব্দের কঠিনতর বাংলা পরিভাষা সৃষ্টি নিষ্পত্তিয়োজন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলা ব্যাকরণ ও এর আলোচ্য বিষয়

ব্যাকরণ

ব্যাকরণ (= বি + আ + ধৃ + অন) শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।

সম্ভা : যে শাস্ত্র কোনো ভাষার বিভিন্ন উপাদানের প্রকৃতি ও স্বরূপের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধি বিশেষভাবে আলোচিত হয়, তাকে ব্যাকরণ বলে।

ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা : ব্যাকরণ পাঠ করে ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠন প্রকৃতি ও সেসবের সূচু ব্যবহারবিধি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় এবং লেখায় ও কথায় ভাষা প্রয়োগের সময় শুন্ধাশুন্ধি নির্ধারণ সহজ হয়।

বাংলা ব্যাকরণ : যে শাস্ত্র বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠনপ্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষিত হয় এবং এদের সম্পর্ক ও সূচু প্রয়োগবিধি আলোচিত হয়, তাই বাংলা ব্যাকরণ।

বাংলা ব্যাকরণে আলোচ্য বিষয়

প্রত্যেক ভাষায়ই চারটি মৌলিক অংশ থাকে। যেমন—

১. ধ্বনি (Sound)
২. শব্দ (Word)
৩. বাক্য (Sentence)
৪. অর্থ (Meaning)

সব ভাষার ব্যাকরণেই প্রধানত নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ের আলোচনা করা হয় —

১. ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)
২. শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব ((Morphology)
৩. বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (Syntax) এবং
৪. অর্থতত্ত্ব (Semantics)

এ ছাড়া অতিধানতত্ত্ব (Lexicography) ছবি ও অঙ্গকার প্রভৃতি ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়।

১. ধ্বনিতত্ত্ব

ধ্বনি : মানুষের বাক প্রত্যঙ্গা অর্ধাং কষ্টনালি, মুখবিবর, জিহ্বা, আল-জিহ্বা, কোমল তালু, শক্ত তালু, দাঁত, মাড়ি, চোয়াল, ঠোঁট ইত্যাদির সাহায্যে উচ্চারিত আওয়াজকে ‘ধ্বনি’ বলা হয়। বাক প্রত্যঙ্গজাত ধ্বনির সূক্ষ্মতম মৌলিক অংশ বা একককে (Unit) ধ্বনিমূল (Phoneme) বলা হয়।

বর্ণ : বাক প্রত্যঙ্গজাত প্রত্যেকটি ধ্বনি এককের জন্য প্রত্যেক ভাষায়ই লেখার সময় এক একটি প্রতীক বা চিহ্ন (Symbol) ব্যবহৃত হয়। বাংলায় এ প্রতীক বা চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ (Letter)। যেমন—বাংলায় ‘বক’ কথাটির প্রথম ধ্বনিটির প্রতীক রূপে ব্যবহার করা হয়েছে ‘ব’, ইংরেজিতে সে ধ্বনির জন্য ব্যবহৃত হয় B বা b (বি); আবার আরবি, ফারসি ও উর্দুতে একই ধ্বনির জন্য ব্যবহৃত হয় ܒ (বে)।

ধ্বনির উচ্চারণপ্রণালী, উচ্চারণের স্থান, ধ্বনির প্রতীক বা বর্ণের বিন্যাস, ধ্বনিসংযোগ বা সম্মিশ্রণ, ধ্বনির পরিবর্তন ও লোপ, গত্ত ও বত্ত বিধান ইত্যাদি বাংলা ব্যাকরণে ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

২. মূপতত্ত্ব

এক বা একাধিক ধ্বনির অর্ধবোধক সম্মিলনে শব্দ তৈরি হয়, শব্দের ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয় রূপ (morpheme)। রূপ গঠন করে শব্দ। সেই জন্য শব্দতত্ত্বকে রূপতত্ত্ব (Morphology) বলা হয়।

৩. বাক্যতত্ত্ব

মানুষের বাক্ত্বজ্ঞানাত ধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত শব্দসহযোগে স্ফট অর্ধবোধক বাক প্রবাহের বিশেষ বিশেষ অংশকে বলা হয় বাক্য (Sentence)। বাক্যের সঠিক গঠনপ্রণালী, বিভিন্ন উপাদানের সংযোজন, বিয়োজন, এদের সার্থক ব্যবহারযোগ্যতা, বাক্যমধ্যে শব্দ বা পদের স্থান বা ত্রুটি, পদের রূপ পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়। বাক্যের মধ্যে কোন পদের পর কোন পদ বসে, কোন পদের স্থান কোথায় বাক্যতত্ত্বে এসবের পূর্ণ বিশ্লেষণ থাকে। বাক্যতত্ত্বকে পদক্রমও বলা হয়।

৪. অর্থতত্ত্ব

শব্দের অর্থবিচার, বাক্যের অর্থবিচার, অর্থের বিভিন্ন প্রকারভেদ, যেমন—মুখ্যার্থ, গোণার্থ, বিপরীতার্থ ইত্যাদি অর্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

বাংলা ব্যাকরণের আলোচনায় ব্যবহৃত কতিপয় পারিভাষিক শব্দ : বাংলা ব্যাকরণের আলোচনার জন্য পঞ্জিতের কতিপয় পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ ধরনের প্রয়োজনীয় কিছু পারিভাষিক শব্দের পরিচয় নিম্নে প্রদান করা হলো :

প্রাতিপদিক : বিভিন্নান্বীন নাম শব্দকে প্রাতিপদিক বলে। যেমন— হাত, বই, কলম ইত্যাদি।

সাধিত শব্দ : মৌলিক শব্দ ব্যক্তিত অন্য সব শব্দকেই সাধিত শব্দ বলে। যথা— হাতা, গরমিল, দম্পতি ইত্যাদি।

সাধিত শব্দ দুই প্রকার : নাম শব্দ ও ক্রিয়া। প্রত্যেকটি বা নামশব্দের ও ক্রিয়ার দুটি অংশ থাকে।

প্রকৃতি ও প্রত্যয়।

প্রকৃতি : যে শব্দকে বা কোনো শব্দের যে অংশকে আর কোনো ক্ষুদ্রতর অংশে তাগ করা যায় না, তাকে প্রকৃতি বলে।

প্রকৃতি দুই প্রকার : নাম প্রকৃতি ও ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতু।

নাম প্রকৃতি : হাতল, ফুলেল, মুখর— এ শব্দগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই— হাত + ল = হাতল (বাঁট), ফুল + লে = ফুলেল (ফুলজাত) এবং মুখ + র = মুখর (বাচাল)। এখানে হাত, ফুল ও মুখ শব্দগুলোকে বলা হয় প্রকৃতি বা মূল অংশ। এগুলোর নাম প্রকৃতি।

ক্রিয়া প্রকৃতি : আবার চলন্ত, জমা ও লিখিত— এ শব্দগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই $\sqrt{\text{চল}} + \text{অন্ত} = \text{চলন্ত}$ (চলমান), $\sqrt{\text{জম}} + \text{আ} = \text{জমা}$ (সঞ্চিত) এবং $\sqrt{\text{লিখ}} + \text{ইত} = \text{লিখিত}$ (যা লেখা হয়েছে)। এখানে চল, জম ও লিখ— এ তিনটি ক্রিয়ামূল বা ক্রিয়ার মূল অংশ। এগুলোকে বলা হয় ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতু।

প্রত্যয় : শব্দ গঠনের উদ্দেশ্যে নাম প্রকৃতির এবং ক্রিয়া প্রকৃতির পরে যে শব্দাংশ যুক্ত হয় তাকে প্রত্যয় বলে।
করেকটি শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো।

নাম প্রকৃতি	প্রত্যয়	প্রত্যয়ান্ত শব্দ
হাত	+ ল	হাতল
ফুল	+ এল	ফুলেল
মুখ	+ র	মুখর
ক্রিয়া প্রকৃতি	প্রত্যয়	প্রত্যয়ান্ত শব্দ
$\sqrt{\text{চল}}$	+ অন্ত	চলন্ত
$\sqrt{\text{জম}}$	+ আ	জমা

বাংলা শব্দ গঠনে দুই প্রকার প্রত্যয় পাওয়া যায় : ১. তদ্বিত প্রত্যয় ও ২. কৃৎ প্রত্যয়।

১. তদ্বিত প্রত্যয় : শব্দমূল বা নাম প্রকৃতির সঙ্গে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়, তাকে বলে তদ্বিত প্রত্যয়। যেমন—হাতল, ফুলেল ও মুখর শব্দের যথাক্রমে ল, এল এবং র তদ্বিত প্রত্যয়।

২. কৃৎ প্রত্যয় : ধাতু বা ক্রিয়া প্রকৃতির সাথে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়, তাকে বলে কৃৎ প্রত্যয়। উদাহরণে চলন্ত, জমা ও লিখিত শব্দের যথাক্রমে অন্ত, আ এবং ইত কৃৎ প্রত্যয়।

তদ্বিত প্রত্যয় সাধিত শব্দকে বলা হয় তদ্বিতান্ত শব্দ এবং কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দকে বলা হয় কৃদ্বন্ত শব্দ।
যেমন— হাতল, ফুলেল ও মুখর তদ্বিতান্ত শব্দ এবং চলন্ত, জমা ও লিখিত কৃদ্বন্ত শব্দ।

উপসর্গ : শব্দ বা ধাতুর পূর্বে কতিপয় সুনির্দিষ্ট অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ যুক্ত হয়ে সাধিত শব্দের অর্থের পরিবর্তন, সম্প্রসারণ ও সংকেচন ঘটিয়ে থাকে। এগুলোকে বলা হয় উপসর্গ।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থ না থাকলেও শব্দ বা ধাতুর পূর্বে ব্যবহৃত হলেই অর্থবাচকতা সূচিত হয়। যেমন— ‘পরা’ একটি উপসর্গ, এর নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। কিন্তু ‘জয়’ শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে হলো ‘পরাজয়’। এটি জয়ের বিপরীতার্থক। সেইরূপ ‘দর্শন’ অর্থ দেখা। এর আগে ‘প্ৰ’ উপসর্গ যুক্ত হয়ে হলো ‘প্ৰদৰ্শন’ অর্থাৎ সম্যকবৃপ্তে দর্শন বা বিশেষভাবে দেখা।

বাংলা ভাষায় তিনি প্রকারের উপসর্গ দেখা যায় : ১. সংস্কৃত ২. বাংলা ৩. বিদেশি উপসর্গ।

১. সংস্কৃত উপসর্গ : প্ৰ, পৱা, অপ—এৰূপ বিশাটি সংস্কৃত বা তত্ত্বম উপসর্গ রয়েছে।

তৎসম উপসর্গ তৎসম শব্দ বা ধাতুর পূর্বে ব্যবহৃত হয়। যেমন, ‘পূর্ণ’ একটি তৎসম শব্দ। ‘পরি’ উপসর্গযোগে হয় ‘পরিপূর্ণ। ঠু (হর) + ঘণ্ট = ‘হার’-এ কৃদণ্ড শব্দের আগে উপসর্গ যোগ করলে কীরূপ অর্থের পরিবর্তন হলো সক্ষ কর : আ+হার = আহার (খাওয়া), বি + হার = বিহার (অমণ), উপ+হার=উপহার (পারিতোষিক), পরি+হার=পরিহার (বর্জন) ইত্যাদি।

২। বাংলা উপসর্গ : অ, অনা, অঘা, অজ, আ, আব, নি ইত্যাদি অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ বাংলা উপসর্গ। খাটি বাংলা শব্দের আগে এগুলো যুক্ত হয়। যেমন – অ+কাজ=অকাজ, অনা+ছিকি (সৃষ্টি শব্দজাত) = অনাছিকি ইত্যাদি।

৩। বিদেশি উপসর্গ : কিছু বিদেশি শব্দ বা শব্দাংশ বাংলা উপসর্গসমূহে ব্যবহৃত হয়ে অর্থের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। বিদেশি উপসর্গ বিদেশি শব্দের সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। যথা : বেহেড, লাপান্তা, গরহাজির ইত্যাদি।

(পরে উপসর্গ অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

অনুসর্গ : বাংলা ভাষায় দারা, দিয়া, কর্তৃক, চেয়ে, থেকে, উপরে, পরে, প্রতি, মাঝে, বই, ব্যতীত, অবধি, হেতু, জন্য, কারণ, মতো, তবে ইত্যাদি শব্দ কখনো অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে স্বাধীনভাবে পদবূপে বাকেয় ব্যবহৃত হয়; আবার কখনো কখনো শব্দবিভক্তির ন্যায় অন্য শব্দের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়ে অর্থবৈচিত্র্য ঘটিয়ে থাকে। এগুলোকে অনুসর্গ বলা হয়। যেমন—কেবল আমার জন্য তোমার এ দুর্ভোগ। মনোযোগ দিয়ে শোন, শেষ পর্যন্ত সবার কাজে আসবে।

অনুশীলনী

- ১। ভাষা বলতে কী বোঝ ? বাংলা ভাষায় সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য বুঝিয়ে দাও।
- ২। বাংলা ভাষার শব্দগুলোকে কয়টি গুচ্ছে বিভক্ত করা যায় ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
- ৩। নিচের শব্দগুলোকে গুচ্ছ অনুযায়ী সাজাও (তৎসম, তৎব ইত্যাদি শিরোনামের নিচে লেখ)।
রাখাল, সন্তাটি, বাদশাহ, কেগোম, গুরু, গৃহ, হাকিম, দা, হাসপাতাল, চেয়ার, সমুদ্র, কিতাব, ডিজিট, টেকি, চিনি, লুঙ্গি, রিঞ্জা, দেবতা, খড়ম।
- ৪। ব্যাকরণ কাকে বলে। ব্যাকরণে কী কী বিষয় আলোচিত হয় ?
- ৫। নিচের বাক্যগুলোকে আদর্শ চলিত রীতিতে পরিবর্তন কর।
 - ক. এখনও সে স্কুল হইতে ফিরে নাই।
 - খ. আমি তাহাকে চিঠি লিখিয়াছি।
 - গ. সে আসিবে বলিয়া তরসা করিতে পরিতেছি না।
 - ঘ. আমি তাহাকে দিয়া কাজটি করাইয়া লইয়াছি।
 - ঙ. স্কুল পালাইয়া রবীন্দ্রনাথ হইতে পারিবে না।
 - চ. বকুতা করিতে করিতে তিনি অঙ্গান হইয়া পড়িপেন।

ছ. সুন্দর মুখ দেখিয়া ভুগিয়া যাইও না, দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথায় ভুগিও না।

জ. যাহাদের কথামতো অঘসর হইলাম শেষ পর্যন্ত তাহারাই আমাকে বিপদে ফেলিল।

ঝ. দুই বন্ধু বনে ভ্রমণ করিতেছিল, এমন সময় এক ভালুক আসিয়া তাহাদের সম্মুখে হাজির হইল।

৬। ঠিকভে টিক () চিহ্ন দাও।

ক. বাংলা লেখ্য ভাষার রীতি কয়টি? – একটি/ দুটি/তিনটি/চারটি

খ. সাধু রীতির বাক্যবিন্যাস-অনিয়ন্ত্রিত ও অনির্দিষ্ট/ অনিয়ন্ত্রিত ও অনির্দিষ্ট/ অনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট

গ. চলিত রীতি-দুর্বোধ্য/সহজবোধ্য/বক্তৃতার অনুপযোগী

ঘ. বাংলা ভাষার শব্দসম্মানকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? – তিন ভাগে/ পাঁচ ভাগে/ চার ভাগে

ঙ. দেশি শব্দ-সংস্কৃত জাত / তত্ত্ব জাত/ দেশজ

চ. তৎসম শব্দ মানে- সংস্কৃত/ ফারাসি/ উর্দু

৭। ক. নিচের শব্দগুলো থেকে ইংরেজি শব্দ খুঁজে বের কর।

কিতাব, হাকিম, আনারস, চাকর, পেসিল, কলম, টিন, স্কুল, শার্ট

খ. নিচের শব্দগুলো থেকে আরবি-ফারাসি শব্দ খুঁজে বের কর এবং আরবি শব্দের ডানে ‘আ’ ও ফারাসি শব্দের ডানে ‘ফা’ লিখে দাও।

রেস্তোরাঁ, বোতাম, দারোগা, অফিস, আদালত, কলম, দোয়াত, খোদা, নামাজ, নবি, পয়গম্বর, ফুটবল, গুদাম, বালতি, ফেরেশতা, বেহেশত, ইমান, গোসল, মন্তব্য, মাওলানা।

গ. নিচের শব্দগুলোর প্রতি গুচ্ছের পাশে ডান দিকে যে নাম লেখা আছে তা ভুল হলে ঠিক নামটি বসাও।

১. গুলাহ, ফেরেশতা, দোজখ, রোজা-আরবি

২. মাস্টার, লাইব্রেরি, ব্যাগ, কলেজ-ফারাসি

৩. চন্দ, সূর্য, পত্র, ধর্ম – পর্তুগিজ

৪. চুলা, কুলা, চোজ্জা, ডিজিতা-ইংরেজি

৫. হাত, চায়ার, কায়ার, মাথা – দেশি

৬. আলপিন, আলমারি, পাউরুটি, চাবি-তৎসম

৭. চাকু, চাকর, দারোগা, তোপ-তত্ত্ব

৮. আল্পাহ, ইসলাম, তসবি, উকিল-তুর্কি।

৮। নিচে ব্যাকরণের দুটি সংজ্ঞা দেওয়া হলো। যেটি ঠিক তার বাম পাশে টিক () চিহ্ন দাও।

১. যে শাস্ত্রে ভাষার বিভিন্ন উপাদান, তার গঠনপ্রকৃতি ও তার স্বরূপ বিশ্লেষিত হয় এবং সুষ্ঠু প্রয়োগবিধি আলোচিত হয় তাকে ব্যাকরণ বলে।

২. যে শাস্ত্র পাঠ করলে ভাষা শুন্ধরূপে পড়তে, লিখতে ও বলতে পারা যায় তাকে ব্যাকরণ বলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধ্বনিতত্ত্ব

বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ

কোনো ভাষার বাক্ প্রবাহকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতগুলো মৌলিক ধ্বনি (Sound) পাই। বাংলা ভাষাতেও কতগুলো মৌলিক ধ্বনি আছে।

বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনিগুলোকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা হয় : ১. স্বরধ্বনি ও ২. ব্যঞ্জনধ্বনি।

১. স্বরধ্বনি : যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় না, তাদেরকে বলা হয় স্বরধ্বনি (Vowel sound)। যেমন - অ, আ, ই, উ ইত্যাদি।

২. ব্যঞ্জনধ্বনি : যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও না কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় কিন্তু ঘর্ষণ লাগে, তাদেরকে বলা হয় ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant sound)। যেমন- ক, চ, ট, ত, প ইত্যাদি।

বর্ণ : ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ (Letter)।

স্বরবর্ণ : স্বরধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় স্বরবর্ণ। যেমন - অ, আ, ই, উ, উ ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণ : ব্যঞ্জনধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় ব্যঞ্জনবর্ণ। যেমন- ক ইত্যাদি।

বর্ণমালা : যে কোনো ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে সেই ভাষার বর্ণমালা (Alphabet) বলা হয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : উচ্চারণের সূবিধার জন্য বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি ‘অ’ স্বরধ্বনিটি যোগ করে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। যেমন - ক + অ = ক, ইত্যাদি। স্বরধ্বনি সংযুক্ত না হলে অর্ধাং উচ্চারিত ব্যঞ্জনের নিচে ‘হস্ত’ বা ‘হল’ চিহ্ন () দিয়ে লিখিত হয়।

বাংলা বর্ণমালা

বাংলা বর্ণমালায় মোট পঞ্চাশ (৫০)টি বর্ণ রয়েছে। তার মধ্যে স্বরবর্ণ এগার (১১)টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ উনচাহিশটি (৩৯)টি।

১. স্বরবর্ণ	:	অ আ ই ঈ উ ঊ এ ঐ ঔ ষ	১১টি
২. ব্যঞ্জনবর্ণ	:	ক খ গ ঘ ঙ	৫টি
		চ ছ জ ঝ ঞ	৫টি

ট ঠ চ ঢ ণ	৫টি
ত থ দ ধ ন	৫টি
প ফ ব ড ম	৫টি
য র ল	৩টি
শ ষ স হ	৪টি
ড় ঢ় য ঃ	৪টি
ঁ ঁ *	৩টি

মোট ৫০টি

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এই, ও – এ দুটি দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বরধ্বনির চিহ্ন। যেমন – অ + ই = এই, অ + উ = ওই

স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ

কার ও ফলা

কার : স্বরবর্ণের এবং কতগুলো ব্যঞ্জনবর্ণের দুটি রূপ রয়েছে। স্বরবর্ণ যখন নিরপেক্ষ বা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ কোনো বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় না, তখন এর পূর্ণরূপ লেখা হয়। একে বলা হয় প্রাথমিক বা পূর্ণরূপ। যেমন – অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ।

এই রূপ বা form শব্দের আদি, মধ্য, অন্ত – যে কোনো অবস্থানে বসতে পারে। স্বরধ্বনি যখন ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে যুক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়, তখন সে স্বরধ্বনিটির বর্ণ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। স্বরবর্ণের এ সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় সংক্ষিপ্ত স্বর বা ‘কার’। যেমন – ‘আ’-এর সংক্ষিপ্ত রূপ (।)। ‘ম’-এর সঙ্গে ‘আ’-এর সংক্ষিপ্ত রূপ ‘।’ যুক্ত হয়ে হয় ‘মা’। বালান করার সময় কার হয় ম এ আ-কার (মা)। স্বরবর্ণের নামানুসারে এদের নামকরণ করা হয়। যেমন – আ-কার (।), ই-কার (ি), ঈ-কার (ী), উ-কার (ু), ঊ-কার (ু), খ-কার (্), এ-কার (ে), ঐ-কার (ৈ), ও-কার (ো), ঔ-কার (ৌ)। অ-এর কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ বা ‘কার’ নেই।

আ-কার (।) এবং ই-কার (ি) ব্যঞ্জনবর্ণের পরে যুক্ত হয়। ই-কার (ি), এ-কার (ে) এবং ঐ-কার (ৈ) ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে যুক্ত হয়। উ-কার (ু), ঊ-কার (ু) এবং খ-কার (্) ব্যঞ্জনবর্ণের নিচে যুক্ত হয়। ঔ-কার (ৌ) এবং ঔ-কার (ৌ) ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে ও পরে দুই দিকে যুক্ত হয়।

উদাহরণ : মা, মী, মি, মে, মৈ, মু, মূ, মো, মৌ।

ফলা : স্বরবর্ণ যেমন ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে আকৃতির পরিবর্তন হয়, তেমনি কোনো কোনো ব্যঞ্জনবর্ণও কোনো কোনো স্বর কিংবা অন্য ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে আকৃতির পরিবর্তন হয় এবং কখনো কখনো সংক্ষিপ্তও হয়। যেমন-ম্য, ম্ব ইত্যাদি। স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে যেমন ‘কার’ বলা হয়, তেমনি ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় ‘ফলা’। এভাবে যে ব্যঞ্জনটি যুক্ত হয়, তার নাম অনুসারে ফলার নামকরণ করা হয়। যেমন – ম-এ য-ফলা = ম্য, ম- এ র-ফলা = ম্ব, ম-এ ল- ফলা = ম্ল, ম-এ ব-ফলা = ম্ব। র-ফলা ব্যঞ্জনবর্ণের পরে হলে লিখতে হয় নিচে। ‘ম্ব’; আবার ‘র’ যদি ম-এর আগে উচ্চারিত হয়, যেমন-

ম-এ রেফ 'র' তবে লেখা হয় উপরে, ব্যঙ্গনটির মাথায় রেফ (') দিয়ে। 'ফলা' যুক্ত হলে যেমন, তেমনি 'কার' যুক্ত হলেও বর্ণের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। যেমন - হ-এ উ-কার=হু, গ-এ উ-কার = গু, শ-এ উ-কার = শু, স-এ উ-কার=সু, র-এ উ-কার = রু, র-এ উ-কার = রু, হ-এ ঝ-কার=হু।

কথেকে ম পর্যন্ত পীচিশটি স্বর্ণধ্বনি (Plosive)কে উচ্চারণ স্থানের দিক থেকে পাঁচটি গুচ্ছে বা বর্ণে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি গুচ্ছের প্রথম ধ্বনিটির নামানুসারে সে গুচ্ছের সকলো ধ্বনিকে বলা হয় এই বর্ণীয় ধ্বনি। বর্ণভূক্ত বলে এ ধ্বনির চিহ্ন গুলোকেও এই বর্ণীয় নামে অভিহিত করা হয়। যেমন-

ক খ গ ঘ ঙ	ধ্বনি	হিসেবে এগুলো	কষ্ট্য	ধ্বনি,	বর্ণ	হিসেবে 'ক'	বর্ণীয়	বর্ণ
চ ছ জ ব এও	"	"	তালব্য	"	"	"	'চ'	"
ট ঠ ড ঢ ণ	"	"	মুর্ধন্য	"	"	"	'ট'	"
ত থ দ ধ ন	"	"	দস্ত্য	"	"	"	'ত'	"
প ফ ব ত ম	"	"	ওষ্ট্য	"	"	"	'প'	"

উচ্চারণের স্থানভেদে ব্যঙ্গনধ্বনির বিভাগ

ধ্বনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুখবিবরে উচ্চারণের মূল উপকরণ বা উচ্চারক জিহবা ও ওষ্ট্য। আর উচ্চারণের স্থান হলো কষ্ট্য বা জিহ্বামূল, অগ্রতালু, মূর্ধন্য বা পশ্চাত দস্তমূল, দস্ত্য বা অগ্র দস্তমূল, ওষ্ট্য ইত্যাদি।

উচ্চারণের স্থানের নাম অনুসারে ব্যঙ্গনধ্বনিগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয় : ১. কষ্ট্য বা জিহ্বামূলীয় ২. তালব্য বা অগ্রতালুজাত, ৩. মুর্ধন্য বা পশ্চাত দস্তমূলীয়, ৪. দস্ত্য বা অগ্র দস্তমূলীয় এবং ৫. ওষ্ট্য।

ধ্বনি উচ্চারণের জন্য যে প্রত্যঙ্গ গুলো ব্যবহৃত হয় :

- ১ - ঠেঁট (ওষ্ট্য ও অধর)
- ২ - দাঁতের পাটি
- ৩ - দস্তমূল, অগ্র দস্তমূল
- ৪ - অগ্রতালু, শক্ত তালু
- ৫ - পশ্চাতালু, নরম তালু, মূর্ধন্য
- ৬ - আলজিভ
- ৭ - জিহবাগ্র
- ৮ - সম্মুখ জিহবা
- ৯ - পশ্চাদজিহবা, জিহবামূল
- ১০ - নাসা-গহ্বর
- ১১ - স্বর-পদ্মব, স্বরতন্ত্রী
- ১২ - ফুসফুস

নিম্নে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাজন দেখানো হলো :

উচ্চারণ স্থান	ব্যঞ্জনধ্বনির বর্ণসমূহ	উচ্চারণস্থান অনুযায়ী নাম
জিহবামূল	ক খ গ ঘ ঙ	কঙ্গ্য বা জিহবামূলীয় বর্ণ
অগ্রতালু	চ ছ জ বা এও শ য য	তালব্য বর্ণ
পশ্চাত দন্তমূল	ট ঠ ড ঢ ণ র ড় ঢ়	মূর্ধন্য বা পশ্চাত দন্তমূলীয় বর্ণ
অগ্র দন্তমূল	ত থ দ থ ন ল স	দন্ত্য বর্ণ
গুর্ণ	প ফ ব ত ম	গুর্ণ্য বর্ণ

মুক্তব্য : খড়-ত (ঢ)-কে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ধরা হয় না। এটি 'ত' বর্ণের হস্ত-চিহ্ন যুক্ত (ত)-এর রূপভেদ মাত্র।

১৪ - এ তিনটি বর্ণ স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। এ বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি অন্য ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে একত্রে উচ্চারিত হয়। তাই এ বর্ণগুলোকে বলা হয় পরাপ্রয়ী বর্ণ।

ঙ এও ণ ন ম-এ পৌচটি বর্ণ এবং এও * যে বর্ণের সঙ্গে লিখিত হয় সে বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস নিঃসৃত বায়ু মুখবিবর ছাড়াও নাসারশ্ব দিয়ে বের হয়; অর্ধাং এগুলোর উচ্চারণে নাসিকার সাহায্য প্রয়োজন হয়। তাই এগুলোকে বলে অনুনাসিক বা নাসিক্য ধ্বনি। আর এগুলোর বর্ণকে বলা হয় অনুনাসিক বা নাসিক্য বর্ণ।

স্বরধ্বনির ত্রুট্যতা ও দীর্ঘতা : স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে সময়ের স্বল্পতা ও দৈর্ঘ্য অনুসারে ত্রুট্য বা দীর্ঘ হয়। যেমন- ইংরেজি full-পূর্ণ এবং fool বোকা। শব্দ দুটোর প্রথমটির উচ্চারণ ত্রুট্য ও দ্বিতীয়টির উচ্চারণ দীর্ঘ। ত্রুট্য বর্ণের উচ্চারণ যে দীর্ঘ হয় এবং দীর্ঘ বর্ণের উচ্চারণ যে ত্রুট্য হয়, কয়েকটি উদাহরণে তা স্পষ্ট হবে। যেমন-ইলিশ, তিরিশ, উচিত, নতুন-লিখিত হয়েছে ত্রুট্য ই-কার ও ত্রুট্য - উ-কার দিয়ে; কিন্তু উচ্চারণ হচ্ছে দীর্ঘ। আবার দীন, দ্বীন ফিঝুর, ভূমি-লিখিত হয়েছে দীর্ঘ ই-কার এবং দীর্ঘ উ-কার দিয়ে; কিন্তু উচ্চারণে ত্রুট্য হয়ে যাচ্ছে। একটিমাত্র ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দের উচ্চারণ সবসময় দীর্ঘ হয়। যেমন-দীন, তিল, পুর ইত্যাদি।

যৌগিক স্বর : পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি ধাককে দ্রুত উচ্চারণের সময় তা একটি সংযুক্ত স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। এরূপে একসঙ্গে উচ্চারিত দুটো মিলিত স্বরধ্বনিকে যৌগিক স্বর বা দ্বি-স্বর বলা হয়। যেমন-অ + ই = অই (বই), অ + উ = অউ (বউ), অ + এ = অয়, (বয়, ময়না), অ + ও = অও (হও, লও)।

বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সম্বৰ্ধ্য পৌঁছিশ।

আ + ই = আই (যাই, ভাই); আ + উ = আউ (লাউ); আ + এ = আয় (যায়, খায়); আ + ও = আও (যাও, খাও); ই + ই = ইই (দিই); ই + উ = ইউ (শিউলি); ই + এ = ইয়ে (বিয়ে); ই + ও = ইও (নিও, দিও); উ + ই = উই (উই, শুই); উ + আ = উয়া (কুয়া); এ + আ=এয়া (কেয়া, দেয়া); এ + ই = এই (সেই, নেই); এ + ও = এও (খেও); ও + ও = ওও (শোও)।

বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক দুটো বর্ণ রয়েছে: এ এবং ঔ। উদাহরণ : কৈ, বৌ। অন্য যৌগিক স্বরের চিহ্ন স্বরূপ কোনো বর্ণ নেই।

ব্যঙ্গনধ্বনির বিভাগ ও উচ্চারণগত নাম

আগে আমরা দেখেছি যে, পাঁচটি বর্ণ বা গুচ্ছে প্রত্যকটিতে পাঁচটি বর্ণ পাওয়া যায়। এগুলো স্ফূর্তি ধ্বনিজ্ঞাপক। কথেকে ম পর্যন্ত এ পঁচিশটি ব্যঙ্গনকে সর্ব ব্যঙ্গন বা স্ফূর্তি ব্যঙ্গনধ্বনি বলে।

উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সর্ব ব্যঙ্গনধ্বনিগুলোকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা যায় : ১. অঘোষ এবং ২. ঘোষ।

১. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না, তাকে বলা হয় অঘোষ ধ্বনি। যেমন— ক, খ, চ, ছ ইত্যাদি।

২. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয়, তাকে বলে ঘোষ ধ্বনি। যেমন— গ, ঘ, জ, ঝ ইত্যাদি।

ক. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের স্বল্পতা থাকে, তাকে বলা হয় অঞ্চলপ্রাণ ধ্বনি। যেমন— ক, গ, চ, জ ইত্যাদি।

খ. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের আধিক্য থাকে, তাকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি। যেমন— খ, ঘ, ছ, ঝ ইত্যাদি।

উম্বুধ্বনি : শ, ষ, স, হ — এ চারটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় আমরা শ্বাস যতক্ষণ খুশি রাখতে পারি। এগুলোকে বলা হয় উম্বুধ্বনি বা শিশধ্বনি। এ বর্ণগুলোকে বলা হয় উম্বুবর্ণ।

শ ষ স — এ তিনটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি অঘোষ অঞ্চলপ্রাণ, আর ‘হ’ ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি।

অন্তঃস্থ ধ্বনি : য (Y) এবং ব (W) এ দুটো বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান সর্ব ও উম্বুধ্বনির মাঝামাঝি। এজন্য এদের বলা হয় অন্তঃস্থ ধ্বনি।

ধ্বনির উচ্চারণ বিধি

স্বরধ্বনির উচ্চারণ

ই এবং ঈ—ধ্বনির উচ্চারণে জিহবা এগিয়ে আসে এবং উচ্চে অগ্রতালুর কঠিনাংশের কাছাকাছি পৌঁছে। এ ধ্বনির উচ্চারণে জিহবার অবস্থান ঈ—ধ্বনির মতো সম্মুখেই হয়, কিন্তু একটু নিচে এবং আ—ধ্বনির বেলায় আরও নিচে। ই ঈ এ (অ) ধ্বনির উচ্চারণে জিহবা এগিয়ে সম্মুখভাগে দাঁতের দিকে আসে বলে এগুলোকে বলা হয় সম্মুখ ধ্বনি। ই এবং ঈ—র উচ্চারণের বেলায় জিহবা উচ্চে থাকে। তাই এগুলো উচ্চসম্মুখ স্বরধ্বনি। এ মধ্যাবস্থিত সম্মুখ স্বরধ্বনি এবং আ নিম্নাবস্থিত সম্মুখ স্বরধ্বনি।

উ এবং উ—ধ্বনি উচ্চারণে জিহবা পিছিয়ে আসে এবং পশ্চাত তালুর কোমল অংশের কাছাকাছি ওঠে। ও—ধ্বনির উচ্চারণে জিহবা আরও একটু নিচে আসে। অ—ধ্বনির বেলায় তার চেয়েও নিচে আসে। উ উ ও অ—ধ্বনির উচ্চারণে জিহবা পিছিয়ে আসে বলে এগুলোকে পশ্চাত স্বরধ্বনি বলা হয়। উ উ—ধ্বনির উচ্চারণকালে জিহবা উচ্চে থাকে বলে এদের বলা হয় উচ্চ পশ্চাত স্বরধ্বনি ও মধ্যাবস্থিত পশ্চাত স্বরধ্বনি এবং অ—নিম্নাবস্থিত পশ্চাত স্বরধ্বনি।

বাংলা আ-ধ্বনির উচ্চারণে জিহবা সাধারণত শায়িত অবস্থায় থাকে এবং কঠের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং মুখের সমুখ ও পশ্চাত অংশের মাঝামাঝি বা কেন্দ্রস্থানীয় অংশে অবস্থিত বলে আ-কে কেন্দ্রীয় নিম্নাবস্থিত স্বরধ্বনি এবং বিবৃত ধ্বনিও বলা হয়।

বাংলা স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণ নিচের ছকে দেখানো হলো

	সমুখ, উষ্ঠাধর প্রস্ত	কেন্দ্রীয়, উষ্ঠাধর বিবৃত	পশ্চাত, উষ্ঠাধর গোলাকৃত
উচ্চ	ই ঈ		উ উ
উচ্চমধ্য	এ		ও
নিম্নমধ্য	অ্যা		অ
নিম্ন		আ	

শব্দে অবস্থানভেদে অ দুইভাবে লিখিত হয়

১. স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত অ। যেমন—অমর, অনেক।
২. শব্দের মধ্যে অন্য বর্ণের সঙ্গে বিলীনভাবে ব্যবহৃত অ। যেমন— কর, বল। এখানে ক এবং র আর ব এবং ল বর্ণের সঙ্গে অ বিলীন হয়ে আছে। (ক + অ + র + অ; ব+ অ + ল + অ)।

শব্দের আ-ধ্বনির দুই রকম উচ্চারণ পাওয়া যায়

১. বিবৃত বা স্বাভাবিক উচ্চারণ। যেমন— অমল, অনেক, কত।
 ২. সংকৃত বা ও-ধ্বনির মতো উচ্চারণ। যথা— অধীর, অতুল, মন। এ উচ্চারণগুলোতে অ-এর উচ্চারণ অনেকটা ও-এর মতো (ওধীর, ওতুল, মোন)।
১. ‘অ’-ধ্বনির স্বাভাবিক বা বিবৃত উচ্চারণ
- (ক) শব্দের আদিতে
১. শব্দের আদিতে না-বোধক ‘অ’ যেমন — অটল, অনাচার।
 ২. ‘অ’ কিংবা ‘আ’-যুক্ত ধ্বনির পূর্ববর্তী অ-ধ্বনি বিবৃত হয়। যেমন — অমানিশা, কথা।
- (খ) শব্দের মধ্যে ও অন্তে
১. পূর্ব স্বরের সঙ্গে মিল রেখে স্বরসংজ্ঞাতির কারণে বিবৃত ‘অ’। যেমন — কলম, বৈধতা, যত, শ্রেয়ৎ।
 ২. ঝ-ধ্বনি, এ-ধ্বনি, ঐ-ধ্বনি এবং উ-ধ্বনির পূর্ববর্তী ‘অ’ প্রায়ই বিবৃত হয়। যেমন — তৃণ, দেব, ধৈর্য, মোলক, মৌন ইত্যাদি।
 ৩. অনেক সময় ই-ধ্বনির পরের ‘অ’ বিবৃত হয়। যেমন — গঠিত, মিত, জনিত ইত্যাদি।

২. অ-ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ

অ-ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণে চোয়াল বেশি ফাঁক হয়। ঠোট তত বাঁকা বা গোল হয় না। কিন্তু সংবৃত উচ্চারণে চোয়ালের ফাঁক কম ও ঠোট গোলাকৃত হয়ে ‘ও’—এর মতো উচ্চারিত হয়। সংবৃত উচ্চারণকে ‘বিকৃত’, ‘অপ্রকৃত’ বা ‘অস্বাভাবিক’ উচ্চারণ বলা ঠিক নয়। সংবৃত উচ্চারণও ‘স্বাভাবিক’, ‘অবিকৃত’ ও ‘প্রকৃত’ উচ্চারণ।

(ক) শব্দের আদিতে

১. পরবর্তী স্বর সংবৃত হলে শব্দের আদি ‘অ’ সংবৃত হয়। যেমন— অতি (ওতি), করুণ (কোরুণ), করে (অসমাপিকা ‘কোরে’)। কিন্তু সমাপিকা ‘করে’ শব্দের ‘অ’ বিবৃত।
২. পরবর্তী ই, উ— ইত্যাদির প্রভাবে পূর্ববর্তী র-ফলাযুক্ত ‘অ’ সংবৃত হয়। যেমন— প্রতিভা (প্রোতিভা), প্রচুর (প্রোচুর) ইত্যাদি। কিন্তু অ, আ ইত্যাদির প্রভাবে পূর্ব ‘অ’ বিবৃত হয়। যেমন—প্রভাত, প্রত্যয়, প্রগাম ইত্যাদি।

(খ) শব্দের মধ্যে ও অন্তে

১. তর, তম, তন প্রত্যয়যুক্ত বিশ্লেষণ পদের অন্ত্য স্বর ‘অ’ সংবৃত হয়। যেমন— প্রিয়তম (প্রিয়তমো), গুরুতর (গুরুতরো) ইত্যাদি।
২. ই, উ—এর পরবর্তী মধ্য ও অন্ত্য ‘অ’ সংবৃত। যেমন— পিয় (পিয়ো), যাবতীয় (যাবতীয়ো) ইত্যাদি।

আ : বাঙ্গায় আ—ধ্বনি একটি বিবৃত স্বর। এর উচ্চারণ ত্বরিত ও দীর্ঘ দু—ই হতে পারে। এর উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজি ফাদার (father) ও কাম (calm) শব্দের আ (a)—এর মতো। যেমন— আপন, বাড়ি, মা, দাতা ইত্যাদি।

বাঙ্গায় একাক্ষর (Monosyllabic) শব্দে আ দীর্ঘ হয়। যেমন— কাজ শব্দের আ দীর্ঘ এবং কাল শব্দের আ ত্বরিত। এরূপ— যা, পান, ধান, সাজ, চাল, টাঁদ, বাঁশ।

ই ই : বাঙ্গায় সাধারণত ত্বরিত ই—ধ্বনি এবং দীর্ঘ ই—ধ্বনির উচ্চারণে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। একাক্ষর শব্দের ই এবং ই— দুটোই দীর্ঘ হয়। যেমন— বিষ, বিশ, দীন, দিন, শীত।

উ উ : বাঙ্গায় উ এবং উ ধ্বনির উচ্চারণে তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। ই ই—ধ্বনির মতো একাক্ষর শব্দে এবং বহু অক্ষর—বিশিষ্ট শব্দের বস্থাক্ষরে বা প্রাণিক যুক্তাক্ষরে উচ্চারণ সামান্য দীর্ঘ হয়। যেমন— চুল (দীর্ঘ), চুলা (ত্বরিত), ভূত, মৃত্ত, তুলতুলে, তুফান, বহু, অঙ্গু, করুণ।

ঝ : স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হলে খ—এর উচ্চারণ রি অথবা রী—এর মতো হয়। আর ব্যঙ্গন ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হলে র—ফলা+ ই—কার এর মতো হয়। যেমন— ঝণ, ঝতু, (রীন, রীতু), মাতৃ (মাত্রি), কৃষ্টি (ক্রিষ্টি)।

ঝঁ ম্রঁ ম্রঁ : বাঙ্গায় ঝ—ধ্বনিকে স্বরধ্বনি বলা চলে না। সংস্কৃতে এই ধ্বনিটি স্বরধ্বনিযুক্তে উচ্চারিত হয়।

সংকৃত প্রয়োগ অনুসারেই বাংলা বর্ণমালায় এটি স্বরবর্ণের মধ্যে রাখিত হয়েছে।

এ : এ-ধ্বনির উচ্চারণ দুই রকম : সংবৃত ও বিবৃত। যেমন – মেঘ, সংবৃত/বিবৃত, খেলা-(খ্যাল), বিবৃত।

১. সংবৃত

ক) পদের অন্তে ‘এ’ সংবৃত হয়। যেমন— পথে, ঘাটে, দোষে, গুণে, আসে ইত্যাদি।

খ) তৎসম শব্দের প্রথমে ব্যঙ্গনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত এ-ধ্বনির উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন— দেশ, প্রেম, শেষ ইত্যাদি।

গ) একাক্ষর সর্বনাম পদের ‘এ’ সংবৃত হয়। যেমন— কে, সে, যে।

ঘ) ‘হ’ কিংবা আকারবিহীন যুক্তধ্বনি পরে থাকলে ‘এ’ সংবৃত হয়। যেমন— দেহ, কেহ, কেহ্ত।

ঙ) ‘ই’ বা ‘উ’-কার পরে থাকলে ‘এ’ সংবৃত হয়। যেমন – দেৰি, রেণু, বেলু।

২. বিবৃত : ‘এ’ ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ ইংরেজি ক্যাট (cat) ও ব্যাট (bat)-এর ‘এ’ (a)-এর মতো। যেমন— দেখ (দ্যাখ), একা (এ্যাকা) ইত্যাদি।

এ-ধ্বনির এই বিবৃত উচ্চারণ কেবল শব্দের আদিতেই পাওয়া যায়, শব্দের মধ্যে ও অন্তে পাওয়া যায় না।

ক) দুই অক্ষর বিশিষ্ট সর্বনাম বা অব্যয় পদে— যেমন : এত, হেন, কেন ইত্যাদি। কিন্তু ব্যতিক্রম— যেথা, সেথা, হেথা।

খ) অনুস্বার ও চল্লম্বিদু যুক্ত ধ্বনির আগের এ-ধ্বনি বিবৃত। যেমন— খেঢ়ো, চেঢ়ো, স্যান্ডেলে, গৈঞ্জেল।

গ) খাঁটি বাংলা শব্দে : যেমন— খেমটা, চেপসা, তেলাপোকা, তেনা, দেৱৰ।

ঘ) এক, এগার, তের – এ কয়টি সংখ্যাবাচক শব্দে, ‘এক’ যুক্ত শব্দেও : যেমন— একচোট, একতলা, একঘরে ইত্যাদি।

ঙ) ক্রিয়াপদের বর্তমান কালের অনুভায়, তুচ্ছার্থ ও সাধারণ মধ্যম পুরুষের ঝুপে; যেমন— দেখ (দ্যাখ), দেখ (দ্যাখো), খেল (খ্যাল), খেল (খ্যালো), ফেল (ফ্যাল), ফেল (ফ্যালো) ইত্যাদি।

ঐ : এ ধ্বনিটি একটি যৌগিক স্বরধ্বনি। অ + ই কিংবা ঔ + ই = অই, উই। অ এবং ই- এ দুটো স্বরের মিলিত ধ্বনিতে ঐ-ধ্বনির সূক্ষ্ম হয়। যেমন – ক + অ + ই = কই, কৈ; ব + ই + থ = বৈথ ইত্যাদি। এবুপ – বৈদেশিক, ঐক্য, চৈতন্য।

ও : বাংলা একাক্ষর শব্দে ও-কার দীর্ঘ হয়। যেমন— গো, জোর, রোগ, ডোর, কোন, বোন ইত্যাদি। অন্যত্র সাধারণত ত্রুট্য হয়। যেমন— সোনা, কারো, পুরোভাগ। ও-এর উচ্চারণ ইংরেজি বোট (boat) শব্দের (oa)-এর মতো।

ব্যঙ্গনথনির উচ্চারণ

ক-বর্গীয় ধ্বনি : ক খ গ ঘ ঙ— এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার গোড়ার দিকে নরম তালুর পচাঃ ভাগ স্পর্শ করে। এগুলো জিহ্বামূলীর বা কষ্ট্য স্পর্শধ্বনি।

চ-বর্গীয় ধ্বনি : চ ছ ঝ ঝ এঁ—এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ চ্যাপটাভাবে তালুর সম্মুখ ভাগের সঙ্গে ঘর্ষণ করে। এদের বলা হয় তালব্য স্পর্শধ্বনি।

ট-বর্গীয় ধ্বনি : ট ঠ ড ঢ ণ— এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎও উল্টিয়ে উপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশকে স্পর্শ করে। এগুলোর উচ্চারণে জিহ্বা উল্টা হয় বলে এদের নাম দস্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি। আবার এগুলো উপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশ অর্থাৎ মূর্ধায় স্পর্শ করে উচ্চারিত হয় বলে এদের বলা হয় মূর্ধন্য ধ্বনি।

ত-বর্গীয় ধ্বনি : ত থ দ ধ ন— এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা সম্মুখে প্রসারিত হয় এবং অগ্রভাগ উপরের দাঁতের পাটির গোড়ার দিকে স্পর্শ করে। এদের বলা হয় দস্ত্য ধ্বনি।

প-বর্গীয় ধ্বনি : প ফ ব ড ম— এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে উল্টের সঙ্গে অধরের স্পর্শ ঘটে। এদের উল্ট্যধ্বনি বলে।

জ্ঞাতব্য

(১) ক থেকে ম পর্যন্ত পাঁচটি বর্ণে মোট পাঁচশটি ধ্বনি। এসব ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার সঙ্গে অন্য বাগমন্ত্রের কোনো কোনো অংশের কিংবা উল্টের সঙ্গে অধরের স্পর্শ ঘটে; অর্থাৎ এদের উচ্চারণে বাক্প্রত্যঙ্গের কোথাও না কোথাও ফুসফুসতাড়িত বাতাস বাধা পেয়ে বেরিয়ে যায়। বাধা পেয়ে স্পষ্ট হয় বলে এগুলোকে বলে স্পর্শ ধ্বনি।

(২) ঙ এঁ ণ ন ম— এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে নাক ও মুখ দিয়ে কিংবা কেবল নাক দিয়ে ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বের হয় বলে এদের বলা হয় নাসিক্য ধ্বনি এবং প্রতীকী বর্ণগুলোকে বলা হয় নাসিক্য বর্ষ।

(৩) * চম্পুকিদু চিহ্ন বা প্রতীকটি পরবর্তী স্বরধ্বনির অনুনাসিকতার দ্যোতনা করে। এজন্য এটিকে অনুনাসিক ধ্বনি এবং প্রতীকটিকে অনুনাসিক প্রতীক বা বর্ষ বলে। যেমন— আঁকা, চাঁদ, বাঁধ, বাঁকা, শাস ইত্যাদি।

(৪) বাল্লায় ঙ এবং ৎ বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনিদ্বয়ে কোনো পার্থক্য লক্ষিত হয় না। যেমন—ঝঁ / রঁ, অহঁকার / অহঞ্জকার ইত্যাদি।

(৫) এও বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনি অনেকটা ‘ইয়’—এর উচ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনির মতো। যেমন— ভুঁএঁ (ভুঁইয়া)।

(৬) চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে থাকলে এঁ—এর উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। যেমন— জঁজাল, খঁজ ইত্যাদি।

(৭) বাল্লায় ৎ এবং ন-বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনি দুটির উচ্চারণে কোনো পার্থক্য নেই। কেবল ট-বর্গীয় ধ্বনির আগে যুক্ত হলে ৎ—এর মূর্ধন্য উচ্চারণ পাওয়া যায়। যেমন— ঘঁটা, লঁষ্টন ইত্যাদি।

- (৮) ঙ ৎ এ – এ তিনটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি কখনো শব্দের প্রথমে আসে না, শব্দের মধ্যে কিংবা শেষে আসে। সুতরাং এসব ধ্বনির প্রতীক বর্ণও শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হয় না, শব্দের মধ্যে বা অন্তে ব্যবহৃত হয়। যেমন— সঞ্জ বা সংঘ, ব্যাঙ বা ব্যাং, অঞ্জনা, সৃঞ্জা, ক্ষণ ইত্যাদি।
- (৯) ন–বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত তিন জায়গায়ই ব্যবহৃত হয়। যেমন— নাম, বানান, বন ইত্যাদি।

অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ এবং ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি

স্পর্শধ্বনি বা বর্গীয় ধ্বনিগুলোকে উচ্চারণরীতির দিক থেকে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ, অঘোষ ও ঘোষ প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা হয়।

অল্পপ্রাণ ধ্বনি : কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় না। এরূপ ধ্বনিকে বলা হয় অল্পপ্রাণ ধ্বনি (Unaspirated)। যেমন— ক, গ ইত্যাদি।

মহাপ্রাণ ধ্বনি : কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয়। এরূপ ধ্বনিকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি (Aspirated)। যেমন— খ, ঘ ইত্যাদি।

অঘোষ ধ্বনি : কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতত্ত্বী অনুরণিত হয় না। তখন ধ্বনিটির উচ্চারণ গার্জীর্যহীন ও মৃদু হয়। এরূপ ধ্বনিকে বলা হয় অঘোষ ধ্বনি (Unvoiced)। যেমন— ক, খ ইত্যাদি।

ঘোষ ধ্বনি : ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতত্ত্বী অনুরণিত হলে ঘোষ ধ্বনি (Voiced) হয়। যেমন— গ, ঘ ইত্যাদি।

অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ এবং অঘোষ ও ঘোষ স্পর্শ ব্যঞ্জন ও নাসিক্য ব্যঞ্জনগুলোকে নিচের ছকে দেখানো হলো—

উচ্চারণ স্থান	অঘোষ (Voiceless)		ঘোষ (Voiced)		
	(১) অল্পপ্রাণ (Unaspirated)	(২) মহাপ্রাণ (Aspirated)	(৩) অল্পপ্রাণ (Unaspirated)	(৪) মহাপ্রাণ (Aspirated)	(৫) নাসিক্য
কঠ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঝঁ
মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ	প	ফ	ব	ভ	ম

অন্তঃস্থ ধ্বনি : স্পর্শ বা উচ্চ ধ্বনির অন্তরে অর্থাৎ মাঝে আছে বলে য র ল ব—এ ধ্বনিগুলোকে অন্তঃস্থ ধ্বনি বলা হয় আর বর্ণগুলোকে বলা হয় অন্তঃস্থ বর্ণ।

য : য—বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি সাধারণত সম্মুখ তালু স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়। এজন্য এ ধ্বনিটিকে বলা হয় তালব্য ধ্বনি। শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হলে বাঞ্ছায় এর উচ্চারণ ‘জ’—এর মতো। যেমন— যখন, যাবেন, যুদ্ধ, যম ইত্যাদি। শব্দের মধ্যে বা অন্তে (সংস্কৃত নিয়মানুযায়ী) ব্যবহৃত হলে ‘য’ উচ্চারিত হয়। যেমন— বি + যোগ = বিয়োগ।

র : র—বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি জিহ্বার অগ্রভাগকে কম্পিত করে এবং তারা দন্তমূলকে একাধিকবার দুট আঘাত করে উচ্চারিত হয়। জিহ্বাগুলকে কম্পিত করা হয় বলে এ ধ্বনিকে কম্পনজ্ঞাত ধ্বনি বলা হয়। উদাহরণ— রাহাত, আরাম, বাজার ইত্যাদি।

ল : ল—বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগকে মুখের মাঝামাঝি দন্তমূলে ঠেকিয়ে রেখে জিহ্বার দুই পাশ দিয়ে মুখবিবর থেকে বায়ু বের করে দেয়া হয়। দুই পাশ দিয়ে বায়ু নিঃসৃত হয় বলে একে পার্শ্বিক ধ্বনি বলা হয়। যেমন— লাল, লতা, কলরব, ফল, ফসল।

ব : বাঞ্ছা বর্ণমালায় বর্গীয়—ব এবং অন্তঃস্থ—ব—এর আকৃতিতে কোনো পার্থক্য নেই। আগে বর্গীয় ও অন্তঃস্থ— এ দুই রকমের ব—এর লেখার আকৃতিও পৃথক ছিল, উচ্চারণও আলাদা ছিল। এখন আকৃতি ও উচ্চারণ অভিন্ন বলে অন্তঃস্থ—ব কে বর্ণমালা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তঃস্থ ‘য’ ও অন্তঃস্থ ‘ব’— এ দুটো অর্ধব্যবর (Semivowel)। প্রথমটি অয় বা ইয় (y) এবং দ্বিতীয়টি অব বা অও (w)—র মতো। যেমন— নেওয়া, হওয়া ইত্যাদি।

উচ্চধ্বনি : যে ব্যঙ্গনের উচ্চারণে বাতাস মুখবিবরে কোথাও বাধা না পেয়ে কেবল ঘর্ষণপ্রাপ্ত হয় এবং শিশধ্বনির সৃষ্টি করে, সেটি উচ্চধ্বনি। যেমন— আশীর, শিশি, শিশু ইত্যাদি। শিশ দেয়ার সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে বলে একে শিশধ্বনিও বলা হয়।

শ, ষ, স – তিনটি উচ্চ বর্ণ। শ—বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান পশ্চাত দন্তমূল। ষ—বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান মূর্ধা এবং স—বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান দন্ত।

লক্ষণীয় : স—এর সঙ্গে খ র ত থ কিংবা ন যুক্ত হলে স—এর দন্ত্য উচ্চারণ হয়। যেমন— স্থলন, স্থৰ্ষ্টা, আস্ত, স্থাপন, স্নেহ ইত্যাদি। আবার বানানে (লেখায়) শ থাকলেও উচ্চারণ দন্ত্য—স হয়। যেমন— শ্রমিক (স্ত্রমিক), শৃঙ্খল (সৃঙ্খল), প্রশ্ন (প্রস্ন)।

অঘোষ অঘোষ ও অঘোষ মহাপ্রাণ মূর্ধন্যধ্বনি(ট ও ঠ)—এর আগে এগে স—এর উচ্চারণ মূর্ধন্য য হয়। যেমন— কষ্ট, কাষ্ট ইত্যাদি।

হ : হ—বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনিটি কষ্টনালীতে উৎপন্ন মূল উচ্চ ঘোষধ্বনি। এ উচ্চধ্বনিটি উচ্চারণের সময় উন্নুক্ত কঠের মধ্য দিয়ে বাতাস জোরে নির্গত হয়। যেমন— হাত, মহা, পহেলা ইত্যাদি।

ঁ (অনুস্বার) : ঁ এর উচ্চারণ ঙ—এর উচ্চারণের মতো। যেমন— রঁ (রঙ), বাঞ্ছা (বাঞ্ছা) ইত্যাদি। উচ্চারণে অভিন্ন হয়ে যাওয়ায় ঁ—এর বদলে ঙ এবং ঙ—এর বদলে ঁ—এর ব্যবহার খুবই সাধারণ।

ঃ (বিসর্গ) : বিসর্গ হলো অধোষ ‘হ’-এর উচ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনি। হ-এর উচ্চারণ ঘোষ, কিন্তু ঃ এর উচ্চারণ অধোষ। বাংলায় একমাত্র বিজ্ঞাদি প্রকাশক অব্যয়েই বিসর্গের ধ্বনি শোনা যায়। যথা— আঃ, উঃ, ওঃ, বাঃ ইত্যাদি। সাধারণত বাংলায় শব্দের অন্তে বিসর্গ প্রায়ই অনুচারিত থাকে। যেমন— বিশেষতঃ (বিশেষত), ফলতঃ (ফলত)। পদের মধ্যে বিসর্গ থাকলে প্রবর্তী ব্যঙ্গন দ্বিতৃ হয়। যেমন— দুঃখ (দুখখ), প্রাতঃকাল (প্রাতককাল)।

ডঃ ও ঢঃ : ডঃ ও ঢঃ-বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি জিহ্বার অগভাগের তলদেশ ধারা অর্ধাং উল্টো পর্টের ধারা ওপরের দস্তমূলে দ্রুত আসাত বা তাড়না করে উচ্চারিত হয়। এদের কলা হয় তাড়নজ্ঞাত ধ্বনি। ডঃ-এর উচ্চারণ ড এবং র-এর দ্যোতিত ধ্বনিদ্বয়ের মাঝামাঝি এবং ঢঃ-এর উচ্চারণ ডঃ এবং হ-এর ধারা দ্যোতিত ধ্বনিদ্বয়ের দ্রুত মিলিত ধ্বনি। যেমন— বডঃ, গাঢঃ, রাঢঃ, ইত্যাদি।

সংযুক্ত ব্যঙ্গনধ্বনি ও যুক্ত ব্যঙ্গনবর্ণ

দুটি বা তার চেয়ে বেশি ব্যঙ্গনধ্বনির মধ্যে কোনো স্বরধ্বনি না থাকলে সে ব্যঙ্গনধ্বনি দুটি বা ধ্বনি কয়টি একত্রে উচ্চারিত হয়। এরূপ যুক্তব্যঙ্গনধ্বনির দ্যোতনার জন্য দুটি বা অধিক ব্যঙ্গনবর্ণ একত্রিত হয়ে সংযুক্ত বর্ণ (ligature) গঠিত হয়। সাধারণত এরূপে গঠিত সংযুক্ত ব্যঙ্গনবর্ণের মূল বা আকৃতি পরিবর্তিত হয়। যেমন— তক্তা (ত + অ + ক + ত + আ = তক্তা)। এখানে দ্বিতীয় বর্ণ ক ও ত-এর মূল রূপ পরিবর্তিত হয়ে ক্ত হয়েছে। বাংলা ভাষায় সাধারণত তিনভাবে সংযুক্ত ব্যঙ্গন গঠিত হতে পারে। যথা :

ক. কার সহযোগে

খ. ফলা সহযোগে

গ. ব্যঙ্গনবর্ণের সঙ্গে ব্যঙ্গনবর্ণ (ফলা ব্যতীত) সহযোগে।

ক. কার সহযোগে : স্বরবর্ণ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যঙ্গনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে তাকে বলে ‘কার’। অ-তিন্ন অন্য দশটি স্বরধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপ হয়। সুতরাং বাংলায় কার দশটি। এগুলো যথাক্রমে :

আ-কার (।) — বাবা, মা, চাকা;

খ-কার (ঁ) — কৃতী, গৃহ, স্তৃত;

ই-কার (ঁ) — পাখি, বাড়ি, চিনি;

এ-কার (ে) ছেলে, মেয়ে, খেয়ে;

ঈ-কার (ী) — নীতি, শীত, স্তৰী;

ঐ-কার (ৈ) — বৈশাখ, চৈত্র, ধৈর্য;

উ-কার (ু) — খুবু, বুবু, ফুফু;

ও-কার (ৌ) দোলা, তোতা, খোকা;

উ-কার (ঁ) — মূল্য, চূর্ণ, পূজা;

ঐ-কার (ঁৌ) শৌষ, শৌতম, ক্ষেতুক।

খ.১. ফলা সহযোগে : ব্যঙ্গনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে ফলা। ফলা যুক্ত হলে বর্ণের আকারের পরিবর্তন সাধিত হয়। বাংলা ব্যঙ্গনবর্ণের ফলা ছয়টি। যেমন—

ণ/ ন-ফলা (ণ/ ন/)- চিহ্ন, রত্ন, পূর্বাঙ্গ, অপরাঙ্গ, বিষু, কৃষ্ণ। চিহ্ন-র + এবং কৃষ্ণ-র ৩

ব- ফলা (ব)- বিশ্বাস, নিঃস্ব, নিতম্ব।

ম- ফলা (ম)- তন্মায়, পদ্ম, আআ।

য- ফলা (ঝ) - সহ্য, অত্যন্ত, বিদ্যা।

র- ফলা (ৱ)- গ্রহ, ব্রত, স্মর্তী।

(‘রেফ) – বর্ণ, স্বর্ণ, তর্ক, খর্ব।

ল- ফলা (ল)- ক্লান্ত, অল্লান, উল্লাস।

খ. ২. বাংলা স্বরবর্ণের সঙ্গেও ফলা যুক্ত হয়। যথা- এ্যাপোলো, এ্যাটম, অ্যাটর্নি, অ্যালার্ম ধ্বনি ইত্যাদি।

খ. ৩. বাংলা যুক্ত ব্যঞ্জনের সাথেও কার এবং ফলা যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হয়। যেমন – সন্ন্যাস, সৃষ্টি, বৃক্ষিণী, সম্ম্যা, ইত্যাদি।

কতিপয় সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ।

দুই বর্ণের যুক্ত:

ক = ক+ক। যেমন- পাকা, ছকা, চকু।

ক্ত = ক+ত। যেমন- রক্ত, শক্ত, ভক্ত।

ক্ষ= ক+খ। (উচ্চারণ ক+খ-এর মতো) যেমন- শিক্ষা, বক্ষ, রক্ষ।

অ= ক+স। বাক্স।

ঙক= ঙ+ক। যেমন- অঙ্ক, কঙ্কাল, লঙ্কা।

ঙখ= ঙ+খ। যেমন- শৃঙ্খলা, শঙ্খ।

ঙ্গ= ঙ+গ। যেমন- অঙ্গা, মঙ্গল, সঙ্গীত।

ঙ্ঘ= ঙ+ঘ। যেমন- সঙ্ঘ, লঙ্ঘন।

চ= চ+চ। যেমন- উচ্চ, উচ্চারণ, উচ্চকিত।

ছ= চ+ছ। যেমন- উচ্ছল, উচ্ছৃঙ্খল, উচ্ছেদ।

জ্জ= জ্জ+জ। যেমন- উজ্জীবন, উজ্জীবিত।

ঞ্জ= জ্জ+ঝ। যেমন- কুঞ্জটিকা।

জ= জ্জ + এও। যেমন- উচ্চারণ ‘গ্ৰাহ্য’- এর মতো) যেমন- জ্ঞান, সংজ্ঞা, বিজ্ঞান।

ঘও (ঘও)= এও+চ। যেমন- অঘোল, সঘওয়, পঘওম।

ঙ্গ= এও+ছ। যেমন- বাঙ্গিত, বাঙ্গনীয়, বাঙ্গ।

ঞ্জ= এও+জ। যেমন- গঞ্জ, রঞ্জন, বুঞ্জ।

ঞও = এও+বা। যেমন- বাঞ্চা, বাঞ্চাট।

[বি. দ্র. উপর্যুক্ত চারটি সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ ‘ন’ হলে ও লেখার সময় কথনো ন্ত (অন্তল), ন্ত ছ (বান্তছ), ন্তজ (গন্তজ), ন্তবা (বান্তবা) রূপে লেখা ঠিক নয়।]

উ= ট + ট। যেমন- অট্টালিকা, চট্টোপাধ্যায়, চট্টগ্রাম।

ড= দ্র + ড। যেমন- গড্ডালিকা, উড্ডীন, উড্ডয়ন।

ণ= ণ + ট। যেমন- ঘণ্টা, বণ্টন।

স্ত= ত + ত। যেমন- উস্তুম, বিস্ত, চিস্ত।

থ= ত + থ। যেমন- উথান, উথিত, অভুথান।

দ্দ= দ্র + দ। যেমন- উদ্দাম, উদ্দীপক, উদ্দেশ্য।

ম্ধ= দ্র + থ। যেমন- উম্ধত, উম্ধৃত, পম্ধতি।

ঞ্জ= দ্র + ঙ। যেমন- উঞ্জব, উঞ্জট, উঞ্জিদ।

ঙ্গ= ন + ত। যেমন- অঙ্গ, দঙ্গ, কাঙ্গ।

ন্দ= ন + দ। যেমন- আনন্দ, সন্দেশ, কন্দী।

ন্ধ= ন + থ। যেমন- বন্ধন, রন্ধন, সন্ধান।

ন্ন= ন + ন। যেমন- অন্ন, ছিন্ন, ভিন্ন।

ন্ম= ন + ম। যেমন- জন্ম, আজন্ম।

প্ত= প + ত। যেমন- রপ্ত, ব্যাপ্ত, লিপ্ত।

প্প= প + প। যেমন- পাপ্পা, পাপ্পু, ধাপ্পা।

প্স= প + স। যেমন- লিপ্সা, অভীপ্সা।

ব্দ= ব্র + দ। যেমন- অব্দ, জব্দ, শব্দ।

ক্ষ= শ্র + ক। যেমন- উক্ষা, বক্ষল।

ঝ= শ্র + গ। যেমন- ফাঝুন।

ষ্ট= শ্র + ট। যেমন- উল্টা।

ঝক= শ্র + ক। যেমন- শুষক, পরিষ্কার, বহিষ্কার।

ঝক= শ্র + ক। যেমন- স্কুল, স্কুল্য।

স্থ= শ্র + থ। যেমন- স্থলন।

স্ট= শ্র + ট। যেমন- আগস্ট, স্টেশন।

স্ত= শ্র + ত। যেমন- অস্ত, সম্তা, স্তন্থ।

স্প= শ্র + প। যেমন- স্পষ্ট, সম্পদন, স্পর্ধা।

স্ফ= শ্র + ফ। যেমন- স্ফটিক, প্রস্ফুটিত।

স্ম= শ্র + ম। যেমন- ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ।

এছাড়া বাংলা ভাষায় দুইয়ের অধিক বর্ণ সংযোগেও কিছু সংযুক্ত বর্ণ গঠিত হয়। সূচ শব্দে এই বর্ণ= ক্ + ষ+ম- ফলা ; স্বাতন্ত্র্য শব্দের ত্র্য=ন+ত+র-ফলা (্) +য-ফলা (়) ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধ্বনির পরিবর্তন

ভাষার পরিবর্তন ধ্বনির পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। ধ্বনি পরিবর্তন নানা প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো।

১. আদি স্বরাগম (Prothesis) : উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোনো কারণে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি এলে তাকে বলে আদি স্বরাগম (Prothesis)। যেমন – স্কুল > ইস্কুল, স্টেশন > ইস্টেশন। এবুপ – আস্তাবল, আস্পর্দা।

২. মধ্য স্বরাগম, বিপ্রকর্ব বা স্বরভঙ্গি (Anaptyxis) : সময় সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঙ্গন-ধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে। একে বলা হয় মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ব বা স্বরভঙ্গি। যেমন –

অ – রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম, স্বপ্ন > স্বপন, হর্ষ > হরষ ইত্যাদি।

ই – প্রীতি > পিরীতি, ক্লিপ > কিলিপ, ফিলু > ফিলিম ইত্যাদি।

উ – মুক্তা > মুকুতা, তুর্ক > তুরুক, ত্বু > ভুরু ইত্যাদি।

এ – গ্রাম > গেরাম, প্রেক > পেরেক, স্ট্রেফ > সেরেফ ইত্যাদি।

ও – শ্লোক > শোলোক, মুরগ > মুরোগ > মোরগ ইত্যাদি।

৩. অন্ত্যস্বরাগম (Apothesis) : কোনো কোনো সময় শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে। এবুপ স্বরাগমকে বলা হয় অন্ত্যস্বরাগম। যেমন – দিশৃ > দিশা, পোখত্ত > পোক্ত, বেঞ্চ > বেঞ্চিং, সত্য > সত্যি ইত্যাদি।

৪. অপিনিহিতি (Apenthesis) : পরের ই-কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঙ্গনধ্বনির আগে ই-কার বা উ-কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন – আজি > আইজ, সাখু > সাউথ, রাখিয়া > রাইখ্যা, বাক্য > বাইক্য, সত্য > সহিত্য, চারি > চাইর, মারি > মাইর ইত্যাদি।

৫. অসমীকরণ (Dissimilation) : একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনি যুক্ত হয় তখন তাকে বলে অসমীকরণ। যেমন – ধপ + ধপ > ধপাধপ, টপ + টপ > টপাটপ ইত্যাদি।

৬. স্বরসংজ্ঞাতি (Vowel harmony) : একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসংজ্ঞাতি বলে। যেমন – দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিতি, মূলা > মুলো ইত্যাদি।

৭. প্রগত (Progressive) : আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে প্রগত স্বরসংজ্ঞাতি হয়। যেমন – মূলা > মুলো, শিকা > শিকে, তুলা > তুলো।

৮. পরাগত (Regressive) : অন্ত্যস্বরের কারণে আদিস্বর পরিবর্তিত হলে পরাগত স্বরসংজ্ঞাতি হয়। যেমন – আখো > আখুয়া > এখো, দেশি > দিশি।

- গ. মধ্যগত (**Mutual**) : আদ্যস্বর ও অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তিত হলে মধ্যগত স্বরসংজ্ঞাতি হয়। যেমন – কিলাতি > বিলিতি।
- ঘ. অন্যেন্য (**Reciprocal**) : আদ্য ও অন্ত্য দুই স্বরই পরস্পর প্রভাবিত হলে অন্যেন্য স্বরসংজ্ঞাতি হয়। যেমন – মোজা > মুজো।
- ঙ. চলিত বাংলায় স্বরসংজ্ঞাতি : গিলা > গেলা, মিলামিশা > মেলামেশা, মিঠা > মিঠে, ইচ্ছা > ইচ্ছে ইত্যাদি। পূর্বস্বর উ-কার হলে পরবর্তী স্বর উ-কার হয়। যেমন – মুড়া > মুড়ো, চুলা > চুলো ইত্যাদি। বিশেষ নিয়মে – উডুনি > উড়নি, এখনি > এখনি হয়।
৭. সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ : দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ। যেমন – বসতি > বস্তি, জানালা > জানুলা ইত্যাদি।
- ক. আদিস্বরলোপ (**Aphesis**) : যেমন – অলাবু > লাবু > লাট, উদ্ধার > উধার > ধার।
- খ. মধ্যস্বর লোপ (**Syncope**) : অগুরু > অগু, সুবর্ণ > বর্ণ।
- গ. অন্ত্যস্বর লোপ (**Apocope**) : আশা > আশ, আজি > আজ, চারি > চার (বাংলা), সম্ব্যা > সঞ্চ্চা > সঁচা। (স্বরলোপ কম্তুল স্বরাগমের বিপরীত প্রক্রিয়া।)
৮. ধ্বনি বিপর্যয় : শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। যেমন – ইঁহোঁজি বাক্স > বাংলা বাস্ক, জাপানি রিক্সা > বাংলা রিস্কা ইত্যাদি। অনুরূপ – পিশাচ > পিচাশ, শাফ > ফাল।
৯. সমীক্ষণ (Assimilation) : শব্দমধ্যস্থ দুটি ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প-বিস্তর সমতা লাভ করে। এ ব্যাপারকে বলা হয় সমীক্ষণ। যেমন – জন্ম > জন্ম, কাঁদনা > কান্দা ইত্যাদি।
- ক. প্রগত (**Progressive**) সমীক্ষণ : পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। অর্ধাং পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনির মতো হয়, একে বলে প্রগত সমীক্ষণ। যেমন – চক্র > চক্র, পক্ষ > পক্ষক, পদ্ম > লঙ্গ ইত্যাদি।
- খ. পরাগত (**Regressive**) সমীক্ষণ : পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হয়, একে বলে পরাগত সমীক্ষণ। যেমন – তৎ + জন্য > তজ্জন্য, তৎ + হিত > তাত্ত্বিত, উৎ + মুখ > উন্মুখ ইত্যাদি।
- গ. অন্যেন্য (**Mutual**) সমীক্ষণ : যখন পরস্পরের প্রভাবে দুটো ধ্বনিই পরিবর্তিত হয় তখন তাকে বলে অন্যেন্য সমীক্ষণ। যেমন – সংস্কৃত সত্য > প্রাকৃত সচ। সংস্কৃত বিদ্যা > প্রাকৃত বিজ্ঞা ইত্যাদি।
১০. বিষমীক্ষণ (**Dissimilation**) : দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীক্ষণ বলে। যেমন – শরীর > শরীল, লাল > নাল ইত্যাদি।
১১. দ্বিতীয় ব্যঞ্জন (**Long Consonant**) বা ব্যঞ্জনদ্বিত্বা : কখনো কখনো জ্বোর দেয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিতীয় উচ্চারণ হয়, একে বলে দ্বিতীয় ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্বা। যেমন – পাকা > পাকা, সকাল > সকাল ইত্যাদি।

১২. ব্যঞ্জন বিকৃতি : শব্দ-মধ্যে কোনো কোনো সময় কোনো ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয়। একে বলে ব্যঞ্জন বিকৃতি। যেমন— কবাট > কপাট, খোবা > খোগা, ধাইমা > দাইমা ইত্যাদি।

১৩. ব্যঞ্জনচূড়ান্তি : পাশাপাশি সমউচ্চারণের দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায়। এরূপ লোপকে বলা হয় ধ্বনিচূড়ান্তি বা ব্যঞ্জনচূড়ান্তি। যেমন— বড়দিদি > বড়ি, বড় দাদা > বড়দা ইত্যাদি।

১৪. অন্তর্হৃতি : পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে অন্তর্হৃতি। যেমন— ফালুন > ফাগুন, ফলাহার > ফলার, আলাহিদা > আলাদা ইত্যাদি।

১৫. অভিশৃতি (Umlaut) : বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং তদন্তসারে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলে অভিশৃতি। যেমন— করিয়া থেকে অপিনিহিতির ফলে ‘কইরিয়া’ কিংবা বিপর্যয়ের ফলে ‘কইরা’ থেকে অভিশৃতিজ্ঞত ‘করে’। এরূপ— শুনিয়া > শুনে, বলিয়া > বলে, হাটুয়া > হাউটা > হেটো, মাছুয়া > মেছো ইত্যাদি।

১৬. র-কার লোপ : আধুনিক চলিত ভাষায় অনেক ক্ষেত্রে র-কার লোপ পায় এবং পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন দিত্ব হয়। যেমন— তর্ক > তক, করতে > কত্তে, মারল > মাল্ল, করলাম > কল্লাম।

১৭. হ-কার লোপ : আধুনিক চলিত ভাষায় অনেক সময় দুই স্বরের মাঝামাঝি হ-কারের লোপ হয়। যেমন— পুরোহিত > পুরুত, গাহিল > গাইল, চাহে > চায়, সাধু > সাত্তু > সাউ, আরবি আল্লাহ্ > বাল্লা আল্লা, ফারসি শাহ্ > বাল্লা শা ইত্যাদি।

য়-শৃঙ্গি ও ব-শৃঙ্গি (Euphonic glides) : শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি থাকলে যদি এ দুটো স্বর মিলে একটি দ্বি-স্বর (যৌগিক স্বর) না হয়, তবে এ স্বর দুটোর মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটি ব্যঞ্জনধ্বনির মতো অন্তঃস্থ ‘য়’ (Y) বা অন্তঃস্থ ‘ব’ (W) উচারিত হয়। এই অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনিটিকে বলা হয় য়-শৃঙ্গি ও ব-শৃঙ্গি। যেমন— মা + আমার = মা (য়) আমার > মায়ামার। যা + আ = যা (ও) য়া = যাওয়া। এরূপ— নাওয়া, খাওয়া, দেওয়া ইত্যাদি।

অনুশীলনী

- ১। ধ্বনি ও বর্ণের সম্পত্তি লেখ এবং উদাহরণসহযোগে এদের পার্থক্য বুঝিয়ে দাও।
- ২। উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাল্লা স্মর্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে কী কী ভাগে ভাগ করা যায়?
- ৩। দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বর কাকে বলে? উদাহরণসহ বাল্লা যৌগিক স্বরগুলোর গঠনপ্রণালী বর্ণনা কর।
- ৪। উদাহরণসহ নিচের বর্ণগুলোর ধ্বনি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

ঙ, এঁ, ণ, ন, শ, ষ, স, ঁ, ৎ।

- ৫। নিচের শব্দগুলোর ঠিক উচ্চারণ পাশে লিখে দাও।
 দিতীয়, আতীয়, অবজ্ঞা, বিশ্ব, বিময়, সত্য, সহ্য।
 (নমুনা : ঝঁঝঁা – ঝনবা, কঢ়ক – কণ্টক)।
- ৬। সংজ্ঞা লেখ ও উদাহরণ দাও : সমীভূতন, বিপ্রকর্ষ, স্বরসঙ্গতি, অন্তর্হিতি, অপিনিহিতি, অভিশৃতি।
- ৭। ধৰনি পরিবর্তনের যে যে বিধানে নিম্নলিখিত শব্দসমূহ গঠিত হয়েছে, তা পাশাপাশি লিখে দাও।
 কপাট, জেলে, বৌদি, আলাদা।
- ৮। কৰ্ত্তনীর মধ্য থেকে ঠিক সুত্রাটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ কর।
 (অপিনিহিতি, ধৰনি-বিপর্যয়, স্বরধ্বনি লোপ, স্বরাগম, অভিশৃতি, স্বরসঙ্গতি, অসমীকরণ, বৰ্ণঘিতা)
 (ক) একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য ‘আ’ যুক্ত হলে তাকে বলে.....।
 (খ) শব্দের মধ্যে ই বা উ যথাস্থানের আগে উচ্চারিত হলে তাকে.....বলে।
 (গ) শব্দের মধ্যে দুটি সমধ্বনির একটি লোপ হলে তাকে বলে.....।
 (ঘ) জোর দেয়ার জন্য যখন শব্দের ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিতীয় উচ্চারণ হয় তখন তাকে.....বলা হয়।
 (ঙ) সম্মুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হলে তাকে.....বলে।
- ৯। নিচের বর্ণে দ্যোতিত ধৰনির নাম ডান পার্শ্বে লেখ (যেমন – ঘোষ, মহাশ্রাণ, কঠ্য ব্যঞ্জন)।
 ব, শ, ম, দ, খ, প, ঠ, হ, ক্ষ
- ১০। ঠিক উভয়ে টিক (✓) দাও।
 ট – কঠ্যবর্ণ, ম – ওষ্ঠ্যবর্ণ, গ – ঘোষবর্ণ, চ – দন্ত্যবর্ণ, ঘ – অঞ্চলপ্রাণ কঠ্যবর্ণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ণত্ব ও ষষ্ঠি বিধান

১. ণত্ব বিধান

বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য-ণ ধ্বনির ব্যবহার নেই। সেজন্য বাংলা (দেশি), তৎব ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য বর্ণ (ণ) লেখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাংলা ভাষায় বহু তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য-ণ এবং দণ্ড্য-ন-এর ব্যবহার আছে। তা বাংলায় অবিকৃতভাবে রাখিত হয়। তৎসম শব্দের বানানে ণ-এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ণত্ব বিধান।

ণ ব্যবহারের নিয়ম

১. ট-বর্গীয় ধ্বনির আগে তৎসম শব্দে সব সময় মূর্ধন্য ‘ণ’ যুক্ত হয়। যেমন— ঘট্টা, শঠন, কাণ্ড ইত্যাদি।
২. ঝ, র, ষ – এর পরে মূর্ধন্য ‘ণ’ হয়। যেমন— ঝণ, তৃণ, বর্ণ, বর্ণনা, কারণ, মরণ, ব্যাকরণ, ভীষণ, ভাষণ, উষণ ইত্যাদি।
৩. ঝ, র, ষ-এর পরে স্বরধ্বনি, য য ব হ এ এবং ক-বর্গীয় ও প-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে তার পরবর্তী ন মূর্ধন্য ‘ণ’ হয়। যেমন – কৃপণ (ঝ-কারের পরে প্, তার পরে ণ), হরিণ (র-এর পরে ই, তার পরে ণ, অর্গণ (ৱ + প. + অ+ণ), লক্ষণ (ক + ষ + অ + ণ)। এরূপ – বুঞ্জীণী, ব্রাঙ্গণ ইত্যাদি।
৪. কতকগুলো শব্দে স্বত্বাবত্তি ণ হয়

চাপক্য মাণিক্য গণ

বাণিজ্য লবণ মণ

বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।

কল্যাণ শোণিত মণি

স্থাণু গুণ পুণ্য বেণী

ফণী অণু বিপণি গণিকা।

আপণ লাবণ্য বাণী

নিপুণ ভণিতা পাণি

গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ।

চিরণ নিচ্ছণ কৃণ

কফণ (কলুই) বণিক গুণ

গণনা শিণাক পণ্য বাণ।

সমাসবস্থ শব্দে সাধারণত ণ-ত্ব বিধান থাটে না। এরূপ ক্ষেত্রে ন হয়। যেমন – ত্রিলয়ন, সর্বনাম, দুর্বীতি, দুর্নাম, দুর্নিবার, পরনিষ্ঠা, অঞ্চনায়ক। ত-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত ন কখনো ণ হয় না, ন হয়। যেমন – অন্ত, গ্রন্থ, ত্রস্তন।

২. ষ-স্ত্রি বিধান

বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য-ষ ধ্বনির ব্যবহার নেই। তাই দেশি, তঙ্গব ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ষ লেখার প্রয়োজন হয় না। কেবল কিছু তৎসম শব্দে ষ-এর প্রয়োগ রয়েছে। যে-সব তৎসম শব্দে ‘ষ’ রয়েছে তা বাংলায় অবিকৃত আছে। তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য ‘ষ’-এর ব্যবহারের নিয়মকে ষ-স্ত্রি বিধান বলে।

ষ ব্যবহারের নিয়ম

১. অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক ও র-এর পরে প্রত্যয়ের স ষ হয়। যেমন— ভবিষ্যৎ (ভ + অ + ষ + ই +) এখানে ব-এর পরে ই-এর ব্যবধান), মুর্মুরি, চক্ষুষান, চিকীর্ষা ইত্যাদি।
২. ই-কারাণ্ট এবং উ-কারাণ্ট উপসর্গের পর কঙগুলো ধাতুতে ‘ষ’ হয়। যেমন— অতিসেক > অতিষেক, সুসৃত > সুষৃত, অনুসংজ্ঞা > অনুষঙ্গা, প্রতিসেধক > প্রতিষেধক, প্রতিস্থান > প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান, বিসম > বিষম, সুসমা > সুষমা ইত্যাদি।
৩. ‘খ’ এবং খ কারের পর ‘ষ’ হয়। যেমন— খষি, কৃষক, উৎকৃষ্ট, দৃষ্টি, সৃষ্টি ইত্যাদি।
৪. তৎসম শব্দে ‘র’-এর পর ‘ষ’ হয়। যেমন— বর্ষা, ঘর্ষণ, বর্ষণ।
৫. র- ধ্বনির পরে যদি অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি থাকে তবে তার পরে ‘ষ’ হয়। যথা : পরিষ্কার। কিন্তু অ, আ স্বরধ্বনি থাকলে স হয়। যথা পুরস্কার।
৬. ট-কৌয়ি ধ্বনির সঙ্গে ‘ষ’ যুক্ত হয়। যথা : কষ্ট, স্পষ্ট, নষ্ট, কাষ্ট, ওষ্ট ইত্যাদি।
৭. কঙগুলো শব্দে স্বত্ত্বাবত্তই ‘ষ’ হয়। যেমন— বড়খতু, রোষ, কোষ, আষাঢ়, ভাষণ, ভাষা, উষা, পৌষ, কলুষ, পাষাণ, মানুষ, উষধ, ষড়যন্ত্র, ভূষণ, দেষ ইত্যাদি।

আতব্য

- ক. আরবি, ফারসি, ইংরেজি ইত্যাদি বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দে ষ হয় না। এ সম্বন্ধে সতর্ক হতে হবে। যেমন— জিনিস, পোশাক, মাস্টার, পোস্ট ইত্যাদি।
- খ. সংস্কৃত ‘সাং’ প্রত্যয়যুক্ত পদেও ষ হয় না। যেমন— অগ্নিসাং, ধূলিসাং, ভূমিসাং ইত্যাদি।

अनुशीलनी

- ১। গত্তি বিধান ও ব্যত্তি বিধান বলতে কী বোঝা ? উদাহরণসহ আলোচনা কর।
 - ২। সমাসবস্থ্য পদে গত্তি বিধানের নিয়ম থাটে না, এমন পাঁচটি উদাহরণ দাও।
 - ৩। শুন্যস্থান পূরণ কর :
১) মুক্তি প্রদান
২) অন্তর্ভুক্তি
৩) অন্তর্ভুক্তি
৪) অন্তর্ভুক্তি
৫) অন্তর্ভুক্তি

(ক) ট, ঠ, ড এবং ঢ বর্ণের পূর্বে ‘ন’ যুক্ত হলে সর্বদাই ন হয়।

যেমন.....(৫টি)

(খ) অ, আ তিনি স্বরধ্বনি এবং ক ও র-এর পরে প্রত্যয়ের দ্রষ্টা স মুর্ধন্য ঘ হয়।

যেমন.....(৫টি)

(g) विदेशी और देशी शहदोंवाले व्य हय ना।

যেমন.....(চি)

৪। নিচের শব্দগুলো শুন্ধ করে লেখ :

ଲବନ, ନଶ୍ଟ, ପୁରସ୍କାର, ସୁସମ, ଆନୁସଂଧିକ, ଟେଶନ, ପୋଷାକ, ଜାର୍ମାଣ, କୁରାଆଣ, ଦୁର୍ଣ୍ଣାମ ।

৫। যে বানানটি ঠিক তার নিচে দাগ দাও :

(ক) কৃপণ, তৃন, ঘষটা, বর্ণ, হরিন, লাবণ্য, কনিকা, বণিক, কৃষক, উৎকৃষ্ট, কাষ্ঠ, শুশমা, অনুসঞ্জা, বিষ, সরিষা, পোল্টে।

(খ) আষার / আষাঢ় / আশাঢ়

পাশ্চাত্য / পাষণ্ড, পাসণ্ড

তোষণ / তোশন / তোসণ

প্রতিষ্ঠান / প্রতিষ্ঠাগ / প্রতিষ্ঠান

ମିଳନ / ମିଳଣ

କଣିକା / କନିକା

ଲେଖକ / ଲେଖଣ

দর্শন / দর্শণ

କଲ୍ୟାଣ / କଲ୍ୟାନ

ଗୁଣୀ / ଗନ୍ଧୀ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সম্বিধি

সংজ্ঞা

সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মিলনের নাম সম্বিধি। যেমন— আশা + অতীত = আশাতীত। হিম + আলয় = হিমালয়। প্রথমটিতে আ + অ = আ (।) এবং দ্বিতীয়টিতে অ + আ = আ (।) হয়েছে। আবার, তৎ + মধ্য = তন্মধ্যে, এখানে ত + ম = ন্য হয়েছে।

সম্বিধির উদ্দেশ্য

(ক) সম্বিধির উদ্দেশ্য স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজপ্রবণতা এবং (খ) ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন। যেমন— ‘আশা’ ও ‘অতীত’ উচ্চারণে যে আয়াস প্রয়োজন, ‘আশাতীত’ তার চেয়ে অল্প আয়াসে উচ্চারিত হয়। সেরূপ ‘হিম আলয়’ বলতে যেরূপ শোনা যায়, ‘হিমালয়’ তার চেয়ে সহজে উচ্চারিত এবং শুভিমধুর। তাই যে ক্ষেত্রে আয়াসের লাঘব হয় কিন্তু ধ্বনি-মাধুর্য রক্ষিত হয় না, সে ক্ষেত্রে সম্বিধি করার নিয়ম নেই। যেমন— কচু + আদা + আলু = কচাদালু হয় না। অথবা কচু + আলু + আদা = কচাদালু হয় না।

আমরা প্রথমে খাটি বাংলা শব্দের সম্বিধি ও পরে তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের সম্বিধি সম্বন্ধে আলোচনা করব। উক্তোখ্য, তৎসম সম্বিধি মূলত বর্ণ সংযোগের নিয়ম।

বাংলা শব্দের সম্বিধি

বাংলা সম্বিধি দুই রকমের : স্বরসম্বিধি ও ব্যঞ্জনসম্বিধি।

১. স্বরসম্বিধি

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি মিলে যে সম্বিধি হয় তাকে স্বরসম্বিধি বলে।

১. সম্বিধিতে দুটি সন্নিহিত স্বরের একটির লোপ হয়। যেমন—

(ক) অ + এ = এ (অ লোপ), যেমন — শত + এক = শতেক। এরূপ — কতেক।

(খ) আ + আ = আ (একটি আ লোপ)। যেমন — শাখা + আরি = শাখারি। এরূপ — রূপা + আলি = রূপালি।

(গ) আ + উ = উ (আ লোপ)। যেমন — মিথ্যা + উক = মিথ্যুক। এরূপ — হিসুক, নিন্দুক ইত্যাদি।

(ঘ) ই + এ = ই (এ লোপ)। যেমন — কুড়ি + এক = কুড়িক। এরূপ — থনিক, গুটিক ইত্যাদি।

আশি + এর = আশির (এ লোপ)। এরূপ — নদীর (নদী + এর)।

২. কোনো কোনো স্থলে পাশাপাশি দুটি স্বরের শেষেরটি লোপ পায়। যেমন — যা + ইচ্ছা + তাই = যাচ্ছেতাই।

এখানে (আ+ই) এর মধ্যে ই লোপ পেয়েছে।

২। ব্যঙ্গন সম্বিধ

স্বরে আর ব্যঙ্গনে, ব্যঙ্গনে আর ব্যঙ্গনে এবং ব্যঙ্গনে আর স্বরে মিলিত হয়ে যে সম্বিধ হয় তাকে ব্যঙ্গন সম্বিধ বলে। প্রকৃত বাংলা ব্যঙ্গন সম্বিধ সমীক্ষণ (Assimilation)-এর নিয়মেই হয়ে থাকে। আর তা-ও মূলত কথ্যরীতিতে সীমাবদ্ধ।

১. প্রথম ধ্বনি অযোষ এবং পরবর্তী ধ্বনি ঘোষ হলে, দুটি মিলে ঘোষ ধ্বনি দিত্ব হয়। অর্থাৎ সম্বিধিতে ঘোষ ধ্বনির পূর্ববর্তী অযোষ ধ্বনিও ঘোষ হয়। যেমন – ছেট + দা = ছোড়দা।
২. হলস্ত রং (বদ্ধ অক্ষর বিশিষ্ট) ধ্বনির পরে অন্য ব্যঙ্গন ধ্বনি থাকলে রং লুপ্ত হয়ে পরবর্তী ধ্বনি দিত্ব হয়। যেমন – আর + না = আন্না, চার + টি = চাটি, ধর + না = ধন্না, দুর + ছাই = দুচ্ছাই ইত্যাদি।
৩. চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে যদি ত-বর্গীয় ধ্বনি আসে তাহলে, ত-বর্গীয় ধ্বনি লোপ হয় এবং চ-বর্গীয় ধ্বনির দিত্ব হয়। অর্থাৎ ত-বর্গীয় ধ্বনি ও চ-বর্গীয় ধ্বনি পাশাপাশি এলে প্রথমটি লুপ্ত হয়ে পরবর্তী ধ্বনিটি দিত্ব হয়। যেমন – নাত + জামাই = নাঞ্জামাই (ত্ + জ্ = জঞ্জ), বদ + জাত = বজ্জাত, হাত + ছানি = হাছানি ইত্যাদি।
৪. ‘প’-এর পরে ‘চ’ এবং ‘স’-এর পরে ‘ত’ এলে চ ও ত এর স্থলে শ হয়। যেমন – পাঁচ + শ = পাশুশ | সাত + শ = সাশুশ, পাঁচ + সিকা = পাশ্চিকা।
৫. হলস্ত ধ্বনির সাথে স্বরধ্বনি যুক্ত হলে স্বরের লোপ হয় না। যেমন – বোন + আই = বোনাই, চুন + আরি = চুনারি, তিল + এক = তিলেক, বার + এক = বারেক, তিন + এক = তিনেক।
৬. স্বরধ্বনির পরে ব্যঙ্গনধ্বনি এলে স্বরধ্বনিটি লুপ্ত হয়। যেমন – কাঁচা + কলা = কাঁচকলা, নাতি + বৌ = নাতবৌ, ঘোড়া + দৌড় = ঘোড়দৌড়, ঘোড়া + গাড়ি = ঘোড়গাড়ি ইত্যাদি।

তৎসম শব্দের সম্বিধ

বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। এসব শব্দই তৎসম (তৎ = তার + সম = সমান)। তার সমান অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান। এ শ্রেণির শব্দের সম্বিধ সংস্কৃত ভাষার নিয়মেই সম্পাদিত হয়ে এসেছে।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম সম্বিধ তিনি প্রকার : (১) স্বরসম্বিধ (২) ব্যঙ্গন সম্বিধ (৩) বিসর্গ সম্বিধ।

১. স্বরসম্বিধ

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনের নাম স্বরসম্বিধ।

১. অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয়, আ-কার পূর্ববর্তী ব্যঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন –

অ + অ = আ নর+ অথম = নরাথম। এরূপ-হিমাচল, প্রাণাধিক, হস্তান্তর, হিতাহিত ইত্যাদি।

অ + আ = আ হিম + আলয় = হিমালয়। এরূপ - দেবালয়, রঞ্জাকর, সিংহাসন ইত্যাদি।

আ + অ = আ যথা + অর্ধ = যথার্ধ। এরূপ – আশাতীত, কথামৃত, মহার্ধ ইত্যাদি।

আ + আ = আ বিদ্যা+ আলয় = বিদ্যালয়। এরূপ- কারাগার, মহাশয়, সদানন্দ ইত্যাদি।

୨. ଅ-କାର କିଂବା ଆ-କାରେର ପର ଇ-କାର କିଂବା ଈ-କାର ଥାକଳେ ଉତ୍ତରେ ମିଳେ ଏ-କାର ହୁଏ; ଏ-କାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନେର ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ । ସେମନ—

ଅ + ଇ = ଏ ଶୁଣ୍ଡ + ଇଛା = ଶୁଣେଛା ।

ଆ + ଇ = ଏ ସଥା + ଇଣ୍ଟ = ସଥେଣ୍ଟ ।

ଅ + ଈ = ଏ ପରମ + ଈଶ = ପରମେଶ ।

ଆ + ଈ = ଏ ମହା + ଈଶ = ମହେଶ ।

ଏରୁପ—ପୂର୍ଣ୍ଣଦୂ, ଶ୍ରୀବନ୍ଦେଶ୍ୱର, ବେଚ୍ଛା, ନରେଶ, ରମେଶ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ।

୩. ଅ-କାର କିଂବା ଆ-କାରେର ପର ଉ-କାର କିଂବା ଉ-କାର ଥାକଳେ ଉତ୍ତରେ ମିଳେ ଓ-କାର ହୁଏ; ଓ-କାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ । ସେମନ—

ଅ + ଉ = ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ + ଉଦୟ = ସୂର୍ଯୋଦୟ ।

ଆ + ଉ = ଓ ସଥା + ଉଚିତ = ସଥୋଚିତ ।

ଅ + ଊ = ଓ ଗୃହ + ଉର୍ଧ୍ଵ = ଗୃହୋର୍ଦ୍ଵ ।

ଆ + ଊ = ଓ ଗଜା + ଉର୍ମି = ଗଜୋର୍ମି ।

ଏରୁପ—ନୀଳୋଂପଳ, ଚଲୋର୍ମି, ମହୋରେବ, ନବୋଢା, ଫଳୋଦୟ, ସଥୋପ୍ୟୁକ୍ତ, ହିତୋପଦେଶ, ପରୋପକାର, ପଥୋତ୍ତର ଇତ୍ୟାଦି ।

୪. ଅ-କାର କିଂବା ଆ-କାରେର ପର ଖ-କାର ଥାକଳେ ଉତ୍ତରେ ମିଳେ ‘ଅର’ ହୁଏ ଏବଂ ତା ରେଫ (‘) ରୁଗେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଥେ ଲେଖା ହୁଏ । ସେମନ—

ଅ + ଖ = ଅର ଦେବ + ଖବି = ଦେବବି ।

ଆ + ଖ = ଅର ମହା + ଖବି = ମହବି ।

ଏରୁପ—ଅଧର୍ମ, ଉତ୍ତର୍ମର୍ମ, ସମ୍ପର୍ମ, ରାଜର୍ମି ଇତ୍ୟାଦି ।

୫. ଅ-କାର କିଂବା ଆ-କାରେର ପର ‘ଖାତ’-ଶବ୍ଦ ଥାକଳେ (ଅ, ଆ+ଖ) ଉତ୍ତରେ ମିଳେ ‘ଆର’ ହୁଏ ଏବଂ ବାନାନେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଆ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ରେଫ ଲେଖା ହୁଏ । ସେମନ—

ଅ + ଖ = ଆର ଶୀତ + ଖାତ = ଶୀତାର୍ତ୍ତ ।

ଆ + ଖ = ଆର ତୃକ୍ଷା + ଖାତ = ତୃକ୍ଷାର୍ତ୍ତ ।

ଏରୁପ—ଶ୍ରୀର୍ତ୍ତ, କୃଧ୍ଵାର୍ତ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ।

୬. ଅ-କାର କିଂବା ଆ-କାରେର ପର ଏ-କାର କିଂବା ଐ-କାର ଥାକଳେ ଉତ୍ତରେ ମିଳେ ଏ-କାର ହୁଏ; ଏ-କାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନେର ସାଥେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ । ସେମନ—

ଅ + ଏ = ଏଇ ଅନ + ଏକ = ଅନୈକ ।

ଆ + ଏ = ଏଇ ସଦା + ଏବ = ସଦୈବ ।

ଅ + ଐ = ଏଇ ମତ + ଏକ୍ଯ = ମତୈକ୍ଯ ।

ଆ + ଐ = ଏଇ ମହା + ଏଶ୍ଵର୍ୟ = ମହେଶ୍ଵର୍ୟ ।

ଏରୁପ—ହିତେବୀ, ସର୍ବୈବ, ଅତୁଲୈଶ୍ଵର୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ।

৭. অ-কার কিংবা আ-কারের পর শ-কার কিংবা ষ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ষ-কার হয়; ষ-কার পূর্ববর্তী ব্যঙ্গনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন-

অ + ষ = ষ	বন + ষষ্ঠি = বনৌষধি।
আ + ষ = ষ	মহা + ষষ্ঠি = মহৌষধি।
অ + ষ = ষ	পরম + ষষ্ঠি = পরমৌষধ।
আ + ষ = ষ	মহা + ষষ্ঠি = মহৌষধ।

৮. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে দীর্ঘ ই-কার হয়। দীর্ঘ ই-কার পূর্ববর্তী ব্যঙ্গনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন-

ই + ই = ঈ	অতি + ইত = অতীত
ই + ঈ = ঈ	পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা।
ঈ + ই = ঈ	সতী + ইন্দ্র = সতীন্দ্র।
ঈ + ঈ = ঈ	সতী + ঈশ = সতীশ।

এরূপ—গিরীন্দ্র, ক্ষিতীশ, মহীন্দ্র, শ্রীশ, পৃথীশ, অতীব, প্রতীক্ষা, প্রতীত, রবীন্দ্র, দিল্লীশ্বর ইত্যাদি।

৯. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই ও ঈ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে ই বা ঈ স্থানে ‘য’ বা য(j) ফলা হয়। য-ফলা লেখার সময় পূর্ববর্তী ব্যঙ্গনের সাথে লেখা হয়। যেমন—

ই + অ = য + অ	অতি + অন্ত = অত্যন্ত।
ই + আ = য + আ	ইতি + আদি = ইত্যাদি।
ই + উ = য + উ	অতি + উক্তি = অত্যুক্তি।
ই + ঊ = য + ঊ	প্রতি + ঊষ = প্রত্যুষ।
ঈ + আ = য + আ	মসী + আধার = মস্যাধার।
ঈ + এ = য + এ	প্রতি + এক = প্রত্যেক।
ঈ + অ = য + অ	নদী + অন্দু = নদ্যান্দু।

এরূপ—প্রত্যহ, অত্যধিক, গত্যঙ্গ, প্রত্যাশা, প্রত্যাবর্তন, আদ্যাত, যদ্যপি, অন্ত্যথান, অত্যাচর্য, প্রত্যুপকার ইত্যাদি।

১০. উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে উ-কার হয়; উ-কার পূর্ববর্তী ব্যঙ্গন ধ্বনির সাথে যুক্ত হয়। যেমন—

উ + উ = উ	মরু + উদ্যান = মরুদ্যান।
উ + ঊ = ঊ	বহু + ঊর্ধ্ব = বহুর্ধ্ব।
উ + উ = উ	বধু + উৎসব = বধুৎসব।
উ + ঊ = ঊ	তৃতীয় + ঊর্ধ্ব = তৃতীয়ুর্ধ্ব।

১১. উ-কার কিংবা উ-কারের পর উ-কার ও উ-কার ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে উ বা উ স্থানে ব-ফলা হয় এবং লেখার সময় ব-ফলা পূর্ববর্তী বর্ণের সাথে লেখা হয়। যেমন-

উ + অ = ব + অ	সু + অঘ = সঘৱ।
উ + আ = ব + আ	সু + আগত = স্বাগত।
উ + ই = ব + ই	অনু + ইত = অনিত।
উ + ঈ = ব + ঈ	তনু + ঈ = তবী।
উ + এ = ব + এ	অনু + এষণ = অবেষণ।

এরূপ— পশ্চথম, পশ্চাচার, অনুয়, মন্ত্রণ ইত্যাদি।

১২. ঝ-কারের পর ঝ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে ‘ঝ’ স্থানে ‘র’ হয় এবং তা র-ফলা রূপে পূর্ববর্তী ব্যঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন - পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়, পিতৃ + আদেশ = পিত্রাদেশ।

১৩. এ, ঐ, উ, উ-কারের পর এ, ঐ স্থানে যথাক্রমে অয়, আয় এবং ও, উ স্থানে যথাক্রমে অব্ব ও আব্ব হয়। যেমন-

এ + অ = অয় + অ	নে + অন = নয়ন। শে + অন = শয়ন।
ঐ + অ = আয় + অ	নৈ + অক = নায়ক। গৈ + অক = গায়ক।
ও + অ = অব্ব + অ	গো + অন = পবন। লো + অন = লবণ।
উ + অ = আব্ব + অ	গৌ + অক = পাবক।
ও + আ = অব্ব + আ	গো + আদি = গবাদি।
ও + এ = অব্ব + এ	গো + এষণা = গবেষণা।
ও + ই = অব্ব + ই	গো + ইত্র = পবিত্র।
উ + ই = আব্ব + ই	লো + ইক = নাবিক।
উ + উ = আব্ব + উ	ভৌ + উক = ভাবুক।

১৪. কতগুলো সম্মিক্ষা কোনো নিয়ম অনুসারে হয় না, এগুলোকে নিপাতনে সিদ্ধ বলে। যথা - কুল + অটা = কুলটা (কুলাটা নয়), গো + অক্ষ = গবাক্ষ (গবক্ষ নয়), প্র + উঢ় = প্রৌঢ় (প্রোঢ় নয়), অন্য + অন্য = অন্যান্য, মার্জ + অঙ্গ = মার্জঙ্গ, শুধু + শুদ্ধন = শুদ্ধেদ্বাদন।

২. ব্যঙ্গনসম্মিক্ষা

স্বরে-ব্যঙ্গনে, ব্যঙ্গনে-স্বরে ও ব্যঙ্গনে-ব্যঙ্গনে যে সম্মিক্ষা হয় তাকে ব্যঙ্গন সম্মিক্ষা বলে। এদিক থেকে ব্যঙ্গন সম্মিক্ষাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১. ব্যঙ্গনধ্বনি + স্বরধ্বনি ২. স্বরধ্বনি + ব্যঙ্গনধ্বনি ৩. ব্যঙ্গনধ্বনি + ব্যঙ্গনধ্বনি।

১. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি

ক, চ, ট, ত্, প্-এর পরে স্বরধ্বনি থাকলে সেগুলো যথাক্রমে গ্, জ্, ড্ (ড়), দ্, ব হয়। পরবর্তী স্বরধ্বনিটি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন-

ক + অ = গ	দিক + অন্ত = দিগন্ত।
চ + অ = জ	শিচ + অন্ত = শিজন্ত।
ট + আ = ড়	ষট + আনন = ষড়ানন।
ত্ + অ = দ	তৎ + অবধি = তদবধি।
প্ + অ = ব	সুপ + অন্ত = সুবন্ত।

এরূপ- বাগীশ, তদন্ত, বাগাড়স্বর, কৃদন্ত, সদানন্দ, সদুপায়, সদুপদেশ, জগদিন্দ্র ইত্যাদি।

২. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

স্বরধ্বনির পর ছ থাকলে উক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিটি দিত্ত (ছ) হয়। যথা-

অ + ছ = ছ	এক + ছত্র = একছত্র।
আ + ছ = ছ	কথা + ছলে = কথাছলে।
ই + ছ = ছ	পরি + ছদ = পরিছদ।

এরূপ - মুখছবি, বিছেদ, পরিছেদ, বিছিন্ন, অঙ্গছেদ, আলোকছটা, প্রতিছবি, প্রচেদ, আচ্ছাদন, বৃক্ষছায়া, স্বচ্ছদে, অনুচ্ছেদ ইত্যাদি।

৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

(ক) ১. ত্ ও দ্-এর পর চ ও ছ থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে চ হয়। যেমন-

ত্ + চ = চ	সৎ + চিন্তা = সচিন্তা।
ত্ + ছ = ছ	উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ।
দ্ + চ = চ	বিপদ + চয় = বিপচয়।
দ্ + ছ = ছ	বিপদ + ছায়া = বিপচ্ছায়া।

এরূপ - উচ্চারণ, শরচন্দ্র, সচরিত্র, তচ্ছবি ইত্যাদি।

২. ত্ ও দ্-এরপর জ্ ও ব্ থাকলে ত্ ও দ্-এর স্থানে জ্ হয়। যেমন-

ত্ + জ = জ	সৎ + জন = সজ্জন।
দ্ + জ = জ	বিপদ + জাল = বিপজ্জাল।
ত্ + ব = ব্ব	কুৎ + বটিকা = কুম্ভটিকা।

এরূপ - উজ্জ্বল, তজ্জ্বল্য, যাবজ্জীবন, জগজ্জীবন ইত্যাদি।

৩. ত্ত ও দ্দ-এরপর শ্ব থাকলে ত্ত ও দ্দ-এর স্থলে চ এবং শ্ব-এর স্থলে ছ উচ্চারিত হয়। যেমন-

$$\text{ত্ত} + \text{শ} = \text{চ} + \� = \ছ \quad \text{উৎ + শ্বাস} = \text{উচ্ছাস}$$

এরূপ - চলচ্ছস্তি, উচ্ছুজ্জ্বল ইত্যাদি।

৪. ত্ত ও দ্দ-এর পর ড থাকলে ত্ত ও দ্দ এর স্থানে ড হয়। যেমন-

$$\text{ত্ত} + \text{ড} = \text{ড্ত} \quad \text{উৎ + ডীন} = \text{উড্ডীন।}$$

এরূপ - বৃহড়চক্ষ।

৫. ত্ত ও দ্দ এর পর হ থাকলে ত্ত ও দ্দ এর স্থলে দ এবং হ এর স্থলে ধ হয়। যেমন-

$$\text{ত্ত} + \text{হ} = \text{দ্দ} + \text{ধ} = \text{দ্ধ} \quad \text{উৎ + হার} = \text{উদ্ধার।}$$

$$\text{দ্দ} + \text{হ} = \text{দ্দ} + \text{ধ} = \text{দ্ধ} \quad \text{পদ্দ} + \text{হতি} = \text{পদ্ধতি।}$$

এরূপ - উদ্ধৃত, উদ্ধৃত, তদ্ধিত ইত্যাদি।

৬. ত্ত ও দ্দ এর পর ল থাকলে ত্ত ও দ্দ-এর স্থলে ল উচ্চারিত হয়। যেমন-

$$\text{ত্ত} + \text{ল} = \text{ল্ত} \quad \text{উৎ + লাস} = \text{উল্লাস।}$$

এরূপ - উল্লেখ, উল্লিখিত, উল্লেখ্য, উল্লজ্জন ইত্যাদি।

(খ) ১. ব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহের যে কোনো বর্গের অঘোষ অঞ্চল্পাণ ধ্বনির পর যে কোনো বর্গের ঘোষ অঞ্চল্পাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি কিংবা ঘোষ অঞ্চল্পাণ তালব্য ধ্বনি, (য > জ), ঘোষ অঞ্চল্পাণ ওষ্ঠ ধ্বনি (ব), ঘোষ কম্পনজ্ঞাত দন্তমূলীয় ধ্বনি (র) কিংবা ঘোষ অঞ্চল্পাণ ওষ্ঠ ব্যঞ্জনধ্বনি (ব) থাকলে প্রথম অঘোষ অঞ্চল্পাণ ধ্বনি ঘোষ অঞ্চল্পাণরূপে উচ্চারিত হয়। যথা :

$$\text{ক} + \text{দ} = \text{গ} + \text{দ} \quad \text{বাক} + \text{দান} = \text{বাগদান।}$$

$$\text{ট} + \text{য} = \text{ড} + \text{য} \quad \text{বট} + \text{যত্ত} = \text{বড়যত্ত।}$$

$$\text{ত্ত} + \text{ঘ} = \text{দ্দ} + \ঘ \quad \text{উৎ + ঘাটন} = \text{উদ্ধাটন।}$$

$$\text{ত্ত} + \text{য} = \text{দ্দ} + \text{য} \quad \text{উৎ + যোগ} = \text{উদ্যোগ।}$$

$$\text{ত্ত} + \text{ব} = \text{দ্দ} + \text{ব} \quad \text{উৎ + বৰ্ধন} = \text{উদ্বৰ্ধন।}$$

$$\text{ত্ত} + \text{র} = \text{দ্দ} + \text{র} \quad \text{তৎ + রূপ} = \text{তদ্রূপ।}$$

এরূপ - দিহিজয়, উদ্যম, উদ্গার, উদ্গিরণ, উদ্ভব, বাগ্জাস, সদগুরু, বাগদেবী ইত্যাদি।

২. ঙ, এও, ণ, ন, ম পরে থাকলে পূর্ববর্তী অঘোষ অঞ্চল্পাণ স্পর্শধ্বনি সেই বর্গীয় ঘোষ স্পর্শধ্বনি কিংবা নাসিক্যধ্বনি হয়। যথা :

$$\text{ক} + \text{ন} = \text{গঙ} + \text{ন} \quad \text{দিক} + \text{নির্গ্য} = \text{দিগ্নির্গ্য বা দিঙ্নির্গ্য।}$$

$$\text{ত্ত} + \text{ম} = \text{দ্দ/ন} + \text{ম} \quad \text{তৎ + মধ্যে} = \text{তদ্মধ্যে বা তন্মধ্যে।}$$

ଲକ୍ଷ୍ମୀମ୍ : ଏବୁପ କେତେ ସାଧାରଣତ ନାମିକ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନଇ ବୈଶି ପ୍ରଚଳିତ । ଯେମନ – ବାକ୍ + ମୟ = ବାଙ୍ଗମୟ, ତୃ + ମୟ = ତନ୍ମୟ, ମୃ + ମୟ = ମନ୍ମୟ, ଜଗ + ନାଥ = ଜଗନ୍ନାଥ ଇତ୍ୟାଦି । ଏବୁପ – ଉନ୍ନଯନ, ଉନ୍ନିତ, ଚିନ୍ମୟ ଇତ୍ୟାଦି ।

৩. মু় এর পর যে কোনো বার্গীয় ধরনি থাকলে মু ধরনিটি সেই বর্গের নাসিক্য ধরনি হয়। যেমন—

ସମ + ଚାରି = ସମଚାରି ।

ଏବୁଗ – କିଷ୍ଟତ, ସମ୍ପଦଶର୍ଣ୍ଣ, କିଳୁର, ସମ୍ମାନ, ସମ୍ବଧାନ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟିମାନ ଇତ୍ୟାଦି ।

ମୁଖ୍ୟ : ଆଧୁନିକ ବାହ୍ୟାୟ ମୁଏର ପର କଷ୍ଟ-ବର୍ଗୀୟ ଧରଣି ଥାକଲେ ମୁଁ ଯାନେ ପ୍ରାୟଇ ଓ ନା ହେଁ ଅନୁମତାର (୧) ହୁଏ ।

যেমন – সম + গত = সংগত, অহম + কার = অহংকার, সম + থ্যা = সংথ্যা।

ଏବୁପ – ସଂକୀର୍ତ୍ତ, ସଂଗୀତ, ସଂଗ୍ରଠନ, ସଂଘାତ ଇତ୍ୟାଦି ।

୪. ମୁଖ୍ୟର ପରା ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଧ୍ୟାନି ଯ, ର, ଲ, ବ, କିଂବା ଶ, ସ, ସ, ହ ଥାକଣେ, ମୁଖ୍ୟରେ ଅନୁମ୍ଭାର (୫) ହୁଏ । ଯେମନ୍—

সম + যম = সংযম, সম + বাদ = সংবাদ, সম+ রক্ষণ = সংরক্ষণ,

সম + শাপ = সংশাপ সম + শয় = সংশয় সম + সার = সংসার,

সম্ম + হার = সংহার।

এরূপ – বারংবার, কিংবা, সংবরণ, সংযোগ, সংযোজন, সংশোধন, সর্বসহা, স্বয়ংবরা। ব্যক্তিক্রম : সম্মাট (সম্ম + রাট)।

৫. চু. ও. ঝ.-এর পরে নাসিক্য ধ্বনি তালব্য হয়। যেমন –

୬. ଦ୍ ଓ ଧ୍ ଏଇ ପରେ କ, ଚ, ଟ, ତ, ଗ, ଖ, ଛ, ଠ, ଥ, ଫ, ଥାକଲେ ଦ୍ ଓ ଧ୍ ମୁଲେ ଅଯୋଦ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ପାଳ ଥିବାନି ହୁଏ ।
ସେମନ—

ତୁ + କାଳ = ତୁକାଳ

এরূপ – হৃৎকম্প, তৎপর, তন্ত্র ইত্যাদি।

৭. দ কিংবা ধ-এর পরে স থাকলে, দ ও ধ স্বল্পে অঘোষ অল্পপাণ ধ্বনি হয়। যেমন-

বিপদ + সংকুল = বিপৎসংকুল। এরূপ – তৎসম।

৮. ষ-এর পরে ত্ বা থ থাকলে, যথাক্রমে ত্ ও থ স্থানে ট ও ঠ হয়। যেমন—

৯. বিশেষ নিয়মে সাধিত কতগুলো সম্পর্ক

ଏବୁପ୍ - ସଂକ୍ଷତି, ପରିଷକୃତ ଇତ୍ୟାଦି ।

১০. কতগুলো সম্পর্ক নিপাতনে সিদ্ধ হয়

ଆ+ চর্য = আচর্য,
গো + পদ = গোপনীয়,
বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি,
তৎ + কর = তস্কর,
মনস্য + ঈষা = মনীষা,
ষট্ট + দশ = ষোড়শ
পতেৎ + অঙ্গলি = পতঙ্গলি ইত্যাদি।

३. विसर्जनस्थ

সংস্কৃত সম্বিধান নিয়মে পদের অন্তর্ভুক্ত রূপ ও সূচনেক ক্ষেত্রে অঘোষ উচ্চাধিকারী অর্থাৎ হ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয় এবং তা বিসর্গ(ঝ) রূপে লেখা হয়। রূপ ও সূচন বিসর্গ ব্যক্তিন্ধ্বনিমালার অন্তর্গত। সে কারণে বিসর্গ সম্বিধান সম্বিধান অন্তর্গত। বস্তুত বিসর্গ রূপ এবং স-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। বিসর্গকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে : ১. রূপ - জাত বিসর্গ ও ২. স-জাত বিসর্গ।

୧. ଝୁ - ଜାତ ବିସର୍ଗ : ର ଥାନେ ଯେ ବିସର୍ଗ ହୁଏ ତାକେ ବଲେ ର - ଜାତ ବିସର୍ଗ । ସେମନ : ଅନ୍ତର- ଅନ୍ତଃ, ପ୍ରାତର- ପ୍ରାତଃ, ପୁନର- - ପୁନଃ ଇତ୍ୟାଦି ।

୨. ସ୍ରୀଜାତ ବିସର୍ଗ : ସ୍ରୀ ଥାନେ ଯେ ବିସର୍ଗ ହୁଏ ତାକେ ବଲେ ସ୍ରୀଜାତ ବିସର୍ଗ। ଯେମନ : ନମ୍ବୁ - ନମ୍ବଃ, ପୂର୍ବୁ - ପୂର୍ବଃ, ଶିରସ - ଶିରଃ ଇତ୍ୟାଦି ।

বিসর্গের সাথে অর্ধাত রূ. ও সং-এর সাথে স্বরধ্বনির কিংবা ব্যঙ্গনধ্বনির যে সম্মিহন হয় তাকে বিসর্গ সম্মিহন বলে।
বিসর্গ সম্মিহন দইভাবে সাধিত হয় : ১. বিসর্গ + স্বর এবং ২. বিসর্গ + ব্যঙ্গন।

১. বিসর্গ ও অন্তরের সম্পর্ক

অ-ধ্বনির পরস্থিত (অঘোষ উচ্চারণ) বিসর্গের পর অ ধ্বনি থাকলে অ +ঃ+ অ - এ তিনে মিলে শ-কার হয়। যেমন – ততঃ + অধিক = ততোধিক।

২. বিসর্গ ও ব্যঞ্জনের সম্বিধান

১. অ-কারের পরম্পরাত স্ব-জাত বিসর্গের পর ঘোষ অঞ্চলাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ ব্যঙ্গনথবনি, নাসিক্যথবনি কিংবা অন্তস্থ য, অন্তস্থ ব, র, ল, হ থাকলে অ-কার ও স্ব-জাত বিসর্গ উভয় স্থলে শ-কার হয়। যেমন – তিরঃ + ধন = তিরোধন, মনঃ + রম = মনোরম, মনঃ + হর = মনোহর, তপঃ + বন = তপোবন ইত্যাদি।

২. অ-কারের পরস্থিত রূ-জাত বিসর্গের পর উপর্যুক্ত ধ্বনিসমূহের কোনোটি থাকলে বিসর্গ স্থানে 'র' হয়।
 যেমন— অন্তঃ + গত = অন্তর্গত, অন্তঃ + ধান = অন্তর্ধান, পুনঃ+ আয় = পুনরায়, পুনঃ + উক্ত = পুনরুক্ত,
 অন্তঃ + অত = অতবর্ত।

ଏବଂ - ପନ୍ଦର୍ଜନ, ପନ୍ଦରୀ, ପାତ୍ରଯଥାନ, ଅନ୍ତର୍ଜଳ, ପନ୍ଦର୍ପି, ଅନୁବତ୍ତି ଇତାଦି।

৩. অ ও আ ভিত্তি অন্য স্বরের পরে বিসর্গ থাকলে এবং তার সঙ্গে অ, আ, কৰ্ণীয় ঘোষ অঞ্চল্পাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ নাসিক্যধ্বনি কিংবা ষ, র, ল, ব, হ-এর সম্মিহন হলে বিসর্গ স্থানে ‘র’ হয়। যেমন-

নিঃ + আকার = নিরাকার, আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ, দুঃ + ঘোগ = দুর্ঘোগ ইত্যাদি।

এবুপ – নিরাকরণ, জ্যোতির্ময়, প্রাদুর্ভাব, নির্জন, বহির্গত, দুর্গোত্ত, দুরস্ত ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম : ই কিংবা উ ধ্বনির পরের বিসর্গের সঙ্গে ‘র’ এর সম্মিহন হলে বিসর্গের লোপ হয় ও বিসর্গের পূর্ববর্তী দ্রুষ্য স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন – নিঃ + রব = নীরব, নিঃ + রস = নীরস ইত্যাদি।

৪. বিসর্গের পর অঘোষ অঞ্চল্পাণ কিংবা মহাপ্রাণ তালব্য ব্যঞ্জন থাকলে বিসর্গের স্থলে তালব্য শিশ ধ্বনি হয়, অঘোষ অঞ্চল্পাণ কিংবা অঘোষ মহাপ্রাণ মূর্ধন্য ব্যঞ্জন থাকলে বিসর্গ স্থলে মূর্ধন্য শিশ ধ্বনি হয়, অঘোষ অঞ্চল্পাণ কিংবা অঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য ব্যঞ্জনের স্থলে দন্ত্য শিশ ধ্বনি হয়। যেমন-

ঃ + চ / ছ = শ + চ / ছ	নিঃ + চয় = নিচয়, শিরঃ + ছেদ = শিরছেদ।
ঃ + ট / ঠ = ষ + ট / ঠ	ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষঙ্কার, নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর।
ঃ + ত / থ = স + ত / থ	দুঃ + তর = দুস্তর, দুঃ + থ = দুষ্থ।

৫. অঘোষ অঞ্চল্পাণ ও অঘোষ মহাপ্রাণ কষ্ট্য কিংবা শক্ত্য ব্যঞ্জন (ক, খ, গ, ফ) পরে থাকলে অ বা আ ধ্বনির পরাস্থিত বিসর্গ স্থলে অঘোষ মূর্ধন্য শিশ ধ্বনি (স) হয় এবং অ বা আ ব্যক্তিত অন্য স্বরধ্বনির পরাস্থিত বিসর্গ স্থলে অঘোষ মূর্ধন্য শিশ ধ্বনি (ষ) হয়। যেমন-

অ এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = স্ + ক	নমঃ + কার = নমস্কার।
অ এর পরে বিসর্গ ঃ + খ = স্ + খ	পদঃ + খলন = পদস্থলন।
ই এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = ষ + ক	নিঃ + কর = নিষ্কর।
উ এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = ষ + ক	দুঃ + কর = দুষ্কর।

এবুপ – পুরস্কার, মনস্কামনা, তিরস্কার, চতুর্কাদ, নিষ্কল, নিষ্কাপ, দুষ্প্রাপ্য, বহিষ্কৃত, দুষ্কৃতি, আবিষ্কার, চতুর্মেকাণ, বাচস্পতি, ভাস্কর ইত্যাদি।

৬. কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্মিহন বিসর্গ লোপ হয় না। যেমন-

প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল, মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট, শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া।

৭. যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি স্ত, স্থ কিংবা স্প পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গ অবিকৃত থাকে অথবা লোপ পায়। যেমন-

নিঃ + স্তৰ্য = নিঃস্তৰ্য কিংবা নিস্তৰ্য। দুঃ + স্থ = দুঃস্থ কিংবা দুষ্থ। নিঃ + স্পদ = নিঃস্পদ কিংবা নিস্পদ।

কয়েকটি বিশেষ বিসর্গ সম্বিধান উদাহরণ

বাচঃ + পতি = বাচস্পতি, ভাঃ + কর = ভাস্কর, অহঃ + নিশা= অহর্নিশ, অহঃ + অহ = অহরহ ইত্যাদি।

অনুশীলনী

- ১। সম্মিলিতে কী বোঝায়? বাংলা ভাষায় সম্মিলিতের প্রয়োজনীয়তা কী? উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর।
- ২। সম্মিলিতে প্রকারণ ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের একটি করে উদাহরণ দাও।
- ৩। নিচের সূত্রগুলো অনুসরণে তিনটি করে উদাহরণ দাও।
 - (ক) মূর্ধন্য ব্যঞ্জনসম্বন্ধিতে পূর্বে ‘ন’ মূর্ধন্য ‘ণ’ হয়।
 - (খ) চ ও ছ—এর পরে নাসিক্যসম্বন্ধিতে তালিব্য এও হয়।
 - (গ) অ—কার ভিন্ন অন্য স্বর পরে থাকলে বিসর্গের স্থলে র হয়।
- ৪। সম্মিলিতে বিচ্ছেদ কর।
উচ্চত, বনস্পতি, বারেক, আদ্যন্ত, সম্মাট, ভবন, নয়ন, উজ্জ্বল, অন্ধেষণ, সন্তান, নীরোগ, প্রাতরাশ
- ৫। সম্মিলিতে কর
অভি + উদয়, নিঃ + চিহ্ন, চলৎ +শক্তি, যাবৎ + জীবন, যথ + ধ, চিৎ + ময়, খানি + এক, অতঃ + এব, দিক +মঙ্গল।
- ৬। কোনটি শুল্ক নির্দেশ কর
 - ক. স্বরে স্বরে যে সম্মিলিত হয় তাকে ব্যঞ্জনসম্মিলিত বলে / স্বরে আর ব্যঞ্জনে যে সম্মিলিত হয় তাকে স্বরসম্মিলিত বলে/ ব্যঞ্জনে আর স্বরে যে সম্মিলিত হয় তাকে ব্যঞ্জন সম্মিলিত বলে।
 - খ. ব্যঞ্জন সম্মিলিত এক / দুই/ তিন রকমের।
 - গ. স্বরসম্মিলিত ব্যঞ্জন ব্যঞ্জনে হয় / স্বরে স্বরে হয়।

তৃতীয় অধ্যায়
প্রথম পরিচেদ
শব্দ প্রকরণ
পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

সব ভাষায় লিঙ্গান্তেদে শব্দতেদে আছে, বাংলা ভাষায়ও আছে।

বাংলা ভাষায় বহু বিশেষ্য পদ রয়েছে যাদের কোনোটিতে পুরুষ ও কোনোটিতে স্ত্রী বোঝায়। যে শব্দে পুরুষ বোঝায় তাকে পুরুষবাচক শব্দ আর যে শব্দে স্ত্রী বোঝায় তাকে স্ত্রীবাচক শব্দ বলে। যেমন : বাপ-মা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে- কেউই মৃত্যুর সময় তার কাছে ছিল না। এ বাক্যে বাপ, ভাই ও ছেলে পুরুষবাচক শব্দ; আর মা, বোন ও মেয়ে স্ত্রীবাচক শব্দ। তৎসম পুরুষবাচক বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে পুরুষবাচক বিশেষণ ব্যবহৃত এবং স্ত্রীবাচক বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে স্ত্রীবাচক বিশেষণ ব্যবহৃত হয়। যেমন – বিদান লোক এবং বিদুষী নারী। এখানে ‘লোক’ পুরুষবাচক বিশেষ্য এবং ‘নারী’ স্ত্রীবাচক বিশেষ্য। ‘বিদান’ পুরুষবাচক বিশেষণ এবং ‘বিদুষী’ স্ত্রীবাচক বিশেষণ। কিন্তু বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের এ নিয়ম মানা হয় না। যেমন—সংস্কৃতে ‘সুন্দর বালক ও সুন্দরী বালিকা’ বাংলায় ‘সুন্দর বালক ও সুন্দর বালিকা’।

বাংলায় পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

১। বাংলায় পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ মূলত দুই ভাগে বিভক্ত

১. পতি ও পত্নীবাচক অর্থে এবং ২. পুরুষ ও মেয়ে বা স্ত্রীজাতীয় অর্থে।

১. পতি ও পত্নীবাচক অর্থে : আবা-আচা, চাচা-চাচী, কাকা-কাকী, জেঠা-জেঠী, দাদা-দাদী, নানা-নানী, নন্দাই-ননদ, দেওর-জা, ভাই-ভাবী/বৌদি, বাবা-মা, মামা-মামী ইত্যাদি।

২. সাধারণ পুরুষ ও স্ত্রীজাতীয় অর্থে : খোকা-খুকী, পাগল-পাগলী, বামন-বামনী, ভেড়া-ভেড়ী, মোরগ-মুরগী, বালক-বালিকা, দেওর-ননদ।

২। বাংলা স্ত্রী প্রত্যয়

পুরুষবাচক শব্দের সঙ্গে কতগুলো প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। এগুলো হলো : ঈ, নি, নী, আনী, ইনী, ন।

১. ঈ-প্রত্যয় : বেঞ্জামা-বেঞ্জামী, ভাগনা/ভাগনে-ভাগনী।

২. নী-প্রত্যয় : কামার-কামারনী, জেলে-জেলেনী, কুমার-কুমারনী, ধোপা-ধোপানী, মজুর-মজুরনী ইত্যাদি।

৩. পুরুষবাচক শব্দের শেষে ঈ থাকলে স্ত্রীবাচক শব্দে নী হয় এবং আগের ঈ ই হয়। যেমন : ডিখারি-ডিখারনী, অভিসারী-অভিসারিণী।

৪. আনী-প্রত্যয় : ঠাকুর-ঠাকুরানী, নাপিত-নাপিতানী, মেথর-মেথরানী, চাকর-চাকরানী ইত্যাদি।

৫. ইনী-প্রত্যয় : কাঞ্জল-কাঞ্জলিনী, গোয়ালা-গোয়ালিনী, বাঘ-বাঘিনী ইত্যাদি।

উন-প্রত্যয় : ঠাকুর-ঠাকুরুন / ঠাকুরানী।

আইন-প্রত্যয় : নতুন নতুন প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন : ঠাকুর-ঠাকুরাইন।

দ্রষ্টব্য : বালায় কতগুলো তৎসম স্ত্রীবাচক শব্দের পরে আবার স্ত্রীবাচক প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন-অভাগা-অভাগী/অভাগিনী, ননদাই-ননদিনী/ননদী ইত্যাদি।

৩। নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ

কতগুলো শব্দ নিত্য স্ত্রীবাচক। এগুলোর পুরুষবাচক শব্দ নেই। যেমন- সতীন, সত্ত্বা, এয়ো, দাই, সধবা ইত্যাদি।

৪। কতগুলো শব্দের আগে নর, মদ্দা ইত্যাদি পুরুষবাচক শব্দ এবং স্ত্রী, মাদী, মাদা ইত্যাদি স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। যেমন – নর / মদ্দা / ছুলো বিড়াল-মেনি বিড়াল; মদ্দা ইঁস-মাদী ইঁস; মদ্দা ঘোড়া-মাদী ঘোড়া; পুরুষ লোক-মেয়েলোক / স্ত্রীলোক; বেটাছেলে-মেয়েছেলে; পুরুষ কয়েদী-স্ত্রী / মেয়ে কয়েদী; ঝঁড়ে বাছুর-বকলা বাছুর; বলদ গরু-গাই গরু ইত্যাদি।

৫। কতগুলো পুরুষবাচক শব্দের আগে স্ত্রীবাচক শব্দ প্রয়োগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন- কবি-মহিলা কবি, ডাক্তার-মহিলা ডাক্তার, সভ্য-মহিলা সভ্য, কর্মী-মহিলা কর্মী, শিল্পী-মহিলা বা নারী শিল্পী, সৈন্য-নারী / মহিলা সৈন্য, পুলিশ-মহিলা পুলিশ ইত্যাদি।

৬। কতগুলো শব্দের শেষে পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। যেমন : বোন-পো-বোন-ঝি, ঠাকুর-পো-ঠাকুর-ঝি, ঠাকুর দাদা / ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, গয়লা-গয়লা-বউ, জেলে-জেলে বট ইত্যাদি।

৭। অনেক সময় আলাদা আলাদা শব্দে পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক বোঝায়। যেমন : বাবা-মা, ভাই-বোন, কর্তা-গিনী, ছেলে-মেয়ে, সাহেব-বিবি, জামাই-মেয়ে, বর-কনে, দুলহা-দুলাইন/দুলহিন, বেয়াই-বেয়াইন, তাঁ-মাঁ, বাদশা-বেগম, শুক-সারী ইত্যাদি।

সংকৃত স্ত্রী প্রত্যয়

তৎসম পুরুষবাচক শব্দের পরে আ, ই, আনী, নী, ইকা প্রভৃতি প্রত্যয়যোগে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন-

১. আ-যোগে

(ক) সাধারণ অর্থে : মৃত-মৃতা, বিবাহিত-বিবাহিতা, মাননীয়-মাননীয়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রিয়-প্রিয়া, প্রথম-প্রথমা, চতুর-চতুরা, চপল-চপলা, নবীন-নবীনা, কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠা, মলিন-মলিনা ইত্যাদি।

(খ) জাতি বা শ্রেণিবাচক : অজ-অজা, কোকিল-কোকিলা, শিষ্য-শিষ্যা, ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়া, শুদ্র-শুদ্রা ইত্যাদি।

২. ঈ-প্রত্যয় যোগে

(ক) সাধারণ অর্থে : নিশাচর-নিশাচরী, ভয়ংকর-ভয়ংকরী, রজক-রজকী, কিশোর-কিশোরী, সুন্দর-সুন্দরী, চতুর্দশ-চতুর্দশী, ঘোড়শ-ঘোড়শী ইত্যাদি।

(খ) জাতি বা শ্রেণিবাচক : সিংহ-সিংহী, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী, মানব-মানবী, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, কুমার-কুমারী, ময়ূর-ময়ূরী ইত্যাদি।

৩. ইকা-প্রত্যয় যোগে

(ক) যেসব শব্দের শেষে ‘অক’ রয়েছে সেসব শব্দে ‘ইকা’ স্থলে ‘ইকা’ হয়। যেমন : বালক-বালিকা, নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা, সেবক-সেবিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ইত্যাদি। কিন্তু গণক-গণকী, নর্তক-নর্তকী, চাতক-চাতকী, রজক-রজকী (বাংলায়) রজকিনী।

(খ) ক্ষুদ্রার্থে ইকা যোগ হয়। যেমন : নাটক-নাটিকা, মালা-মালিকা, গীত-গীতিকা, পুস্তক-পুস্তিকা ইত্যাদি। (এগুলো স্ত্রী প্রত্যয় নয়, ক্ষুদ্রার্থক প্রত্যয়।)

৪। আনী-যোগ করে : ইন্দ্র-ইন্দ্রানী, মাতুল-মাতুলানী, আচার্য-আচার্যানী (কিন্তু আচার্যের কর্মে নিয়োজিত অর্থে আচার্য)। এরূপ : শূন্দ-শূন্দা (শূন্দ জাতীয় স্ত্রীলোক), শূন্দানী (শূন্দের স্ত্রী), ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়া/ ক্ষত্রিয়ানী ইত্যাদি।

আনী-প্রত্যয় যোগে কোনো কোনো সময় অর্থের পার্থক্য ঘটে। যেমন—অরণ্য-অরণ্যানী (বৃহৎ অরণ্য), হিম-হিমানী (জমানো বরফ)।

৫. ঈনী, নী, যোগে : মায়াবী-মায়াবিনী, কুহক-কুহকিনী, যোগী-যোগিনী, মেধাবী-মেধাবিনী, দুঃখী-দুঃখিনী ইত্যাদি।

৬. বিশেষ নিয়মে সাধিত স্ত্রীবাচক শব্দ

(ক) যেসব পুরুষবাচক শব্দের শেষে ‘তা’ রয়েছে, স্ত্রীবাচক বোঝাতে সেসব শব্দে ‘ত্রী’ হয়। যেমন—নেতা-নেত্রী, কর্তা-কর্ত্রী, শ্রোতা-শ্রোত্রী, ধাতা-ধাত্রী।

(খ) পুরুষবাচক শব্দের শেষে অত্, বান্, মান্, ঈয়ান থাকলে যথাক্রমে অতী, বতী, মতি, ঈয়সী হয়। যথা : সৎ-সতী, মহৎ-মহতী, গুণবান-গুণবতী, রূপবান-রূপবতী, শ্রীমান-শ্রীমতী, বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতী, গরীয়ান-গরীয়সী।

(গ) কোনো কোনো পুরুষবাচক শব্দ থেকে বিশেষ নিয়মে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন—সম্রাট-সম্রাজ্ঞী, রাজা-রানি, যুবক-যুবতী, শ্বশুর-শ্বশুরী, নর-নারী, বন্ধু-বান্ধবী, দেবৱ-জা, শিক্ষক-শিক্ষিয়ত্রী, স্বামী-স্ত্রী, পতি-পত্নী, সভাপতি-সভানেত্রী ইত্যাদি।

বিদেশি স্ত্রীবাচক শব্দ : খান-খানম, মরদ-জেনানা, মালেক-মালেকা, মুহতারিম-মুহতারিমা, সুলতান-সুলতানা।

নিত্য স্ত্রীবাচক তৎসম শব্দ : সতীন, অর্ধাঙ্গিনী, কুলটা, বিধবা, অস্বর্যমন্ত্র্যা, অরক্ষণীয়া, সপত্নী ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য

- (ক) কতগুলো বাংলা শব্দে পুরুষ ও স্ত্রী দু-ই বোঝায়। যেমন— জন, পাধি, শিশু, সন্তান, শিক্ষিত, গুরু ইত্যাদি।
- (খ) কতগুলো শব্দে কেবল পুরুষ বোঝায়। যেমন—কবিরাজ, ঢাকী, কৃতদার, অকৃতদার ইত্যাদি।
- (গ) কতগুলো শব্দ শুধু স্ত্রীবাচক হয়। যেমন— সঙীন, সৎমা, সখিবা ইত্যাদি।
- (ঘ) কিছু পুরুষবাচক শব্দের দুটি করে স্ত্রীবাচক শব্দ রয়েছে। যথা— দেবর—ননদ (দেবরের বোন)/জা (দেবরের স্ত্রী), ভাই-বোন এবং তাবী (ভাইয়ের স্ত্রী), শিক্ষক-শিক্ষিয়ত্বী (শিক্ষিকা) (পেশা অর্থে) এবং শিক্ষকপত্নী (শিক্ষকের স্ত্রী), বন্ধু-বন্ধবী (মেয়ে বন্ধু) এবং বন্ধুপত্নী (বন্ধুর স্ত্রী), দাদা-দিদি (বড় বোন) এবং বৌদি (দাদার স্ত্রী)।
- (ঙ) বাংলা স্ত্রীবাচক শব্দের বিশেষণ স্ত্রীবাচক হয় না। যেমন : সুন্দর বলদ—সুন্দর গাই, সুন্দর ছেলে—সুন্দর মেয়ে, মেজ খুড়ো—মেজ খুড়ি ইত্যাদি।
- (চ) বিধেয় বিশেষণ অর্থাৎ বিশেষ্যের পরবর্তী বিশেষণও স্ত্রীবাচক হয় না। যেমন— মেয়েটি পাগল হয়ে গেছে (পাগলি হয়ে গেছে হবে না)। আসমী ভয়ে অস্থির (অস্থিরা হবে না)।
- (ছ) কুল-উপাধিরও স্ত্রীবাচকতা রয়েছে। যেমন : ঘোষ (পুরুষ) ঘোষজা (কন্যা অর্থে), ঘোষজায়া (পত্নী অর্থে)।

অনুশীলনী

- ১। পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ বলতে কী বোঝা ? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।
- ২। বাংলা শব্দের পরে কী কী প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা যায় ?
- ৩। বাংলায় আগত তৎসম শব্দের পরে কী কী প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা যায় ?
- ৪। নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দের পাঁচটি উদাহরণ দাও।
- ৫। শুন্ধ কর : বিধিবা স্ত্রী, বেগমা
- ৬। পার্থক্য নির্ধারণ কর
দিদি-বৌদি, শিক্ষিকা-শিক্ষিয়ত্বী, আচার্য-আচার্যানী, শুদ্রা-শুদ্রানী
- ৭। ঠিক উভয়ের টিক (✓) দাও।
 - নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ— মা, কন্যা, ছাত্রী, বালিকা, বোন/বিমাতা, বিধিবা, বন্ধ্যা, ডাইনী;
 - নিত্য পুরুষবাচক শব্দ— বাবা, দাদা, হরিণ, পতি, শিশু/ঢাকী, কবিরাজ, কৃতদার;
 - সংস্কৃত নী প্রত্যয়— মাতুলানী/ইনি প্রত্যয়—মায়াবিনী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় শব্দ

দ্বিতীয় অর্থ দুবার উক্ত হয়েছে এমন। বাংলা ভাষায় কোনো কোনো শব্দ, পদ বা অনুকার শব্দ, একবার ব্যবহার করলে যে অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলো দুইবার ব্যবহার করলে অন্য কোনো সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে। এ ধরনের শব্দের পরপর দুইবার প্রয়োগেই দ্বিতীয় শব্দ গঠিত হয়। যেমন—‘আমার জ্বর জ্বর লাগছে।’ অর্থাৎ ঠিক জ্বর নয়, জ্বরের ভাব অর্থে এই প্রয়োগ।

দ্বিতীয় শব্দ নানা রকম হতে পারে :

(ক) শব্দের দ্বিতীয়ি

১. একই শব্দ দুইবার ব্যবহার করা হয় এবং শব্দ দুটি অবিকৃত থাকে। যথা—ভালো ভালো ফল, ফোটা ফোটা পানি, বড় বড় বই ইত্যাদি।
২. একই শব্দের সঙ্গে সমার্থক আর একটি শব্দ যোগ করে ব্যবহৃত হয়। যথা—ধন—দৌলত, খেলা—শুলা, লালন—পালন, বলা—কওয়া, খোজ—খবর ইত্যাদি।
৩. দ্বিতীয় শব্দ—জোড়ার দ্বিতীয় শব্দটির আর্থিক পরিবর্তন হয়। যেমন—মিট—মাট, ফিট—ফাট, বকা—বকা, তোড়—জোড়, গৱ—সজ, রকম—সকম ইত্যাদি।
৪. সমার্থক বা বিপরীতার্থিক শব্দ যোগে। যেমন—লেন—দেন, দেনা—পাওনা, টাকা—পয়সা, ধনী—গরিব, আসা—যাওয়া ইত্যাদি।

(খ) পদের দ্বিতীয়ি

১. দুটি পদে একই বিভক্তি প্রয়োগ করা হয়, শব্দ দুটি ও বিভক্তি অপরিবর্তিত থাকে। যেমন—ঘরে ঘরে লেখাপড়া হচ্ছে। দেশে দেশে ধন্য ধন্য করতে লাগল। মনে মনে আমিও এ কথাই তেবেছি।
২. দ্বিতীয় পদের আর্থিক ধরনিগত পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু পদ—বিভক্তি অবিকৃত থাকে। যেমন—চোর হাতে নাতে ধরা পড়েছে। আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

পদের দ্বিতীয়ির প্রয়োগ

(ক) বিশেষ শব্দবুলের বিশেষণসূপে ব্যবহার

১. আধিক্য বোঝাতে : রাশি রাশি ধন, ধামা ধামা ধান।
২. সামান্য বোঝাতে : আমি আজ জ্বর জ্বর বোধ করছি।
৩. পরস্পরতা বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে : ভূমি দিন দিন ঝোগা হয়ে যাচ্ছ। ভূমি বাড়ি বাড়ি হেঁটে চাঁদা তুলেছ।
৪. ক্রিয়া বিশেষণ : ধীরে ধীরে যায়, ফিরে ফিরে চায়।
৫. অনুরূপ কিছু বোঝাতে : তার সঙ্গী সাথী কেউ নেই।
৬. আঘাত বোঝাতে : ও দাদা দাদা বলে কাঁদছে।

(খ) বিশেষণ শব্দযুগলের বিশেষণ রূপে ব্যবহার

১. আধিক্য বোঝাতে : ভালো ভালো আম নিয়ে এসো। ছোট ছোট ডাল কেটে ফেল।
২. তীব্রতা বা সঠিকতা বোঝাতে : গরম গরম জিলাপি, নরম নরম হাত।
৩. সামান্যতা বোঝাতে : উড় উড় ভাব; কালো কালো চেহারা।

(গ) সর্বনাম শব্দ

- বহুবচন বা আধিক্য বোঝাতে : কে কে এলো? কেউ কেউ বলে।

(ঘ) ক্রিয়াবাচক শব্দ

১. বিশেষণ রূপে : এদিকে ঝোগীর তো যায় যায় অবস্থা। তোমার নেই নেই ভাব গেল না।
২. স্বর্ণকাল স্থায়ী বোঝাতে : দেখতে দেখতে আকাশ কালো হয়ে এলো।
৩. ক্রিয়া বিশেষণ : দেখে দেখে যেও। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনলে কীভাবে?
৪. পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে : ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি।

(ঙ) অব্যয়ের টিপ্পনি

১. ভাবের গভীরতা বোঝাতে : তার দুঃখ দেখে সবাই হায় হায় করতে লাগল। ছি ছি, ভূমি কী করেছ?
২. পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে : বার বার সে কামান গঞ্জে উঠল।
৩. অনুভূতি বা ভাব বোঝাতে : তয়ে গা ছম ছম করছে। ফোঁড়াটা টন টন করছে।
৪. বিশেষণ বোঝাতে : পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটি মিটি।
৫. ধ্বনিব্যঞ্জনা : খির খির করে বাতাস বইছে। বৃক্ষ পড়ে টাপুর টুপুর।

যুগরীতিতে টিপ্পনি শব্দের গঠন

একই শব্দ ইয়ৎ পরিবর্তন করে দিবুক্ত শব্দ গঠনের রীতিকে বলে যুগরীতি। যুগরীতিতে দিবুক্ত গঠনের কয়েকটি নিয়ম রয়েছে। যেমন-

১. শব্দের আদি স্বরের পরিবর্তন করে : চুপচাপ, মিটমাট, জারিজুরি।
২. শব্দের অস্ত্যস্বরের পরিবর্তন করে : মারামারি, হাতাহাতি, সরাসরি, জেদাজেদি।
৩. দ্বিতীয়বার ব্যবহারের সময় ব্যক্তিনির পরিবর্তনে : ছটফট, নিশপিশ, ভাতটাত।
৪. সমার্থক বা একার্থক সহচর শব্দ যোগে : চালচলন, রীতিনীতি, বনজজল, তয়ড়র।
৫. ভিন্নার্থক শব্দ যোগে : ডালভাত, তালাচাবি, পথঘাট, অলিগলি।
৬. বিপরীতার্থক শব্দ যোগে : ছোট-বড়, আসা-যাওয়া, জনা-মৃত্যু, আদান-প্রদান।

ପଦାତ୍ମକ ଦିଲୁକ୍ତ

ବିଭିନ୍ନମୁକ୍ତ ପଦେର ଦୁଇବାର ବ୍ୟବହାରକେ ପଦାତ୍ମକ ଦିଲୁକ୍ତ ବଳା ହୁଏ । ଏଗୁଳୋ ଦୁଇ ରକମେ ଗଠିତ ହୁଏ । ସେମନ-

୧. ଏକଇ ପଦେର ଅବିକୃତ ଅବସ୍ଥାଯ ଦୁଇବାର ବ୍ୟବହାର । ସଥା— ତମେ ତମେ ଏଗିଯେ ଗୋଲାମ । ହାଟେ ହାଟେ ବିକିଯେ ତୋର ତରା ଆପଣ ।
୨. ଯୁଗମୀତିତେ ଗଠିତ ଦିଲୁକ୍ତ ପଦେର ବ୍ୟବହାର । ସଥା— ହାତେ ନାତେ, ଆକାଶେ-ବାତାସେ, କାପଡ଼-ଚୋପଡ଼, ଦଲେ-ବଲେ ଇତ୍ୟାଦି ।

ବିଶିଷ୍ଟାର୍ଥକ ବାଗଧାରାୟ ଦିଲୁକ୍ତ ଶବ୍ଦେର ପ୍ରୟୋଗ

ଛେଲେଟିକେ ଚୋଥେ ଚୋଥେ ରେଖୋ । (ସତର୍କତା)

ଫୁଲଗୁଲୋ ତୁଇ ଆନରେ ବାଛା ବାଛା । (ଭାବେର ପ୍ରଗାଢ଼ତା)

ଧେକେ ଧେକେ ଶିଶୁଟି କୌଦହେ । (କାଳେର ବିସତାର)

ଲୋକଟା ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ଶୟତାନ । (ଆଧିକ୍ୟ)

ଖୀଚାର ଝାକେ ଝାକେ, ପରଶେ ମୁଖେ ମୁଖେ, ନୀରବେ ଚୋଥେ ଚୋଥେ ଯାଏ ।

ଧଵନ୍ୟାତ୍ମକ ଦିଲୁକ୍ତ

କୋନୋ କିଛିର ସାଭାବିକ ବା କାଳନିକ ଅନୁକ୍ରତିବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦେର ରୂପକେ ଧଵନ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ବଲେ । ଏ ଜାତୀୟ ଧଵନ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦେର ଦୁଇବାର ପ୍ରୟୋଗେର ନାମ ଧଵନ୍ୟାତ୍ମକ ଦିଲୁକ୍ତ । ଧଵନ୍ୟାତ୍ମକ ଦିଲୁକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ, ଆଧିକ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବୋକ୍ଯାଯ । ଧଵନ୍ୟାତ୍ମକ ଦିଲୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ କରେକଟି ଉପାୟେ ଗଠିତ ହୁଏ । ସେମନ-

୧. ମାନୁଷେର ଧବନିର ଅନୁକାର : ଡେଟ ଡେଟ — ମାନୁଷେର ଉଚ୍ଚସ୍ଵରେ କାନ୍ଦାର ଧବନି । ଏରୂପ —ଟ୍ୟା ଟ୍ୟା, ହି ହି ଇତ୍ୟାଦି ।
୨. ଜୀବଜ୍ଞତ୍ଵର ଧବନିର ଅନୁକାର : ମେଟ ମେଟ (କୁକୁରେର ଧବନି) । ଏରୂପ—ମିଟ ମିଟ (ବିଡ଼ାଲେର ଡାକ), କୁକୁ କୁକୁ (କୋକିଲେର ଡାକ), କା କା (କାକେର ଡାକ) ଇତ୍ୟାଦି ।
୩. ବସ୍ତୁର ଧବନିର ଅନୁକାର : ଘଚାଘଚ (ଧାନ କାଟାର ଶବ୍ଦ) । ଏରୂପ—ମଡ଼ମଡ଼ (ଗାଛ ଭେଣେ ପଡ଼ାର ଶବ୍ଦ)
୪. ଅନୁଭୂତିଜ୍ଞାତ କାଳନିକ ଧବନିର ଅନୁକାର : ବିକିମିକି (ଉଞ୍ଚଳା) । ଏରୂପ— ଠା ଠା (ରୋଦେର ତୀତ୍ରତା), କୁଟ କୁଟ (ଶରୀରେ କାମଡ଼ ଲାଗାର ମତୋ ଅନୁଭୂତି) । ଅନୁରୂପଭାବେ— ମିନ ମିନ, ପିଟ ପିଟ, ବି ବି ଇତ୍ୟାଦି ।

ଧଵନ୍ୟାତ୍ମକ ଦିଲୁକ୍ତ ଗଠନ

୧. ଏକଇ (ଧଵନ୍ୟାତ୍ମକ) ଶବ୍ଦେର ଅବିକୃତ ପ୍ରୟୋଗ : ଧକ ଧକ, ବନ ବନ, ପଟ ପଟ ।
୨. ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟିର ଶେଷେ ଆ ଯୋଗ କରେ : ଗପାଗପ, ଟପାଟପ, ପଟାପଟ ।
୩. ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦଟିର ଶେଷେ ଇ ଯୋଗ କରେ : ଧରାଧରି, ବମବାମି, ବନବନି ।

৪. যুগ্মীতিতে গঠিত ধন্যাত্মক শব্দ : কিটির মিটির (পাখি বা বানরের শব্দ), টাপুর টুপুর (বৃক্ষ পতনের শব্দ), হাপুস হুপুস (গোঁথাসে কিছু ধাওয়ার শব্দ)।
৫. আনি-প্রত্যয় যোগেও বিশেষ দ্বিক্ষেত্র গঠিত হয় : পাখিটার ছটফটানি দেখলে কষ্ট হয়। তোমার বকবকানি আর ভালো লাগে না।

বিভিন্ন পদবূপে ধন্যাত্মক দ্বিক্ষেত্র শব্দের ব্যবহার

১. বিশেষ : বৃক্ষের বামবামানি আমাদের অস্থির করে তোলে।
২. বিশেষণ : ‘নামিল নতে বাদল ছলছল বেদনায়।’
৩. ক্রিয়া : কলকলিয়ে উঠল সেথায় নারীর প্রতিবাদ।
৪. ক্রিয়া বিশেষণ : ‘চিকচিক করে বালি কোথা নাহি কাদা।’

অনুশীলনী

- ১। দ্বিক্ষেত্র কলতে কী বোবায়? বাংলা ভাষায় দ্বিক্ষেত্র প্রয়োজনীয়তা কী?
 - ২। বাংলা ভাষায় কী কী উপায়ে দ্বিক্ষেত্র সাধিত হয়?
 - ৩। দ্বিক্ষেত্র সাধনের তিনটি উপায় উদাহরণসহ লেখ।
 - ৪। পাঁচটি করে উদাহরণ দাও
 - (ক) বিপরীতার্থক যুগ্মীতি
 - (খ) সহচর যুগ্মীতি
 - (গ) ধন্যাত্মক যুগ্মীতি
 - ৫। অর্থ লেখ ও বাক্যে প্রয়োগ দেখাও
- কানে কানে, ধনে জনে, আকারে প্রকারে, দেশে বিদেশে, রাতে দিনে, তেলে বেগুনে, ঘর সৎসার, ধ্যান ধারণা, চলনে বলনে।

৬। সঠিক উন্নরণ লিখে দাও

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| ক. অনুভূতিজাত ধন্যাত্মক দ্বিক্ষেত্র | : বামবাম/বিমবিম |
| খ. অনুকার অব্যয়ের দ্বিক্ষেত্র | : হয় না/হয় |
| গ. বিশেষ দ্বিক্ষেত্র | : ভালোয় ভালোয়/উঁচায় নিচায় |
| ঘ. ক্রিয়া দ্বিক্ষেত্র | : যায় যায়/ইাটি ইাটি |
| ঙ. ক্রিয়া বিশেষণের দ্বিক্ষেত্র | : ধীরে ধীরে/উড় উড়ু |

তৃতীয় পরিষেব সংখ্যাবাচক শব্দ

সংখ্যাবাচক শব্দ

সংখ্যা মানে গণনা বা গণনা দ্বারা সম্ভ ধারণা। সংখ্যা গণনার মূল একক ‘এক’। কাজেই সংখ্যাবাচক শব্দে এক, একাধিক, প্রথম, প্রাথমিক ইত্যাদির ধারণা করতে পারি। যেমন : এক টাকা, দশ টাকা। এক টাকাকে এক এক করে দশবার নিলে হয় দশ টাকা।

সংখ্যাবাচক শব্দ চার প্রকার

১. অঙ্কবাচক, ২. পরিমাণ বা গণনাবাচক, ৩. ক্রম বা পূরণবাচক ও ৪. তারিখবাচক।

১. অঙ্কবাচক সংখ্যা

‘তিন টাকা’ বলতে এক টাকার তিনটি একক বা এককের সমষ্টি বোায়। আমাদের একক হলো ‘এক’।
সুতরাং এক + এক + এক = তিন।

এভাবে আমরা এক থেকে একশ পর্যন্ত গণনা করতে পারি। এক থেকে একশ পর্যন্ত এভাবে গণনার পদ্ধতিকে বলা হয় দশ গুণেন্তর পদ্ধতি।

এক থেকে দশ পর্যন্ত আমরা এভাবে লিখে থাকি : এক (১), দুই (২), তিন (৩), চার (৪), পাঁচ (৫), ছয় (৬),
সাত (৭), আট (৮), নয় (৯), দশ (১০)। এখানে যেসব সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোকে বলি
অঙ্ক। এক থেকে নয় পর্যন্ত অঙ্কে লিখিত। দশ লিখতে এক লিখে তার ডানে একটি শূন্য (১০) দিতে হয়।
এই শূন্যের অর্থ বাম দিকে লিখিত পূর্ণ সংখ্যাটির দশগুণ। এটিই দশ গুণেন্তর প্রণালীর নিয়ম। এ ধরনের
প্রতিটি ‘দশ’কে একক ধরে আমরা বিশ বা কুড়ি (২০), ত্রিশ (৩০), চাঁচিশ (৪০), পঞ্চাশ (৫০), ষাট (৬০),
সন্তার (৭০), আশি (৮০), নববই (৯০) পর্যন্ত গণনা করি। তারপরের দশকের একককে বলা হয় একশ (১০০)।

এভাবে আমরা দশের গুণন ও এককের সংকলন করে বিভিন্ন সংখ্যা লিখে থাকি। যেমন : এক দশ + এক =
এগার (১০+১=১১), এক দশ চার = চৌদ্দ (১০+৪=১৪) ইত্যাদি। এভাবে দশকের ঘরে দুই (২) হলো বলি
দুই দশ = বিশ (১০+১০=২০) এবং দুই দশ এক = একুশ (১০+১০+১=২১)। এরূপ – তিন দশ + এক =
একত্রিশ, চার দশ + এক = একচাঁচিশ ইত্যাদি।

২. পরিমাণ বা গণনা বাচক সংখ্যা

একাধিকবার একই একক গণনা করলে যে সমষ্টি পাওয়া যায়, তা-ই পরিমাণ বা গণনাবাচক সংখ্যা। যেমন—
সপ্তাহ বলতে আমরা সাত দিনের সমষ্টি বুঝিয়ে থাকি। সপ্ত (সাত) অহ (দিনক্ষণ) = সপ্তাহ। এখানে দিন
একটি একক। এরূপ—সাতটি দিন বা সাতটি একক মিলে হয়েছে সপ্তাহ।

পূর্ণসংখ্যার গুণবাচক সংখ্যা : একগুণ = এক। যেমন— একেকে এক (অর্থাৎ $1 \times 1 = 1$), এরকম—দুয়েকে দুই,
সাতেকে সাত ইত্যাদি। দুই গুণ= দিগুণ বা দুগুণ। যেমন— দুই দু গুণে চার ($2 \times 2 = 4$)।

অনুরূপভাবে, পাঁচ দু গুণে দশ ($5 \times 2 = 10$), সাত দু গুণে চৌদ্দ ($7 \times 2 = 14$)। তিন গুণ = তিরিকে। যেমন—
তিন তিরিকে নয় ($3 \times 3 = 9$)।

চার গুণ = চার বা চৌকা। যেমন— তিন চারে বা চৌকা বার ($3 \times 4 = 12$)

পাঁচ গুণ = পাঁচ। যেমন— পাঁচ পাঁচ পাঁচিশ ($5 \times 5 = 25$)।

ছয় গুণ = ছয়ে। যেমন— তিন ছয়ে আঠার ($3 \times 6 = 18$)।

সাত গুণ = সাত। যেমন— তিন সাত একুশ ($3 \times 7 = 21$)

আট গুণ = আট। যেমন— তিন আটা (বা তে আটা) চাবিশ ($3 \times 8 = 24$)।

নয় গুণ = নৎ বা নয়। যেমন— তিন নৎ (বা তিন নয়) সাতাশ ($3 \times 9 = 27$)।

দশ গুণ = দশৎ বা দশ। যেমন— তিন দশৎ (বা তিন দশে) ত্রিশ ($3 \times 10 = 30$)।

বিশ গুণ = বিশৎ বা বিশ। যেমন— তিন বিশৎ (বা তিন বিশ) ষাট ($3 \times 20 = 60$)।

ত্রিশ গুণ = ত্রিশৎ বা ত্রিশ। যেমন— তিন ত্রিশৎ (বা তিন ত্রিশ) নববই ($3 \times 30 = 90$)।

এরূপ— চালিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সপ্তর, আশি, নববই, বা শ’-এর পূরণবাচক সংখ্যা গণনা করা হয়।

পূর্ণসংখ্যার নৃনতা বা আধিক্য বাচক ‘সংখ্যা শব্দ’

(ক) নৃন

এক এককের চার ভাগের এক ভাগ $(\frac{1}{4})$ = চৌথা, সিকি বা পোয়া।

” ” তিন ভাগের ” ” $(\frac{1}{3})$ = তেহাই।

” ” দুই ভাগের ” ” $(\frac{1}{2})$ = অর্ধ বা আধা।

” ” আট ভাগের ” ” $(\frac{1}{8})$ = আট ভাগের এক বা এক অষ্টমাংশ।

তেমনি— এক পঞ্চমাংশ ($\frac{1}{5}$), এক দশমাংশ ($\frac{1}{10}$) ইত্যাদি। এ সবের আরও ভাঙ্গতি হলে, যেমন— চার ভাগের তিন ($\frac{3}{4}$) = তিন চতুর্থাংশ। আট ভাগের তিন ($\frac{3}{8}$) = তিন অষ্টমাংশ ইত্যাদি। এক এককের ($\frac{3}{8}$) কে পরবর্তী সংখ্যার পৌনে বলা হয়। যেমন— পৌনে তিন = $(2 \frac{3}{8})$, পৌনে ছয় = $(5 \frac{3}{8})$ ইত্যাদি।

পৌনে অর্থ পোয়া অংশ বা এক চতুর্থাংশ ($\frac{1}{4}$) কম। অর্থাংশ পৌনে = $(1 - \frac{1}{4}) = \frac{3}{4}$ ।

সওয়া = $1 \frac{1}{4}$ (সওয়া বা সোয়া এক)

দেড় = $1 \frac{1}{2}$ = $\frac{1}{2}$ কম ২।

আড়াই = $2 \frac{1}{2}$ = $\frac{1}{2}$ কম ৩।

এগুলো ছাড়া অর্ধযুক্ত থাকলে সর্বজ্ঞ ‘সাড়ে’ বলা হয়। যেমন— $3 \frac{1}{2}$ = সাড়ে তিন, $4 \frac{1}{2}$ = সাড়ে চার ইত্যাদি।

৩. ক্রমবাচক সংখ্যা : একই সারি, দল বা শ্রেণিতে অবস্থিত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যার ক্রম বা পর্যায় বোঝাতে ক্রম বা পূরণবাচক সংখ্যা ব্যবহৃত হয়। যেমন— দ্বিতীয় লোকটিকে ডাক। এখানে গণনায় একজনের পরের লোকটিকে বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় লোকটির আগের লোকটিকে বলা হয় ‘প্রথম’ এবং প্রথম লোকটির পরের লোকটিকে বলা হয় দ্বিতীয়। এরূপ— তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি।

৪. তারিখবাচক শব্দ : বাংলা মাসের তারিখ বোঝাতে যে সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে তারিখবাচক শব্দ বলে।

যেমন—পঞ্চা বৈশাখ, বাইশে শ্রাবণ ইত্যাদি। তারিখবাচক শব্দের প্রথম চারটি অর্থাৎ ১ থেকে ৪ পর্যন্ত ইংরেজি নিয়মে সাধিত হয়। বাকি শব্দ বাংলার নিষ্ঠস্ব ভঙ্গিতে গঠিত।

নিচে বাংলা অঙ্কবাচক, গণনাবাচক, পূরণবাচক ও তারিখবাচক সংখ্যাগুলো দেওয়া হলো।

অঙ্ক বা সংখ্যা	গণনাবাচক	পূরণবাচক	তারিখবাচক
১	এক	প্রথম	পহেলা
২	দুই	দ্বিতীয়	দোসরা
৩	তিনি	তৃতীয়	তোসরা
৪	চার	চতুর্থ	চোঠা
৫	পাঁচ	পঞ্চম	পাঁচই
৬	ছয়	ষষ্ঠি	ছড়ই
৭	সাত	সপ্তম	সাতই
৮	আট	অষ্টম	আটই
৯	নয়	নবম	নউই
১০	দশ	দশম	দশই
১১	এগার	একাদশ	এগারই
১২	বার	দ্বাদশ	বারই
১৩	তের	ত্রয়োদশ	তেরই
১৪	চৌদ্দ	চতুর্দশ	চৌদ্দই
১৫	পনের	পঞ্চদশ	পনেরই
১৯	উনিশ	উনবিংশ	উনিশে
২০	বিশ/কুড়ি	বিংশ	বিশে
২১	একুশ	একবিংশ	একুশে

অনুশীলনী

- অঙ্কবাচক ও ক্রমবাচক শব্দের মধ্যে পার্থক্য কী? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।
- ১ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যার অঙ্কবাচক, গণনাবাচক, পূরণবাচক ও তারিখবাচক বৃগ্র দেখাও।
- নিচের শব্দগুলোকে সংখ্যা শব্দে দেখাও:

চৌথা, নবম, ত্রয়োদশ, ষোড়শ, আড়াই, পৌনে চার, সওয়া তিনি, একবিংশ, উনবিংশ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বচন

‘বচন’ ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ সংখ্যার ধারণা। ব্যাকরণে বিশেষ্য বা সর্বনামের সংখ্যাগত ধারণা প্রকাশের উপায়কে বলে বচন। বাংলা ভাষায় বচন দুই প্রকার : একবচন ও বহুবচন।

একবচন : যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তির একটিমাত্র সংখ্যার ধারণা হয়, তাকে একবচন বলে। যেমন – সে এগো। মেয়েটি স্কুলে যাইনি।

বহুবচন : যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তির একের অধিক অর্থাং বহু সংখ্যার ধারণা হয়, তাকে বহু বচন বলে। যেমন : তারা গেল। মেয়েরা এখনও আসেনি।

কেবলমাত্র বিশেষ্য ও সর্বনাম শব্দের বচনভেদ হয়। কোনো কোনো সময় টা, চি, খানা, খানি ইত্যাদি যোগ করে বিশেষ্যের একবচন নির্দেশ করা হয়। যেমন – গুরুটা, বাচ্চুটা, কলমটা, খাতাখানা, বইখানি ইত্যাদি।

বাংলায় বহুবচন প্রকাশের জন্য রা, এরা, গুলা, গুলি, গুলো, দিগ, দের প্রত্তি বিভক্তি যুক্ত হয় এবং সব, সকল, সমুদয়, কূল, কৃদ, বর্গ, নিচয়, রাজি, রাশি, পাল, দাম, নিকর, মালা, আবলি প্রত্তি সমষ্টিবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়। সমষ্টিবোধক শব্দগুলোর বেশিরভাগই তৎসম বা সহস্রত ভাষা থেকে আগত।

প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক এবং ইতর প্রাণিবাচক ও উন্নত প্রাণিবাচক শব্দভেদে বিভিন্ন ধরনের বহু বচনবোধক প্রত্যয় ও সমষ্টিবোধক শব্দ যুক্ত হয়। যেমন—

(ক) রা—কেবল উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে ‘রা’ বিভক্তির ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন— ছাত্ররা খেলা দেখতে গেছে। তারা সকলেই লেখাপড়া করে। শিক্ষকেরা জ্ঞান দান করেন।

যে ধরনের শব্দে ‘রা’ যুক্ত, সে ধরনের শব্দের শেষে কোনো কোনো সময় ‘এরা’ ব্যবহৃত হয়। যেমন— মেয়েরা খিলেরা একত্র হয়েছে। সময় সময় কবিতা বা অন্যান্য প্রয়োজনে অপ্রাণী ও ইতর প্রাণিবাচক শব্দেও রা, এরা যুক্ত হয়। যেমন — ‘পাখিরা আকাশে উড়ে দেখিয়া হিংসায় পিগীলিকারা বিধাতার কাছে পাখা চায়।’ কাকেরা এক বিরাট সত্তা করল।

(খ) গুলা, গুলি, গুলো প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে যুক্ত হয়। যেমন — অতগুলো কুমড়া দিয়ে কী হবে? আমগুলো টক। টাকাগুলো দিয়ে দাও। ময়ুরগুলো পুছ নাড়িয়ে নাচছে।

(ক) উন্নত প্রাণিবাচক মনুষ্য শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ

- | | | |
|---------|---|--|
| গণ | - | দেবগণ, নরগণ, জনগণ ইত্যাদি। |
| কৃদ | - | সুধীকৃদ, ভক্তকৃদ, শিক্ষককৃদ ইত্যাদি। |
| মন্ত্রী | - | শিক্ষকমন্ত্রী, সম্পাদকমন্ত্রী ইত্যাদি। |
| বর্গ | - | পক্ষিবর্গ, মন্ত্রিবর্গ ইত্যাদি। |

(খ) প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দে বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ

- কূল - কবিকূল, পক্ষিকূল, মাতৃকূল, বৃক্ষকূল ইত্যাদি।
- সকল - পর্বতসকল, মনুষ্যসকল ইত্যাদি।
- সব - তাইসব, পাখিসব ইত্যাদি।
- সমূহ - বৃক্ষসমূহ, মনুষ্যসমূহ ইত্যাদি।

(গ) অপ্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত বহুবচনবোধক শব্দ

আবলি, গুচ্ছ, দাম, নিকর, পুঁজি, মালা, রাঙ্গি, রাশি। যেমন—গ্রন্থাগারে রাঙ্কিত পুস্তকাবলি, কবিতাগুচ্ছ, কুসুমদাম, কমলনিকর, মেঘবুঝি, পর্বতমালা, তারকারাঙ্গি, বাঞ্জিরাশি, কুসুমনিচয় ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য : পাল ও যুথ শব্দ দুটি কেবল জন্মুর বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। যেমন — রাখাল গুরুর পাল শয়ে যায় মাঠে।
হস্তিমূখ মাঠের ফসল নষ্ট করছে।

বহুবচনের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য

- (ক) বিশেষ শব্দের একবচনের ব্যবহারেও অনেক সময় বহুবচন বোঝানো হয়। যেমন — সিংহ বনে থাকে (একবচন ও বহুবচন দু-ই বোঝায়)। গোকার আক্রমণে ফসল নষ্ট হয় (বহুবচন)। বাজারে লোক জমেছে (বহুবচন)। বাগানে কূল ফুটেছে (বহুবচন)।
- (খ) একবচনাত্মক বিশেষ্যের আগে অজন্ম, অনেক, বিস্তর, বহু, নানা, চের ইত্যাদি বহুভোধক শব্দ বিশেষণ হিসেবে প্রয়োগ করেও বহুবচন বোঝানো হয়। যেমন— অজন্ম শোক, অনেক ছাত্র, বিস্তর টাকা, বহু মেহমান, নানা কথা, চের খরচ, অচেল টাকা পয়সা ইত্যাদি।
- (গ) অনেক সব বিশেষ ও বিশেষণ পদের দ্বিতীয় প্রয়োগেও বহুবচন সাধিত হয়। যেমন — হাড়ি হাড়ি সন্দেশ। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। বড় বড় মাঠ। শাল শাল ফুল।
- (ঘ) বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচন।

বহুবচক সর্বলাম ও বিশেষ — মেঘেরা কানাকানি করছে। এটাই করিমদের বাড়ি। রবীন্দ্রনাথরা প্রতিদিন জন্মায় না। সকলে সব জানে না।

- (ঙ) কতিপয় বিদেশি শব্দে, সে ভাষার অনুসরণে বহুবচন হয়। যেমন — আন যোগে : বুজুর্গ—বুজুর্গান, সাহেব—সাহেবান।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : উপরে বর্ণিত বহুবচনবোধক প্রত্যয় ও সমষ্টিবোধক শব্দের অধিকাংশই তৎসম অর্থাত সংস্কৃত এবং সে কারণে অধিকাংশই সাধু রীতি ও সংস্কৃত শব্দে প্রযোজ্য। খাঁটি বালা শব্দের বহুবচনে এবং চলিত রীতিতে রা, এরা, গুলা, গুলো, দের — এসব প্রত্যয় এবং অনেক, বহু, সব — এসব শব্দের ব্যবহারই বহুল প্রচলিত।

একইসঙ্গে দুইবার বহুবচনবাচক প্রত্যয় বা শব্দ ব্যবহৃত হয় না। যেমন — সব মানুষই অথবা মানুষেরা মরণশীল (শুন্দি)। সকল মানুষেরাই মরণশীল (ভুল)।

অনুশীলনী

- ১। বচন কাকে বলে? বাংলা ভাষায় বচন কয় প্রকার ও কী কী?
- ২। বাংলা ভাষায় বহুবচন প্রকাশের উপায় কী কী? দশটি বহুবচনবোধক শব্দের উদাহরণ দিয়ে তোমার বক্তব্য পরিষ্কার কর।
- ৩। প্রাণিবাচক, অপ্রাণিবাচক ও উন্নত প্রাণিবাচক শব্দে যেসব বহুবচনজোপক শব্দ ও প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়, তার তিনটি করে উদাহরণ দাও।
- ৪। বিশেষ নিয়মে বহুবচন গঠনের কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ কর।
- ৫। ভুল থাকলে শুন্দি কর।
আমাদের স্কুলের সকল ছাত্রাই আজ সভায় উপস্থিত। সব গলুগণেরা মাঠে চরে বেড়াচ্ছে।
প্রতিটি গ্রামে গ্রামে এ খবর দিয়ে দাও। ভাইগণ, আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনুন।
- ৬। ক. ডান দিক থেকে যথাযোগ্য শব্দটি এনে বৌ দিকের শিরোনামের ডানে বসাও।
একবচন - ছাত্র, মা, তোমরা, পাখিগুলো, গরু, দেশ
বহুবচন - লোকেরা, তাদের, ধনী, গরিব, বেড়াল।
খ. ডান দিক থেকে বহুবচনবোধক শব্দ / শব্দাংশ নিয়ে বৌ দিকের শব্দে যোগ কর
কুমুম, ফল, ভাই, দোকান, সাধু
কলম, স্যার, মাথা, কাপড়, বই | গুলো, রা, এরা

পদাশ্রিত নির্দেশক

কয়েকটি অব্যয় বা প্রত্যয় কোনো না কোনো শব্দের আশ্রয়ে বা পরে সংযুক্ত হয়ে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে, এগুলোকে পদাশ্রিত অব্যয় বা পদাশ্রিত নির্দেশক বলে। বাংলায় নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক প্রত্যয় ইংরেজি Definite Article 'The'-এর স্থানীয়। বচনভেদে পদাশ্রিত নির্দেশকেরও বিভিন্নতা প্রযুক্ত হয়।

- (ক) একবচনে – টা, টি, খানি, গাছা, গাছি ইত্যাদি নির্দেশক ব্যবহৃত হয়। যেমন – টাকাটা, বাড়িটা, কাপড়খানা, বইখানি, সাঠিগাছা, চুড়িগাছি ইত্যাদি।
- (খ) বহুবচনে – গুলি, গুলা, গুলো, গুলিন প্রভৃতি নির্দেশক প্রত্যয় সংযুক্ত হয়। যেমন – মানুষগুলি, লোকগুলো, আমগুলো, পটঙ্গগুলিন ইত্যাদি।

পদাশ্রিত নির্দেশকের ব্যবহার

১. (ক) 'এক' শব্দের সঙ্গে টা, টি, যুক্ত হলে অনির্দিষ্টতা বোঝায়। যেমন – একটি দেশ, সে যেমনই হোক দেখতে। কিন্তু অন্য সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে টা, টি যুক্ত হলে নির্দিষ্টতা বোঝায়। যেমন – তিনটি টাকা, দশটি বছর।
- (খ) নির্ধৰ্থকভাবেও নির্দেশক টা, টি-র ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন – সারাটি সকাল তোমার আশায় বসে আছি। ন্যাকামিটা এখন রাখ।
- (গ) নির্দেশক সর্বনামের পরে টা, টি যুক্ত হলে তা সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। যেমন – শুটি যেন কার তৈরি? এটা নয় শুটা আন। সেইটেই ছিল আমার প্রিয় কলম।
২. 'গোটা' বচনবাচক শব্দটির আগে বসে এবং খানি, খানি পরে বসে। এগুলো নির্দেশক ও অনির্দেশক দুই অর্থেই প্রযোজ্য। 'গোটা' শব্দ আগে বসে এবং সংশ্লিষ্ট পদটি নির্দিষ্টতা না বুঝিয়ে অনির্দিষ্টতা বোঝায়। যেমন – গোটা দেশই ছারখার হয়ে গেছে। গোটাদুই কমলালেৰু আছে (অনির্দিষ্ট)। দুখানা কম্বল চেয়েছিলাম (নির্দিষ্ট)। গোটাসাতেক আম এনো। একখানা বই কিনে নিও (অনির্দিষ্ট)।
- কিন্তু কবিতায় বিশেষ অর্থে 'খানি' নির্দিষ্টার্থে ব্যবহৃত হয়। যথা – 'আমি অভাগা এনেছি বহিয়া নয়ন জলে ব্যর্থ সাধনখানি।'
৩. টাক, টুক, টুকু, টো ইত্যাদি পদাশ্রিত নির্দেশক নির্দিষ্টতা ও অনির্দিষ্টতা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যেমন – পোয়াটাক দুধ দাও (অনির্দিষ্টতা)। সবচুক্কু শুধুই খেয়ে ফেলো (নির্দিষ্টতা)।
৪. বিশেষ অর্থে, নির্দিষ্টতা জ্ঞাপনে কয়েকটি শব্দ : তা, পাটি ইত্যাদি। যেমন –
তা : দশ তা কাগজ দাও।
পাটি : আমার একপাটি জুতো ছিঁড়ে গেছে।

অনুশীলনী

- ১। পদান্তিত নির্দেশক কাকে বলে? বচনভেদে পদান্তিত নির্দেশকদের কী রূপভেদ হয়?
- ২। টি, টা, থানা, থানি – এ চারটি পদান্তিত নির্দেশকের প্রয়োগ দেখিয়ে বাক্য রচনা কর।
- ৩। শূন্যস্থান পূরণ কর
 শাচেক,
 টি,
 মুখ
 দুধ

৪। শুন্ধ কর

দুখানি নয় চারখানি নয়, একগোটা ছেলে আমার। মুখ কিতা টুকুকে লাল। দেশখানির নামটুকুন কী?
দশগোটা বেজেছে।

৫। ভুল থাকলে শুন্ধ করে সেখ

- | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|
| (ক) টা, টি, থানা, থানি | - | বহু বচনে ব্যবহৃত হয়। |
| (খ) রা, এরা, গুলি, গুলা | - | এক বচনে ব্যবহৃত হয়। |
| (গ) টুকু, টুকুন | - | স্বজ্ঞতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। |
| (ঘ) তা, পাটি | - | শব্দের আগে বসে। |

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সমাস

সমাস মানে সংক্ষেপ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। অর্থসম্বন্ধ আছে এমন একাধিক শব্দের এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নতুন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে সমাস বলে। যেমন : দেশের সেবা = দেশসেবা, বই ও পুস্তক = বইপুস্তক, নেই পরোয়া যার = বেপরোয়া। বাক্যে শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে সমাসের সৃষ্টি। সমাস দ্বারা দুই বা ততোধিক শব্দের সমন্বয়ে নতুন অর্থবোধক পদ সৃষ্টি হয়। এটি শব্দ তৈরি ও প্রয়োগের একটি বিশেষ রীতি। সমাসের রীতি সংস্কৃত থেকে বাঞ্ছায় এসেছে। তবে খাটি বাঞ্ছা সমাসের দ্রষ্টব্যও প্রচুর পাওয়া যায়। সেগুলোতে সংস্কৃতের নিয়ম খাটে না।

সমাসের প্রক্রিয়ায় সমাসবদ্ধ বা সমাসনিষ্ঠানু পদটির নাম সমস্ত পদ।

সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদটির অন্তর্গত পদগুলোকে সমস্যমান পদ বলে।

সমাসযুক্ত পদের প্রথম অংশ (শব্দ)-কে বলা হয় পূর্বপদ এবং পরবর্তী অংশ (শব্দ)-কে বলা হয় উত্তরপদ বা পরপদ।

সমস্ত পদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয়, তার নাম সমাসবাক্য, ব্যাসবাক্য বা বিশ্ববাক্য। উদাহরণ-বিলাত-ফেরত রাজকুমার সিংহাসনে বসলেন। এখানে বিলাত-ফেরত, রাজকুমার ও সিংহাসন - এ তিনটিই সমাসবদ্ধ পদ। এগুলোর গঠন প্রক্রিয়া ও রকম - বিলাত হতে ফেরত, রাজা কুমার, সিংহ চিহ্নিত আসন - এগুলো হচ্ছে ব্যাসবাক্য। এসব ব্যাসবাক্যে 'বিলাত', 'ফেরত', 'রাজা', 'কুমার', 'সিংহ', 'আসন' হচ্ছে এক একটি সমস্যমান পদ। আর বিলাত-ফেরত, রাজকুমার এবং সিংহাসন সমস্ত পদ। বিলাত, রাজা ও সিংহ হচ্ছে পূর্বপদ এবং ফেরত, কুমার ও আসন হচ্ছে পরপদ।

সমাস প্রধানত ছয় প্রকার : দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, বহুবীহি, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব সমাস।

[দ্বিগু সমাসকে অনেক ব্যাকরণবিদ কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ কর্মধারয়কেও তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেছেন। এদিক থেকে সমাস মূলত চারটি : দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, বহুবীহি, অব্যয়ীভাব। কিন্তু সাধারণভাবে ছয়টি সমাসেরই আলোচনা করা গেল। এছাড়া, প্রাদি, নিত্য, অনুক ইত্যাদি কয়েকটি অপ্রধান সমাস রয়েছে। সংক্ষেপে সেগুলোরও আলোচনা করা হয়েছে।]

১. দ্বন্দ্ব সমাস

যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের সমান প্রাধান্য থাকে, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন - তাল ও তমাল = তাল-তমাল, দোয়াত ও কলম = দোয়াত-কলম। এখানে তাল ও তমাল এবং দোয়াত ও কলম প্রতিটি পদেরই অর্থের প্রাধান্য সমস্ত পদে রক্ষিত হয়েছে।

দৃষ্টি সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের সম্মতি বোঝানোর জন্য ব্যাসবাকেয় এবং , ও, আর - এ তিনটি অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন - মাতা ও পিতা = মাতাপিতা।

দৃষ্টি সমাস করেক প্রকারে সাধিত হয়।

১. মিলনার্থক শব্দযোগে : মা-বাপ, মাসি-পিসি, জিন-পরি, চা-বিস্কুট ইত্যাদি।
২. বিরোধার্থক শব্দযোগে : দা-কুমড়া, অহি-নকুল, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি।
৩. বিপরীতার্থক শব্দযোগে : আয়-বায়, জমা-খরচ, ছোট-বড়, ছেলে-বুড়ো, সান্ত-লোকসান ইত্যাদি।
৪. অঙ্গবাচক শব্দযোগে : হাত-পা, নাক-কান, বুক-পিঠ, মাথা-মুঠু, নাক-মুখ ইত্যাদি।
৫. সংখ্যাবাচক শব্দযোগে : সাত-পাঁচ, নয়-ছয়, সাত-সতের, উনিশ-বিশ ইত্যাদি।
৬. সমার্থক শব্দযোগে : হাট-বাজার, ঘর-দুয়ার, কল-কারখানা, মোল্লা-মৌলভি, খাতা-পত্র ইত্যাদি।
৭. প্রায় সমার্থক ও সহচর শব্দযোগে : কাগড়-চোগড়, পোকা-মাকড়, দয়া-মায়া, ধূতি-চাদর ইত্যাদি।
৮. দুটি সর্বনামযোগে : যা-তা, যে-সে, যথা-তথা, তুমি-আমি, এখানে-সেখানে ইত্যাদি।
৯. দুটি ক্রিয়াযোগে : দেখা-শোনা, যাওয়া-আসা, চলা-ফেরা, দেওয়া-থোওয়া ইত্যাদি।
১০. দুটি ক্রিয়া বিশেষণযোগে : ধীরে-সুস্থি, আগে-পাছে, আকারে-ইঞ্জিতে ইত্যাদি।
১১. দুটি বিশেষণযোগে : ভালো-মন্দ, কম-বেশি, আসল-নকল, বাকি-বকেয়া ইত্যাদি।

অঙ্গুক দৃষ্টি : যে দৃষ্টি সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভিন্ন লোপ হয় না, তাকে অঙ্গুক দৃষ্টি বলে। যেমন - দুধে-ভাতে, জলে-স্বলে, দেশে-বিদেশে, হাতে-কলমে।

* তিন বা বহু পদে দৃষ্টি সমাস হলে তাকে বহুপদী দৃষ্টি সমাস বলে। যেমন : সাহেব-বিবি-গোলাম, হাত-পা-নাক-মুখ-চোখ ইত্যাদি।

২. কর্মধারয় সমাস

যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন - নীল যে পরা = নীলপরা। শান্ত অথচ শিষ্ট = শান্তশিষ্ট। কাঁচা অথচ মিঠা = কাঁচামিঠা।

কর্মধারয় সমাস করেক প্রকারে সাধিত হয়।

১. দুটি বিশেষণ পদে একটি বিশেষ্যকে বোঝালে। যেমন - যে চালাক সেই চতুর = চালাক-চতুর।
২. দুটি বিশেষ্য পদে একই ব্যক্তি বা কস্তুরে বোঝালে। যেমন - যিনি জজ তিনিই সাহেব = জজ সাহেব।

৩. কার্যে পরম্পরাবোঝাতে দুটি কৃতস্ত বিশেষণ পদেও কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন – আগে ধোয়া
পরে মোছা = ধোয়ামোছা।
৪. পূর্বপদে স্ত্রীবাচক বিশেষণ থাকলে কর্মধারয় সমাসে সেটি পুরুষ বাচক হয়। যেমন – সুন্দরী যে
লতা = সুন্দরলতা, মহাত্মা যে কীর্তি = মহাকীর্তি।
৫. বিশেষণবাচক মহান বা মহৎ শব্দ পূর্বপদ হলে, ‘মহৎ’ ও ‘মহান’ স্থানে ‘মহা’ হয়। যেমন – মহৎ
যে জ্ঞান= মহাজ্ঞান, মহান যে নবি = মহানবি।
৬. পূর্বপদে ‘কু’ বিশেষণ থাকলে এবং পরপদের প্রথমে স্বরধ্বনি থাকলে ‘কু’ স্থানে ‘কৎ’ হয়। যেমন
– কু যে অর্থ = কদর্থ, কু যে আচার = কদাচার।
৭. পরপদে ‘রাজা’ শব্দ থাকলে কর্মধারয় সমাসে ‘রাজ’ হয়। যেমন – মহান যে রাজা = মহারাজ।
৮. বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে কর্মধারয় সমাস হলে কখনো কখনো বিশেষণ পরে আসে, বিশেষ্য আগে
যায়। যেমন – সিন্ধ যে আলু = আলুসিন্ধ, অধম যে নর = নরাধম।

কর্মধারয় সমাসের প্রকারভেদ

কর্মধারয় সমাস কয়েক প্রকার – মধ্যপদলোগী, উপমান, উপমিত ও বৃপক কর্মধারয় সমাস।

১. মধ্যপদলোগী কর্মধারয় : যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ হয়, তাকে মধ্যপদলোগী
কর্মধারয় সমাস বলে। যথা- সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন, সাহিত্য বিষয়ক সভা= সাহিত্যসভা, সৃতি
রক্ষার্থে সৌধ = সৃতিসৌধ।
২. উপমান কর্মধারয় : উপমান অর্থ তুলনীয় বস্তু। প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে
প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমেয়, আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাকে বলা হয় উপমান। উপমান ও
উপমেয়ের একটি সাধারণ ধর্ম থাকবে। যেমন – ভ্রমরের ন্যায় কৃক্ষণ কেশ = ভ্রমরকৃক্ষণকেশ। এখানে ভ্রমর উপমান
এবং কেশ উপমেয়। কৃক্ষণ হলো সাধারণ ধর্ম। সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমানবাচক পদের যে সমাস হয়,
তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। যথা – তুষারের ন্যায় শুক্র = তুষারশুক্র, অরুণের ন্যায় রাঙ্গা = অরুণরাঙ্গা।
৩. উপমিত কর্মধারয় : সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয়ের পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয়, তাকে
উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে (এ ক্ষেত্রে সাধারণ গুণটিকে অনুমান করে নেওয়া হয়) এ সমাসে উপমেয়ের পদটি
পূর্বে বসে। যেমন – মুখ চপ্টের ন্যায় = চন্দ্রমুখ। পুরুষ সিংহের ন্যায় = সিংহপুরুষ।
৪. বৃপক কর্মধারয় : উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা বজানা করা হলে বৃপক কর্মধারয় সমাস হয়। এ সমাসে
উপমেয়ের পদ পূর্বে বসে এবং উপমান পদ পরে বসে এবং সমস্যমান পদে ‘বৃপ’ অথবা ‘ই’ যোগ করে ব্যাসবাক্য গঠন
করা হয়। যেমন- ক্রোধ বৃপ অনল =ক্রোধানল, বিষাদ বৃপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু, মন বৃপ মাবি= মনমাবি।
- আরও কয়েক ধরনের কর্মধারয় সমাস রয়েছে। কখনো কখনো সর্বনাম, সংখ্যাবাচক শব্দ এবং উপসর্গ আগে
বসে পরপদের সাথে কর্মধারয় সমাস গঠন করতে পারে। যেমন – অব্যয় : কুকর্ম, যথাযোগ্য। সর্বনাম :
সেকাল, একাল। সংখ্যাবাচক শব্দ : একজন, দোতলা। উপসর্গ : বিকাল, সকাল, বিদেশ, বেসুর।

৩. তৎপুরুষ সমাস

পূর্বপদের বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদে দ্বিতীয়া থেকে স্প্তমী পর্যন্ত যে কোনো বিভক্তি থাকতে পারে; আর পূর্বপদের বিভক্তি অনুসারে এদের নামকরণ হয়। যেমন - বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন। এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি ‘কে’ লোপ পেয়েছে বলে এর নাম দ্বিতীয়া তৎপুরুষ।

তৎপুরুষ সমাস নয় প্রকার : দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, স্প্তমী, নঞ্চ, উপপদ ও অল্পক তৎপুরুষ সমাস।

১. দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে, রে) ইত্যাদি লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা : দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত, বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন।

ব্যাপ্তি অর্থেও দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী। এরকম : গা-ঢাকা, রথদেখা, বীজবোনা, ভাতরাখা, ছেলে-ভুলানো (ছড়া), নঙ্গে-পড়া ইত্যাদি।

২. তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির (ঘারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা : মন দিয়ে গড়া = মনগড়া, শ্রম দ্বারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ, মধু দিয়ে মাখা= মধুমাখা।

উন, ইন, শূন্য প্রভৃতি শব্দ উচ্চরণে হলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা : এক দ্বারা উন = একেন, বিদ্যা দ্বারা ইন = বিদ্যাইন, জ্ঞান দ্বারা শূন্য = জ্ঞানশূন্য, পাঁচ দ্বারা কম = পাঁচ কম।

উপরণবাচক বিশেষ্য পদ পূর্বপদে বসলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা : স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত = স্বর্ণমণ্ডিত। এরূপ-ইরকখচিত, চন্দনচর্চিত, রত্নশোভিত ইত্যাদি।

৩. চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি (কে, জন্য, নিমিত্ত ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা- গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি, আরামের জন্য কেদারা= আরামকেদারা, বসতের নিমিত্ত বাড়ি= বসতবাড়ি, বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়েপাগলা ইত্যাদি। এরূপ-ছাত্রাবাস, ডাকমাশুল, চোষকাগজ, শিশুমঞ্চল, মুসাফিরখানা, হস্তযাত্রা, মালগুদাম, রান্নাঘর, মাপকাটি, বালিকা-বিদ্যালয়, পাগলাগারদ ইত্যাদি।

৪. পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি (হতে, থেকে ইত্যাদি) লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা - খাচা থেকে ছাড়া = খাচাছাড়া, বিলাত থেকে ফেরত = বিলাতফেরত ইত্যাদি।

সাধারণত চ্যুত, আগত, ভীত, গৃহীত, বিরত, মৃক্ত, উভীর্ণ, পালানো, ভ্রষ্ট ইত্যাদি পরপদের সঙ্গে যুক্ত হলে পদ্ধতিমী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : স্কুল থেকে পালানো = স্কুলপালানো, জেল থেকে মুক্ত = জেলমুক্ত ইত্যাদি। এ রকম জেলখালাস, বোটাখসা, আগাগোড়া, শাপমুক্ত, ঝণমুক্ত ইত্যাদি।

কোনো কোনো সময় পদ্ধতিমী তৎপুরুষ সমাসের ব্যাসবাকে এর ‘চেয়ে’ ইত্যাদি অনুসর্ণের ব্যবহার হয়। যথা— পরাণের চেয়ে প্রিয় = পরাণপ্রিয়।

৫. যষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে যষ্ঠী বিভক্তির (র, এর) লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে যষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা : চায়ের বাগান = চাবাগান, রাজার পুত্র = রাজপুত্র, খেয়ার ঘাট = খেয়াঘাট।

অনুরূপতাবে – ছাত্রসমাজ, দেশসেবা, দিল্লীঘর, বাঁদরনাচ, পাটক্ষেত, ছবিঘর, ঘোড়দৌড়, খশুরবাড়ি, বিড়ালছানা ইত্যাদি।

জ্ঞাতব্য

১. যষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে ‘রাজা’ স্থলে ‘রাজ’, পিতা, মাতা, ভাতা স্থলে যথাক্রমে ‘পিতৃ’, ‘মাতৃ’, ‘ভাতৃ’ হয়। যেমন গজনীর রাজা = গজনীরাজ, রাজার পুত্র = রাজপুত্র, পিতার ধন = পিতৃধন, মাতার সেবা = মাতৃসেবা, ভাতার মেহ = ভাতৃমেহ, পুত্রের বধ = পুত্রবধু ইত্যাদি।
২. পরপদে সহ, ভুল্য, নিত, প্রায়, সহ, প্রতিম – এসব শব্দ থাকলেও যষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন – পত্নীর সহ = পত্নীসহ, কন্যার সহ = কন্যাসহ, সহোদরের প্রতিম = সহোদরপ্রতিম / সোদরপ্রতিম ইত্যাদি।
৩. কালের কোনো অংশবোধক শব্দ পরে থাকলে তা পূর্বে বসে। যথা— অহের (দিনের) পূর্বভাগ = পূর্বাহ।
৪. পরপদে রাজি, গ্রাম, বৃন্দ, গণ, যুথ প্রভৃতি সমষ্টিবাচক শব্দ থাকলে যষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা— ছাত্রের বৃন্দ = ছাত্রবৃন্দ, গুণের গ্রাম = গুণগ্রাম, হস্তীর যুথ = হস্তীযুথ ইত্যাদি।
৫. অর্ধ শব্দ পরপদ হলে সমস্তপদে তা পূর্বপদ হয়। যেমন – পথের অর্ধ = অর্ধপথ, দিনের অর্ধ = অর্ধদিন।
৬. শিশু, দুর্ঘ ইত্যাদি শব্দ পরে থাকলে স্তুবাচক পূর্বপদ পুরুষবাচক হয়। যেমন – মৃগীর শিশু = মৃগশিশু, ছাগীর দুর্ঘ = ছাগদুর্ঘ ইত্যাদি।
৭. ব্যাসবাকে রাজা’ শব্দ পরে থাকলে সমস্তপদে তা আগে আসে। যেমন – পথের রাজা = রাজপথ, হাঁসের রাজা = রাজহাঁস।
- অঙ্গুক যষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস : ঘোড়ার ডিম, মাটির মানুষ, হাতের পাঁচ, মামার বাড়ি, সাপের পা, মনের মানুষ, কলের গান ইত্যাদি। কিন্তু, ভাতার পুত্র = ভাতৃপুত্র (নিপাতনে সিদ্ধ)।
৯. সম্মতমী তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে সম্মতমী বিভক্তি (এ, য, তে) লোপ হয়ে যে সমাস হয় তাকে সম্মতমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : গাছে পাকা = গাছপাকা, দিবায় নিদ্রা = দিবানিদ্রা। এরূপ – বাকপটু, গোলাভরা, তালকানা, অকালমৃত্যু, বিশ্ববিদ্যালয়, তোজনপটু, দানবীর, বাঙ্গবন্দি, বস্তাপচা, রাতকানা, মনমরা ইত্যাদি।

সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসে কোনো কোনো সময় ব্যাসবাকে পরপদ সমস্তপদের পূর্বে আসে। যেমন – পূর্বে
তৃত = তৃতপূর্ব, পূর্বে অশৃত = অশৃতপূর্ব, পূর্বে অদ্যন্ত = অদ্যন্তপূর্ব।

৭. নঞ্চ তৎপুরুষ সমাস : না বাচক নঞ্চ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে নঞ্চ তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা- ন আচার = অনাচার, ন কাতর = অকাতর। এরূপ - অনাদর, নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব, অভাব, বেতাল ইত্যাদি।

খাটি বাংলায় অ, আ, না কিংবা অনা হয়। যেমন – ন কাল = অকাল বা আকাল। তদ্বৃত্ত- আধোয়া, নামঞ্চুর, অকেজো, অজানা, অচেনা, আলুনি, নাছোড়, অনাবাদী, নাবালক ইত্যাদি।

না-বাচক অর্থ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ অর্থে নঞ্চ তৎপুরুষ সমাস হতে পারে। যথা-

অভাব	-	ন	বিশ্বাস	=	অবিশ্বাস (বিশ্বাসের অভাব)
ভিন্নতা	-	ন	লোকিক	=	অলোকিক।
অল্পতা	-	ন	কেশা	=	অকেশা।
বিরোধ	-	ন	সূর	=	অসূর।
অপ্রশস্ত	-	ন	কাল	=	অকাল
মন্দ	-	ন	ঘাট	=	অঘাট।

এরূপ – অমানুষ, অসঙ্গত, অভদ্র, অনন্য, অগম্য ইত্যাদি।

৮. উপগদ তৎপুরুষ সমাস : যে পদের পরবর্তী ক্রিয়মূলের সঙ্গে কৃৎ-প্রত্যয় মুক্ত হয় সে পদকে উপগদ বলে। কৃদন্ত পদের সঙ্গে উপগদের যে সমাস হয়, তাকে বলে উপগদ তৎপুরুষ সমাস। যেমন – জলে চরে যা = জলচর, জল দেয় যে = জলদ, পঞ্জে জল্যে যা = পঞ্জজ। এরূপ – গৃহস্থ, সত্যবাদী, ইন্দ্রজিৎ, ছেলেধরা, ধামাধরা, পকেটমার, পাতাচাটা, হাড়ভাঙ্গা, মাছিমারা, ছারপোকা, ঘরপোড়া, বর্ণচোরা, গলাকাটা, পা-চাটা, পাড়াবেড়ানি, ছা-পোষা ইত্যাদি।

৯. অলুক তৎপুরুষ সমাস : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বিভিন্ন গোপ হয় না, তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : গায়ে পড়া = গায়েপড়া। এরূপ-ঘিয়ে ভাজা, কলে ছাঁটা, কলের গান, গুরুর গাঢ়ি ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য : গায়ে-হলুদ, হাতেখড়ি প্রভৃতি সমস্তপদে পরপদের অর্থ প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয় না অর্থাৎ হলুদ বা খড়ি বোঝায় না, অনুষ্ঠান বিশেষকে বোঝায়। সুতরাং এগুলো অলুক তৎপুরুষ নয়, অলুক বহুবীহি সমাস।

৪. বহুবীহি সমাস

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোনো পদকে বোঝায়, তাকে বহুবীহি সমাস বলে। যথা- বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার = বহুবীহি। এখানে ‘বহু’ কিংবা ‘ব্রীহি’ কোনোটিরই অর্থের প্রাধান্য নেই, যার বহু ধান আছে এমন লোককে বোঝাচ্ছে।

বহুবীহি সমাসে সাধারণত যার, যাতে ইত্যাদি শব্দ ব্যাসবাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা : আয়ত লোচন যার = আয়তলোচনা (স্ত্রী), মহান আত্মা যার = মহাআ, স্বচ্ছ সলিল যার = স্বচ্ছসলিলা, নীল বসন যার = নীলবসনা, স্থির প্রতিজ্ঞা যার = স্থিরপ্রতিজ্ঞ, ধীর বুদ্ধি যার = ধীরবুদ্ধি।

‘**সহ**’ কিংবা ‘**সহিত**’ শব্দের সঙ্গে অন্য পদের বহুবীহি সমাস হলে ‘**সহ**’ ও ‘**সহিত**’ এর স্থলে ‘**স**’ হয়। যেমন : বাস্তবসহ বর্তমান = সবাস্তব, সহ উদ্দর যার = সহোদর > সোদর। এরূপ – সজল, সফল, সদর্প, সজঙ্গ, সকল্যাণ ইত্যাদি।

বহুবীহি সমাসে পরপদে মাতৃ, পত্নী, পুত্র, স্ত্রী ইত্যাদি শব্দ থাকলে এ শব্দগুলোর সঙ্গে ‘ক’ মুক্ত হয়। যেমন : নদী মাতা (মাতৃ) যার = নদীমাতৃক, বি (বিগত) হয়েছে পত্নী যার = বিপত্নীক। এরূপ – সস্ত্রীক, অপুত্রক ইত্যাদি।

বহুবীহি সমাসে সমস্ত পদে ‘অক্ষি’ শব্দের স্থলে ‘অক্ষ’ এবং ‘নাতি’ শব্দ স্থলে ‘নাত’ হয়। যেমন : কমলের ন্যায় অক্ষি যার = কমলাক্ষ, পঞ্চ নাতিতে যার = পঞ্চনাত। এরূপ – উর্ণনাত।

বহুবীহি সমাসে পরপদে ‘জ্ঞায়া’ শব্দ স্থানে ‘জ্ঞানি’ হয় এবং পূর্বপদের কিছু পরিবর্তন হয়। যেমন : যুবতী জ্ঞায়া যার = যুবজ্ঞানি (যুবতী স্থলে ‘যুব’ এবং ‘জ্ঞায়া’ স্থলে জ্ঞানি হয়েছে)।

বহুবীহি সমাসে পরপদে ‘চূড়া’ শব্দ সমস্ত পদে ‘চূড়’ এবং ‘কর্ম’ শব্দ সমস্ত পদে ‘কর্মা’ হয়। যেমন : চন্দ্র চূড়া যার = চন্দ্রচূড়, বিচিত্র কর্ম যার = বিচিত্রকর্মা।

বহুবীহি সমাসে ‘সমান’ শব্দের স্থানে ‘স’ এবং ‘সহ’ হয়। যেমন : সমান কর্মী যে = সহকর্মী, সমান কর্ণ যার = সমর্কণ, সমান উদ্দর যাদের = সহোদর।

বহুবীহি সমাসে পরপদে ‘গুরু’ শব্দ স্থানে ‘গুরুত্ব’ বা ‘গুরুত্বা’ হয়। যথা : সুগুরু যার = সুগুরুত্ব, পদ্মের ন্যায় গুরু যার = পদ্মগুরুত্ব, মৎস্যের ন্যায় গুরু যার = মৎস্যগুরুত্ব।

বহুবীহি সমাসের প্রকারভেদ

বহুবীহি সমাস আট প্রকার : সমানাধিকরণ, ব্যাধিকরণ, ব্যাতিহার, নঞ্চ, মধ্যপদলোপী, প্রত্যয়ান্ত, অনুক ও সংখ্যাবাচক বহুবীহি।

১. সমানাধিকরণ বহুবীহি

পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে সমানাধিকরণ বহুবীহি সমাস হয়। যেমন : হত হয়েছে শ্রী যার = হতশ্রী, খোশ মেজাজ যার = খোশমেজাজ। এরকম : হৃতসর্বস্ব, উচ্চশির, পীতাম্বর, নীলকণ্ঠ, জ্বরদস্তি, সুশীল, সুশ্রী, বদবখ্ত, কমবখ্ত ইত্যাদি।

২. ব্যাধিকরণ বহুবীহি

বহুবীহি সমাসের পূর্বপদ এবং পরপদ কোনোটিই যদি বিশেষণ না হয়, তবে তাকে বলে ব্যাধিকরণ বহুবীহি। যথা : আশীতে (দাতে) বিষ যার = আশীবিষ, কথা সর্বস্ব যার = কথাসর্বস্ব।

পরপদ কৃদন্ত বিশেষণ হলেও ব্যাধিকরণ বহুবীহি সমাস হয়। যেমন : দুই কান কাটা যার = দু কানকাটা, বোঁটা খসেছে যার = বোঁটাখসা। অনুরূপভাবে – ছা-পোষা, পা-চাটা, পাতা-চাটা, পাতাছেঁড়া, ধামাধরা ইত্যাদি।

୩. ସ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀହି

କ୍ରିୟାର ପାରସ୍ପରିକ ଅର୍ଥେ ସ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀହି ହୟ । ଏ ସମାସେ ପୂର୍ବପଦେ ‘ଆ’ ଏବଂ ଉତ୍ତରପଦେ ‘ଇ’ ଯୁକ୍ତ ହୟ । ଯଥା : ହାତେ ହାତେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ = ହାତାହାତି, କାନେ କାନେ ଯେ କଥା = କାନାକାନି । ଏମନି ଭାବେ -ଚୁଳାଚୁଳି, କାଡ଼ାକାଡ଼ି, ଗାଲାଗାଲି, ଦେଖାଦେଖି, କୋଳାକୁଳି, ଲାଠାଲାଟି, ହାସାହାସି, ଶୁତାଶୁତି, ଘୁଷାଘୁଷି ଇତ୍ୟାଦି ।

୪. ନଞ୍ଚ ବହୁବ୍ରୀହି

ବିଶେଷ ପୂର୍ବପଦେର ଆଗେ ନଞ୍ଚ (ନୀ ଅର୍ଥବୋଧକ) ଅବ୍ୟାୟ ଯୋଗ କରେ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କରା ହଲେ ତାକେ ନଞ୍ଚ ବହୁବ୍ରୀହି ବଲେ । ନଞ୍ଚ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସେ ସାଧିତ ପଦଟି ବିଶେଷଣ ହୟ । ଯେମନ : ନ (ନାହିଁ) ଜାନ ଯାର = ଅଜାନ, ବେ (ନାହିଁ) ହେତ ଯାର = ବେହେତ, ନା (ନାହିଁ) ଚାରା (ଉପାୟ) ଯାର = ନାଚାର । ନି (ନାହିଁ) ଭୁଲ ଯାର = ନିର୍ଭୁଲ, ନା (ନୟ) ଜାନା ଯା = ନାଜାନା, ଅଜାନା ଇତ୍ୟାଦି । ଏରକମ-ନାହକ, ନିରୁପାୟ, ନିର୍ବଞ୍ଚାଟ, ଅବୁବ, ଅକେଜୋ, ବେ-ପରୋଯା, ବେଞ୍ଚଶ, ଅନଷ୍ଟ, ବେତାର ଇତ୍ୟାଦି ।

୫. ମଧ୍ୟପଦଲୋଗୀ ବହୁବ୍ରୀହି

ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସେର ସ୍ୟାଖ୍ୟାର ଜନ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ହତ ବାକ୍ୟାଥ୍ୟେର କୋନେ ଅଣ୍ଟ ଯଦି ସମସ୍ତପଦେ ଲୋପ ପାଯ, ତବେ ତାକେ ମଧ୍ୟପଦଲୋଗୀ ବହୁବ୍ରୀହି ବଲେ । ଯେମନ : ବିଡ଼ାଳେର ଚୋଥେର ନ୍ୟାଯ ଚୋଥ ଯେ ନାରୀର = ବିଡ଼ାଳଚୋଥୀ, ହାତେ ଖଡ଼ି ଦେଓୟା ହୟ ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନେ = ହାତେଖଡ଼ି । ଏମନି ଭାବେ - ଗାୟେ ହୁଦୁ, ମେନିମୁଖୋ ଇତ୍ୟାଦି ।

୬. ପ୍ରତ୍ୟାମାନ୍ତ ବହୁବ୍ରୀହି

ଯେ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସେର ସମସ୍ତପଦେ ଆ, ଏ, ଓ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତ୍ୟାମାନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ହୟ ତାକେ ବଳା ହୟ ପ୍ରତ୍ୟାମାନ୍ତ ବହୁବ୍ରୀହି । ଯଥା- ଏକ ଦିକେ ଚୋଥ (ଦୃଷ୍ଟି) ଯାର = ଏକଚୋଥ (ଚୋଥ+ଆ), ସରେର ଦିକେ ମୁଖ ଯାର = ସରମୁଖୋ (ମୁଖ+ଓ), ନିଃ (ନେଇ) ଖରଚ ଯାର = ନି-ଖରଚେ (ଖରଚ+ଏ) । ଏରକମ -ଦୋଟିନା, ଦୋମନା, ଏକଶୁଯେ, ଅକେଜୋ, ଏକଘରେ, ଦୋନଳା, ଦୋତଳା, ଉନପୀଜୁରେ ଇତ୍ୟାଦି ।

୭. ଅଳୁକ ବହୁବ୍ରୀହି

ଯେ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସେ ପୂର୍ବ ବା ପରପଦେର କୋନୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୟ ନା, ତାକେ ଅଳୁକ ବହୁବ୍ରୀହି ବଲେ । ଅଳୁକ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସେ ସମସ୍ତ ପଦଟି ବିଶେଷଣ ହୟ । ଯଥା : ମାଥାଯ ପାଗଡ଼ି ଯାର = ମାଥାଯପାଗଡ଼ି, ଗଲାଯ ଗାମଛା ଯାର= ଗଲାଯଗାମଛା (ଲୋକଟି) । ଏବୁପ - ହାତେ-ଛଡ଼ି, କାନେ-କଳମ, ଗାୟେ-ପଡ଼ା, ହାତେ-ବେଡ଼ି, ମାଥାଯ-ଛାତା, ମୁଖେ-ଭାତ, କାନେ-ଖାଟୋ ଇତ୍ୟାଦି ।

୮. ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବହୁବ୍ରୀହି

ପୂର୍ବପଦ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଏବଂ ପରପଦ ବିଶେଷ ହଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତପଦଟି ବିଶେଷଣ ବୋଝାଲେ ତାକେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବହୁବ୍ରୀହି ବଳା ହୟ । ଏ ସମାସେ ସମସ୍ତପଦେ ‘ଆ’, ‘ଇ’ ବା ‘ଈ’ ଯୁକ୍ତ ହୟ । ଯଥା - ଦଶ ଗଜ ପରିମାଣ ଯାର = ଦଶଗଜି, ଚାଁ (ଚାର) ଚାଲ ଯେ ସରେର = ଚୌଚାଲା । ଏବୁପ -ଚାରହାତି, ତେପାୟା ଇତ୍ୟାଦି ।

କିମ୍ବ, ସେ (ତିନି) ତାର (ଯେ ଯରେର) = ସେତାର (ବିଶେଷ) ।

৯. নিপাতনে সিদ্ধ (কোনো নিয়মের অধীনে নয়) বচ্ছৰীহি

দু দিকে অপ ঘার = দ্বীপ, অঙ্গৃত অপ ঘার = অঙ্গীপ, নরাকারের পশু যে = নরপশু, জীবিত থেকেও যে মৃত = জীবন্ত, পক্ষিত হয়েও যে মূর্খ = পক্ষিতমূর্খ ইত্যাদি।

৫. দিগু সমাস

সমাহার (সমষ্টি) বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ পদের যে সমাস হয়, তাকে দিগু সমাস বলে। দিগু সমাসে সমাসনিষ্ঠান পদটি বিশেষ পদ হয়। যেমন : তিন কাঙের সমাহার = ত্রিকাল, চৌরাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা, তিন মাথার সমাহার = তেমাথা, শত অন্দের সমাহার-শতাদী, পঞ্চবটের সমাহার-পঞ্চবটী, ত্রি (তিন) পদের সমাহার-ত্রিপদী ইত্যাদি। এরূপ-অক্ষতাত্ত্ব, চতুর্ভুজ, চতুরঙ্গা, ত্রিমোহিনী, তেরনদী, পঞ্চভূত, সাতসমুদ্র ইত্যাদি।

৬. অব্যয়ীভাব সমাস

পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পত্তি সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে, তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। অব্যয়ীভাব সমাসে কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয়। যেমন : জানু পর্যন্ত লম্বিত (পর্যন্ত শব্দের অব্যয় “আ”) = আজানুলম্বিত (বাতু), মরণ পর্যন্ত = আমরণ।

সামীপ্য (নৈকট্য), বিপ্সা (শৌন্কপুনিকতা), পর্যন্ত, অভাব, অনতিক্রম্যতা, সাদৃশ্য, যোগ্যতা প্রত্তি নানা অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। নিচের উদাহরণগুলোতে অব্যয়ীভাব সমাসের অব্যয় পদটি বৃক্ষনীর মধ্যে দেখানো হলো।

১. সামীপ্য (উপ) : কঠের সমীপে = উপকঠ, কুলের সমীপে = উপকুল।
২. বিপ্সা (অনু, প্রতি) : দিন দিন = প্রতি দিন, ক্ষণে ক্ষণে = প্রতিক্ষণে, ক্ষণ ক্ষণ = অনুক্ষণ।
৩. অভাব (নিঃ = নির) : আমিয়ের অভাব = নিরামিয়, ভাবনার অভাব = নির্ভাবনা, জলের অভাব=নির্জল, উৎসাহের অভাব = নিরুৎসাহ।
৪. পর্যন্ত (আ) : সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত = আসমুদ্রহিমাচল, পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক।
৫. সাদৃশ্য (উপ) : শহরের সাদৃশ = উপশহর, গ্রহের তুল্য = উপগ্রহ, বনের সাদৃশ = উপবন।
৬. অনতিক্রম্যতা (যথা) : যাতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি, সাধ্যকে অতিক্রম না করে = যথাসাধ্য। এরূপ-যথাবিধি, যথাযোগ্য ইত্যাদি।
৭. অতিক্রান্ত (উঁ) : বেলাকে অতিক্রান্ত = উঁদেল, শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = উঁচুঁখল।
৮. বিরোধ (প্রতি) : বিরুদ্ধ বাদ = প্রতিবাদ, বিরুদ্ধ কূল = প্রতিকূল।
৯. পশ্চাত (অনু) : পশ্চাত গমন = অনুগমন, পশ্চাত ধাবন = অনুধাবন।

১০. ঈষৎ (আ) : ঈষৎ নত = আনত, ঈষৎ রক্তিম = আরক্তিম।
১১. ক্ষুদ্র অর্থে (উপ) : উপগ্রহ, উপনদী।
১২. পূর্ণ বা সমগ্র অর্থে : পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ।
(পরি বা সম)
১৩. দূরবর্তী অর্থে (প্র, পর) : অক্ষির অগোচরে = পরোক্ষ। এবৃপ - প্রপিতামহ।
১৪. প্রতিনিধি অর্থে (প্রতি) : প্রতিজ্ঞায়া, প্রতিচ্ছবি, প্রতিবিস্ম্য।
১৫. প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থে (প্রতি) : প্রতিপক্ষ, প্রত্যুষ্মান।

উল্লিখিত প্রধান ছয়টি সমাস ছাড়াও কয়েকটি অপ্রধান সমাস রয়েছে। প্রাদি, নিত্য, উপগদ ও অলুক সমাস সম্বন্ধে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। এসব সমাসের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায় না। এজন্য এগুলোকে অপ্রধান মনে করা হয়।

১. প্রাদি সমাস : প্র, প্রতি, অনু প্রকৃতি অব্যয়ের সঙ্গে যদি কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষের সমাস হয়, তবে তাকে বলে প্রাদি সমাস। যথা : প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রচন। এবৃপ - পরি (চতুর্দিকে) যে অমণ = পরিঅমণ, অনুত্তে (পশ্চাতে) যে তাপ = অনুত্তাপ, প্র (প্রকৃষ্ট বূপে) ভাত (আলোকিত) = প্রভাত, প্র (প্রকৃষ্ট বূপে) গতি = প্রগতি ইত্যাদি।
২. নিত্যসমাস : যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না, তাকে নিত্যসমাস বলে। তদর্থবাচক ব্যাখ্যামূলক শব্দ বা বাক্যাংশ যোগে এগুলোর অর্থ বিশদ করতে হয়। যেমন : অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর, কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র, অন্য গৃহ = গৃহান্তর, (বিষাক্ত) কাল (যম) তুল্য (কাল বর্ণের নয়) সাপ = কালসাপ, তুমি আমি ও সে = আমরা, দুই এবং নববই = বিরানববই।

অনুশীলনী

১. সমাসের সাহায্যে কীভাবে নতুন শব্দ গঠিত হয় উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও।
২. বিশেষ ও বিশেষণ পদের এবং বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের যে কর্মধারয় সমাস হয়, উদাহরণ দিয়ে তা বুঝিয়ে দাও।
৩. ‘দিগ্বু সমাস প্রকৃত প্রস্তাবে আলাদা সমাস নয়, এটি কর্মধারয় সমাসেরই অন্তর্ভুক্ত’-আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।
৪. উপমান, উপমিত ও বুপক কর্মধারয় সমাসের সংজ্ঞা ও উদাহরণ দাও।
৫. তৎপুরুষ সমাস কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণ দিয়ে সকলগুলো তৎপুরুষ সমাসের নাম কর।
৬. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : দম্পতি, ধানক্ষেত, প্রগতি, বেতার, সহশিক্ষা।
৭. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ও মধ্যপদলোপী বহুবীহি সমাস কাকে বলে? উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও।

৮. উদাহরণ দাও

সংখ্যাবাচক শব্দ আগে বসে যে সমাস হয়, অলুক তৎপুরুষ, বহুবীহি সমাসের ‘সহ’ স্থলে ‘স’ হয়, অব্যয় পদ আগে বসে যে সমাস হয়, উপমেয়ের সাথে উপমানের যে সমাস হয়।

৯. ঠিক উভচরটিতে ঠিক (✓) দাও

ক. তৎপুরুষ সমাস হয় – পূর্বপদে দ্বিতীয়াদি বিভক্তি লোপে যে সমাস হয় / সমান বিভক্তি বিশিষ্ট একাধিক বিশেষ্যপদে যে সমাস হয় / পূর্বপদে অব্যয় যোগে যে সমাস হয়।

খ. সমাহার অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের সে সমাস হয় তাকে বলে – দ্বন্দ্ব / বহুবীহি / অলুক / দ্বিগু সমাস।

গ. উপমান–উপমেয়ের যে সমাস হয় তাকে বলে – নিত্যসমাস / প্রাদি সমাস / কর্মধারয় সমাস।

১০. সমাসবস্থ শব্দ লেখ এবং ডান দিক থেকে ঠিক সমাসের নামটি পাশে লেখ—

কাঁচা অথচ মিঠা	: তৎপুরুষ	মা মরেছে যার	: অব্যয়ীভাব
মহান যে নবি	: কর্মধারয়	দশ হাত পরিমাণ যার	: বহুবীহি
দুধে ভাতে	: দ্বন্দ্ব	তিন ফলের সমাহার	: দ্বিগু।
বিলাত থেকে ফেরত	: তৎপুরুষ		

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উপসর্গ

বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে, যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাকে ব্যবহৃত হতে পারে না। এগুলো অন্য শব্দের আগে বসে। এর প্রভাবে শব্দটির কয়েক ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন-

১. নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয়।
২. শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধিত হয়।
৩. শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটে।
৪. শব্দের অর্থের সংকোচন ঘটে। এবং
৫. শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে।

ভাষায় ব্যবহৃত এসব অব্যয়সূচক শব্দাংশেরই নাম উপসর্গ। যেমন – ‘কাজ’ একটি শব্দ। এর আগে ‘অ’ অব্যয়টি যুক্ত হলে হয় ‘অকাজ’ – যার অর্থ নিষ্ঠনীয় কাজ। এখানে অর্থের সংকোচন হয়েছে।

‘পূর্ণ’ (ভরা) শব্দের আগে ‘পরি’ যোগ করায় ‘পরিপূর্ণ’ হলো। এটি পূর্ণ শব্দের সম্প্রসারিত রূপ (অর্থে ও আকৃতিতে)। ‘হার’ শব্দের পূর্বে ‘আ’ যুক্ত করে ‘আহার’ (খাওয়া), ‘প্র’ যুক্ত করে ‘প্রহার’ (মারা), ‘বি’ যুক্ত করে ‘বিহার’ (প্রমণ), ‘পরি’ যোগ করে ‘পরিহার’ (ত্যাগ), ‘উপ’ যোগ করে ‘উপহার’ (পুরস্কার), ‘সম’ যোগ করে ‘সহার’ (বিনাশ) ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন শব্দ তৈরি হয়েছে।

এ উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অন্য শব্দের আগে যুক্ত হলে এদের অর্থদ্যোতকতা বা নতুন শব্দ সৃজনের ক্ষমতা থাকে।

বাংলা ভাষায় তিনি প্রকার উপসর্গ আছে : বাংলা, তৎসম (সংস্কৃত) এবং বিদেশি উপসর্গ।

১. বাংলা উপসর্গ

বাংলা উপসর্গ মোট একশটি : অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন (উনা), কদ, কু, মি, পাতি, বি, তর, রাম, স, সা, সু, হা।

নিচে এদের প্রয়োগ দেখানো হলো।

উপসর্গ	অর্থদ্যোতকতা	উদাহরণ
১. অ	নিষ্ঠিত	অর্থে
-	অভাব	”
-	ক্রমাগত	”

উপসর্গ	অর্থদেয়োত্তরকতা		উদাহরণ
২.	অঘা	বোকা	অর্থে অঘারাম, অঘাচঢ়ী
৩.	অজ	নিতান্ত (মন্দ)	অজগাড়াগী, অজমূর্খ, অজপুকুর
৪.	অনা	অভাব	অনাবৃষ্টি, অনাদর
	-	ছাড়া	অনাছিষ্টি, অনাচার
	-	অশুভ	অনামুখো
৫.	আ	অভাব	আকাড়া, আধোয়া, আঙুনি
	-	বাঞ্জে, নিকৃষ্ট	আকাঠা, আগাছা
৬.	আড়	বক্র	আড়চোখে, আড়নয়নে
	-	আধা, প্রায়	আড়ক্ষ্যাপা, আড়মোড়া, আড়পাগলা
	-	বিশিষ্ট	আড়কোলা (পাথালিকোলা), আড়গড়া (আস্তাবর), আড়কাঠি
৭.	আন	না	আনকোরা
	-	বিক্ষিষ্ট	আনচান, আনমনা
৮.	আব	অস্পষ্টতা	আবছায়া, আবডাল
৯.	ইতি	এ বা এর	ইতিকর্তব্য, ইতিপূর্বে
	-	পুরনো	ইতিকথা, ইতিহাস
১০.	উন (উনা)	কম	উনগৌজুরে, উনিশ
১১.	কদ্	নিষিদ্ধ	কদবেল, কদর্য, কদাকার
১২.	কু	কুৎসিত/অপর্কৰ্ম	কুঅভ্যাস, কুকৰ্মা, কুনজর, কুসঙ্গা
১৩.	নি	নাই/নেতি	নিখুঁত, নিখোঁজ, নিলাজ, নিঙ্গাজ, নিরোট
১৪.	পাতি	ক্ষুদ্র	পাতিহাস, পাতিশিয়াল, পাতিলেবু, পাতকুয়ো
১৫.	বি	ভিন্নতা/নাই বা নিম্নলীয়	বিঝুই, বিফল, বিপথ
১৬.	ভৱ	পূর্ণতা	ভৱপেট, ভৱীৰা, ভৱপুর, ভৱদুপুর, ভৱসম্ম্যে
১৭.	রাম	বড় বা উৎকৃষ্ট	রামছাগল, রামদা, রামশিঙ্গা, রামবোকা
১৮.	স	সঙ্গে	সরাজ, সরব, সঠিক, সঙ্গের, সপাট
১৯.	সা	উৎকৃষ্ট	সাঙ্গিরা, সাজোয়ান
২০.	সু	উন্নত	সুনজর, সুখবর, সুদিন, সুনাম, সুকাজ
২১.	হা	অভাব	হাপিত্যেশ, হাভাতে, হাঘরে

জ্ঞাতব্য : বাংলা উপসর্গ সাধারণত বাংলা শব্দের পূর্বেই যুক্ত হয়ে থাকে।

বাংলা উপসর্গযুক্ত শব্দের বাক্যে প্রয়োগ : ‘আমি অবেলাতে দিলাম পাড়ি অটৈ সায়রে।’ অঘারাম বাস করে অজ পাড়াগায়ে। তিক্ষ্ণার চাল কাঁড়া আৱ আকাঁড়া। আকাঠার নায়ে দিলাম কাঁঠালের গলুই। ‘মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভৱে।’ ইতিহাস কথা কয়। উনাড়াতে দুনা বল। নিনাইয়ার শতেক নাও। তৱ দুপুরে কোথায় যাও? এতদিন কোথায় নিখোঝ হয়েছিলে?

২. তৎসম (সংকৃত) উপসর্গ

বাংলা ভাষায় বহু সংকৃত শব্দ হুবহু এসে গেছে। সেই সঙ্গে সংকৃত উপসর্গও তৎসম শব্দের আগে বসে শব্দের নতুন রূপে অর্থের সংকেচন সম্প্রসারণ করে থাকে।

তৎসম উপসর্গ বিশিষ্টি : প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ।

বাংলা উপসর্গ যেমন বাংলা শব্দের আগে বসে, তেমনি তৎসম উপসর্গ তৎসম (সংকৃত) শব্দের আগে বসে। বাংলা উপসর্গের মধ্যে আ, সু, বি, নি- এ চারটি উপসর্গ তৎসম শব্দেও পাওয়া যায়। বাংলা ও সংকৃত উপসর্গের মধ্যে পার্থক্য এই যে, যে শব্দটির সঙ্গে উপসর্গ যুক্ত হয়, সে শব্দটি বাংলা হলে উপসর্গটি বাংলা, আৱ সে শব্দটি তৎসম হলে সে উপসর্গটিও তৎসম হয়। যেমন –আকাশ, সুনঞ্জর, বিনামা, নিলাজ বাংলা শব্দ। অতএব উপসর্গ আ, সু, বি, নি-ও বাংলা। আৱ আকষ্ট, সুভীক্ষ্ম, বিপক্ষ ও নিদায় তৎসম শব্দ। কাজেই এসব শব্দের উপসর্গ আ, সু, বি, নি-ও তৎসম উপসর্গ।

নিচে বিশিষ্ট তৎসম উপসর্গের উদাহরণ দেওয়া হলো

উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত	উদাহরণ
১.	প্র	প্রকৃষ্ট/সম্যক
	-	খ্যাতি
	-	আধিক্য
	-	গতি
	-	ধারা-পরম্পরা বা অনুগামিত
২.	পরা	আতিশয্য
	-	বিপরীত
৩.	অপ	বিপরীত
	-	নিকৃষ্ট
	-	স্থানান্তর
	-	বিকৃত
		প্রভাব, প্রচলন, প্রস্ফুটিত
		প্রসিদ্ধ, প্রতাপ, প্রভাব
		প্রগাঢ়, প্রচার, প্রবল, প্রসার
		প্রবেশ, প্রস্থান
		প্রগৌত্র, প্রশাখা,
		পরাকাষ্টা, পরাক্রান্ত, পরায়ণ
		পরাজয়, পরাভব
		অপমান, অপকার, অপচয়, অপবাদ
		অপসংকৃতি, অপকর্ম, অপসূক্ষ্টি, অপযশ
		অপসারণ, অপহরণ, অপনোদন
		অপমৃত্যু

উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত		উদাহরণ
৪.	সম-	সম্যক রূপে	অর্থে
	-	সমুখ্যে	”
৫.	নি	নিয়েথ	”
	-	নিচয়	”
৬.		আতিশয়	”
	-	অভাব	”
৭.	অব	ইনতা	”
	-	সম্যকভাবে	”
	-	নিম্ন/অধোমুখিতা	”
৮.		অক্ষতা	”
	-	পচাঃ	”
৯.		সাদৃশ্য	”
	-	গৌণঃপুন	”
	-	সঙ্গে	”
১০.	নির	অভাব	”
	-	নিচয়	”
১১.		বাহির/বহির্মুখিতা	”
	-	মল্ল	”
১২.	দূর	কষ্টসাধ্য	”
	-	বিশেষ রূপে	”
১৩.	বি	অভাব	”
	-	গতি	”
১৪.		অপ্রকৃতস্য	”
	-	উন্নম	”
১৫.	সু	সহজ	”
	-	আতিশয়	”
১৬.	উৎ	উৎবর্মুখিতা	”

	ଉପମର୍ଗ	ଯେ ଅର୍ଥେ ସ୍ୟବହୁତ	ଡାକ୍ତରଣ
୧୩.	-	ଆତିଶ୍ୟ	ଅର୍ଥେ
	-	ପ୍ରସ୍ତୁତି	” ଉତ୍ସାଦନ, ଉଚ୍ଚାରଣ
	-	ଅପକର୍ଷ	” ଉତ୍ସକୋଚ, ଉଚ୍ଛୂଙ୍ଗଳ, ଉତ୍ସକଟ
	ଅଧି	ଆଧିପତ୍ୟ	” ଅଧିକାର, ଅଧିପତି, ଅଧିବାସୀ
	-	ଉପରି	” ଅଧିରୋହଣ, ଅଧିଷ୍ଠାନ
	-	ବ୍ୟାପିତ	” ଅଧିକାର, ଅଧିବାସ, ଅଧିଗତ
୧୪.	ପରି	ବିଶେଷ ରୂପ	” ପରିପକ୍ଷ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ପରିବର୍ତ୍ତନ
	-	ଶେଷ	” ପରିଶେଷ
	-	ସମ୍ୟକ ରୂପେ	” ପରିଶ୍ରାନ୍ତ, ପରୀକ୍ଷା, ପରିମାଣ
୧୫.	-	ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ	” ପରିଭ୍ରମଣ, ପରିମଳ
	ପ୍ରତି	ସଦୃଶ	” ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ପ୍ରତିଧବନି
	-	ବିରୋଧ	” ପ୍ରତିବାଦ, ପ୍ରତିଦର୍ଦ୍ଦୀ
	-	ପୌନଃପୁନ	” ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରତିମାସ
୧୬.	ଉପ	ଅନୁରୂପ କାଜ	” ପ୍ରତିଘାତ, ପ୍ରତିଦାନ, ପ୍ରତ୍ୟାଗକାର
		ସାମୀପ୍ୟ	” ଉପକୂଳ, ଉପକର୍ତ୍ତ
		ସଦୃଶ	” ଉପଦ୍ଵିପ, ଉପବନ
		କ୍ଷୁଦ୍ର	” ଉପପଥ, ଉପସାଗର, ଉପନେତା
		ବିଶେଷ	” ଉପନୟନ (ପୈତା), ଉପଭୋଗ
୧୭.	ଅଭି	ସମ୍ୟକ	” ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଅଭିଜ୍ଞ, ଅଭିଭୂତ
	-	ଗମନ	” ଅଭିଯାନ, ଅଭିସାର
	-	ସମ୍ମୁଖ ବା ଦିକ	” ଅଭିମୁଖ, ଅଭିବାଦନ
୧୮.	ଅତି	ଆତିଶ୍ୟ	” ଅତିକାର, ଅତ୍ୟାଚାର, ଅତିଶ୍ୟ
	-	ଅତିକ୍ରମ	” ଅତିମାନବ, ଅତିପ୍ରାକ୍
୧୯.	ଆ	ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	” ଆକର୍ତ୍ତ, ଆମରଣ, ଆସମୁଦ୍ର
	-	ଇବେ	” ଆରଙ୍ଗ, ଆଭାସ
	-	ବିପରୀତ	” ଆଦାନ, ଆଗମନ
୨୦.	ଅପି	ବ୍ୟାକରଣେର ସୂତ୍ର	” ଅପିନିହିତି

বাকেজ উৎসম উপসর্গের প্রয়োগ

কালের প্রভাবে নিয়মের পরিবর্তন ঘটেছে। ওসমান রাণক্ষেত্রে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেও পরাজিত হলেন। সমাগত সুধীজনকে সাদর অভিনন্দন জানানো হলো। তাঁর পুত্রদের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদান নেই বলে তাঁর দৃঢ়থের সীমা-গরিসীমা নেই।

৩. বিদেশি উপসর্গ

আরবি, ফারসি, ইংরেজি, হিন্দি – এসব ভাষার বহু শব্দ দীর্ঘকাল ধরে বাঙ্গা ভাষায় প্রচলিত রয়েছে। এর কতগুলো খাঁটি উচ্চারণে আবার কতগুলো বিকৃত উচ্চারণে বাঙ্গায় ব্যবহৃত হয়। এ সঙ্গে কতগুলো বিদেশি উপসর্গও বাঙ্গায় চালু রয়েছে। দীর্ঘকাল ব্যবহারে এগুলো বাঙ্গা ভাষায় বেমালুম মিশে গিয়েছে। বেমালুম শব্দটিতে ‘মালুম’ আরবি শব্দ আর ‘বে’ ফারসি উপসর্গ। এরূপ– বেহায়া, বেনজির, বেশরম, বেকার ইত্যাদি। নিচে কয়েকটি বিদেশি উপসর্গের উদাহরণ দেয়া হলো।

ক. ফারসি উপসর্গ

উপসর্গ	যে অর্থে প্রযুক্ত	উদাহরণ
১. কার্	কাজ	কার্থে
২. দর	মধ্যস্থ, অধীন	”
৩. না	না	”
৪. নিম	আধা	”
৫. ফি	প্রতি	”
৬. বদ্	মন্দ	”
৭. বে	না	”
৮. বর্	বাইরে, মধ্যে	”
৯. ব্	সহিত	”
১০. কম্	স্বল্প	”

খ. আরবি উপসর্গ

১.	আম্	সাধারণ	”	আমদরবার, আমমোক্তার
২.	খাস	বিশেষ	”	খাসমহল, খাসখবর, খাসকামরা, খাসদরবার
৩.	জা	না	”	জাজওয়াব, জাখেরাজ, জাওয়ারিশ, জাপান্তা
৪.	গর্	অভাব	”	গরমিল, গরহাজির, গররাজি

গ. ইংরেজি উপসর্গ

উপসর্গ	যে অর্থে প্রযুক্ত	অর্থে	উদাহরণ
১. ফুল	পূর্ণ	”	ফুল-হাতা, ফুল-শার্ট, ফুল-বাবু, ফুল-প্যান্ট
২. হাফ	আধা	”	হাফ-হাতা, হাফ-টিকেট, হাফ-স্কুল, হাফ-প্যান্ট
৩. হেড	প্রধান	”	হেড-মাস্টার, হেড-অফিস, হেড-প্রিডিক্ট, হেড-মৌলভি
৪. সাব	অধীন	”	সাব-অফিস, সাব-জজ, সাব-ইন্সপেক্টর

ঘ. উর্দু-হিন্দি উপসর্গ

হর : প্রত্যেক অর্থে – হররোজ, হরমাহিনা, হরকিসিম, হরহামেশা

বাক্যে বিদেশি উপসর্গের উদাহরণ

হিসেবে গরমিল থাকলে খাসমহল লাটে উঠবে। বহাল তবিয়তে দস্তখত করে ফি-রোজ হেড অফিসে আসা যাওয়া কর।

অনুশীলনী

- ১। উপসর্গ বলতে কী বোঝা? বাংলা ভাষায় কয় শ্ৰেণিৰ উপসর্গেৰ ব্যবহাৰ আছে? প্রত্যেক শ্ৰেণিৰ পাঁচটি করে উদাহৰণ দাও।
- ২। ‘উপসর্গেৰ স্বাধীন কোনো অৰ্থ নেই, কিন্তু অৰ্থ-দ্যোতকতা আছে।’ – বিশদ ব্যাখ্যা কৰ।
- ৩। বাংলা, তৎসম, বিদেশি- প্রত্যেক শ্ৰেণিৰ তিনটি করে উপসর্গেৰ উদাহৰণ দিয়ে বাক্যে প্ৰয়োগ দেখাও।
- ৪। অৰ্থ উল্লেখ কৱে বাক্য রচনা কৰ
দৱকাঁচা, বৱবাদ, ফি-হস্তা, না-মঞ্জুৰ, বেহেড, কাৱখানা, লা-জওয়াব, অনুগমন, অতিবৃষ্টি, প্ৰতিদিন, বদনজৱ
- ৫। পাৰ্থক্য নিৰ্দেশ কৱ ও বাক্যে প্ৰয়োগ দেখাও
বনাম-বেনাম; সুবাদ-অপবাদ; বহাল-বেহাল; বিগত-আগত; নিঃশ্বাস-প্ৰশ্বাস; অনুজ্ঞা-অবজ্ঞা;
- ৬। শুন্দ হলে (/) চিহ্ন এবং অশুন্দ হলে (x) চিহ্ন দাও।
ক. উপসর্গ স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পাৱে।
খ. অন্য শব্দেৰ আগে বসে।
গ. উপসর্গেৰ প্ৰভাৱে শব্দটিৰ কোনো পৱিবৰ্তন হয় না।
ঘ. উপসর্গেৰ প্ৰভাৱে শব্দটিৰ অৰ্থেৰ পৱিবৰ্তন ঘটে।
- ৭। নিচেৰ কোনটি কোন ধৱনেৰ উপসর্গ?
নিখাদ, প্ৰতিদিন, ফি-বছৱ, বেহায়া, অনুসৱণ, উপহাৰ, আগুনি, বেতমিজ, নিখুত, ফুলবাবু, বিভুই, ৯০
অনুবাদ, পাতিহাঁস, রামছাগল, নিমৱাজি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ধাতু

বাংলা ও সংস্কৃত ধাতুর সাধারণ আলোচনা

বাংলা ভাষায় বহু ক্রিয়াপদ রয়েছে। যেসব ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলা হয় ধাতু বা ক্রিয়ামূল। অন্যকথায় ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করলে দুটো অংশ পাওয়া যায় : (১) ধাতু বা ক্রিয়ামূল এবং (২) ক্রিয়া বিভক্তি। ক্রিয়াপদ থেকে ক্রিয়া বিভক্তি বাদ দিলে যা থাকে তাই ধাতু। যেমন - ‘করে’ একটি ক্রিয়াপদ। এতে দুটো অংশ রয়েছে : কর + এ; এখনে ‘কর’ ধাতু এবং ‘এ’ বিভক্তি। সুতরাং ‘করে’ ক্রিয়ার মূল বা ধাতু হলো ‘কর’ আর ক্রিয়া বিভক্তি হলো ‘এ’। অন্যকথায় ‘কর’ ধাতু বা ক্রিয়ামূলের সঙ্গে ‘এ’ বিভক্তি যুক্ত হয়ে ‘করে’ ক্রিয়াপদটি গঠিত হয়েছে।

প্রচলিত বেশিকিছু ধাতু বা ক্রিয়ামূল চেনার একটা উপায় হলো : বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার রূপ সক্ষ করা। কারণ, এই রূপ আর ধাতুরূপ এক। যেমন - কর, খা, যা, ডাক, দেখ, দেখ ইত্যাদি। এগুলো যেমন ধাতুও, তেমনি মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক বর্তমান কালের অনুজ্ঞার ক্রিয়াপদও।

ধাতুর প্রকারভেদ

ধাতু তিন প্রকারের : (১) মৌলিক ধাতু, (২) সাধিত ধাতু এবং (৩) যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু।

১. মৌলিক ধাতু

যেসব ধাতু বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, সেগুলোই মৌলিক ধাতু। এগুলোকে সিদ্ধ বা স্বয়ংসিদ্ধ ধাতুও বলা হয়। যেমন - চল, পড়, কর, শো, হ, খা ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় মৌলিক ধাতুগুলোকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায় : (ক) বাংলা, (খ) সংস্কৃত এবং (গ) বিদেশি ধাতু।

ক. বাংলা ধাতু : যেসব ধাতু বা ক্রিয়ামূল সংস্কৃত থেকে সোজাসুজি আসেনি সেগুলো হলো বাংলা ধাতু। যেমন - কাট, কাঁদ, জান, নাচ ইত্যাদি।

খ. সংস্কৃত ধাতু : বাংলা ভাষায় যেসব তৎসম ক্রিয়াপদের ধাতু প্রচলিত রয়েছে তাদের সংস্কৃত ধাতু বলে। যেমন - কৃ, গম, ধূ, গঠ, স্থা ইত্যাদি।

এখনে সংস্কৃত ধাতু ও তা থেকে গঠিত পদ এবং সংস্কৃত ধাতুর একই অর্থবোধক বাংলা ধাতু ও তা থেকে গঠিত পদের উদাহরণ দেয়া হলো।

সংস্কৃত ধাতু	সাধিত পদ	বাংলা ধাতু	সাধিত পদ
অঙ্গ	অঙ্গন, অঙ্গিত	আঁক	আঁকা
কথ	কথ্য, কথিত	কহ	কওয়া, কহন
কৃৎ	কর্তন, কর্তিত	কাট	কাটা
কৃ	কৃত, কর্তব্য	কর	করা, করে

সংস্কৃত ধাতু	সাধিত পদ	বাংলা ধাতু	সাধিত পদ
ক্রস্ত	ক্রস্তন	কান্দ	কান্দা, কান্দুনে
ক্রী	ক্রয়, ক্রীত	কিন্	কেনা, কেনাকাটা
খাদ্	খাদ্য, খাদক	খা	খাওয়া, খাওন
গঠ	গঠিত	গড়	গড়া, গড়ন
ঘূষ	ঘূষ্ট, ঘূষণ	ঘষ	ঘষা
দৃশ্য	দৃশ্য, দর্শন	দেখ	দেখা, দেখন
ধ্	ধৃত, ধারণ	ধর	ধরা, ধরন
পঠ	পঠন, পাঠ্য, পঠিত	পড়	পড়া, পড়ন
বৰ্থ	বৰ্থন	বাঁধ	বাঁধন, বাঁধা
বুধ	বুদ্ধ, বোধ	বুঝ	বুঝা
রঞ্জ	রঞ্জণ, রঞ্জিত, রঞ্জী	রাখ	রাখা
শ্ৰ	শ্ৰবণ, শ্ৰুত	শুন	শুনা, শোনা
স্থা	স্থান, স্থানীয়	থাক	থাকা
হস	হাস, হাসন	হস	হাসা, হাসি

গ. বিদেশাগত ধাতু : প্রথানত হিন্দি এবং বৃটিং আৱবি-ফাৱসি ভাষা থেকে যেসব ধাতু বা ক্রিয়ামূল বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলোকে বিদেশাগত ধাতু বা ক্রিয়ামূল বলা হয়। যেমন – ডিক্ষে মেগে খায়। এ বাকে ‘মাখ’ ধাতু হিন্দি ‘মাঙ’ থেকে আগত। এছাড়াও কতগুলো ক্রিয়ামূল রয়েছে যাদের ক্রিয়ামূলের মূল ভাষা নির্ণয় করা কঠিন। এ ধরনের ক্রিয়ামূলকে বলা হয় অজ্ঞাতমূল ধাতু। যেমন – ‘হেৱ ঐ দুয়াৰে দাঁড়িয়ে কে?’ এ বাকে ‘হেৱ’ ধাতুটি কোন ভাষা থেকে আগত তা জানা যায় না। তাই এটি অজ্ঞাতমূল ধাতু।

এখানে কয়েকটি বিদেশি ধাতুর উদাহরণ দেয়া হলো।

ধাতু	যে অর্থে ব্যবহৃত হয়	ধাতু	যে অর্থে ব্যবহৃত হয়
আঁট	শক্ত কৱে বাঁধা	ফিৰ	পুনৱাগমন, পুনৱাবৃত্তি
খাট	মেহনত কৱা	চাহ	প্রার্থনা কৱা
চেঁচ	চিৎকাৱ কৱা	বিগড়	নষ্ট হওয়া
জম	ঘনীভূত হওয়া	ভিজ	সিক্ত হওয়া
বুল	দোলা	ঠেল	ঠেলা
টান	আকৰ্ষণ	ডাক	আহ্বান কৱা
টুই	ছিল্ল হওয়া	লটক	বুলানো
ডৱ	জীত হওয়া		

২. সাধিত ধাতু

মৌলিক ধাতু কিংবা কোনো কোনো নাম - শব্দের সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যোগে যে ধাতু গঠিত হয়, তাকে সাধিত ধাতু বলে। যেমন - দেখ + আ= দেখা, পড় + আ= পড়া, বল + আ= বলা। সাধিত ধাতুর সঙ্গে কাল ও পুরুষসূচক বিভক্তি মুক্ত করে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন - মা শিশুকে চাঁদ দেখায়। (এখানে দেখ + আ + বর্তমান কালের সাধারণ নামপুরুষের ক্রিয়া বিভক্তি 'য়' = দেখায়)। এবুপ -শোনায়, বসায় ইত্যাদি।

গঠনরীতি ও অর্থের দিক থেকে সাধিত ধাতু তিনি প্রেরিতে বিভক্ত :

ক. নাম ধাতু, খ. প্রযোজক (নিজস্ত) ধাতু, (গ) কর্মবাচ্যের ধাতু।

ক. নাম ধাতু : বিশেষ্য, বিশেষণ এবং অনুকার অব্যয়ের পরে 'আ' প্রত্যয় যোগ করে যে নতুন ধাতুটি গঠিত হয় তা-ই নাম ধাতু। যেমন -সে ঘুমাচ্ছে। 'ঘুম' থেকে নাম ধাতু 'ঘুমা'। 'ধমক' থেকে নাম ধাতু 'ধমকা'। যেমন আমাকে ধমকিও না।

খ. প্রযোজক ধাতু : মৌলিক ধাতুর পরে প্রেরণার্থ (অপরকে নিয়োজিত করা অর্থে) 'আ' প্রত্যয় যোগ করে প্রযোজক ধাতু বা নিজস্ত ধাতু গঠিত হয়। যেমন - কর + আ= করা (এখানে 'করা' একটি ধাতু)। যেমন - সে নিজে করে না, আর একজনকে দিয়ে করায়। অনুপ্রতাবে- পড় + আ=পড়া; তিনি ছেলেকে পড়াচ্ছেন।

গ. কর্মবাচ্যের ধাতু : মৌলিক ধাতুর সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যোগে কর্মবাচ্যের ধাতু সাধিত হয়। এটি বাক্যমধ্যস্থ কর্মপদের অনুসারী ক্রিয়ার ধাতু। যথা - দেখ + আ=দেখা; কাঞ্চি ভালো দেখায় না। হার+আ=হারা; 'যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন, কেফ্টা বেটাই চোর।'

'কর্মবাচ্যের ধাতু' বলে আলাদা নামকরণের প্রয়োজন নেই। কারণ, এটি প্রযোজক ধাতুরই অঙ্গরূপ। যেমন - 'দেখায়' এবং 'হারায়' প্রযোজক ধাতু।

৩. সংযোগমূলক ধাতু : বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর, দে, পা, খা, ছাড় ইত্যাদি মৌলিক ধাতু সংযুক্ত হয়ে যে নতুন ধাতু গঠিত হয়, তা-ই সংযোগমূলক ধাতু। যেমন - যোগ (বিশেষ্য পদ) + কর (ধাতু) = 'যোগ কর' (সংযোগমূলক ধাতু)। বাক্য- তিনের সঙ্গে পাঁচ যোগ করো। সাবধান (বিশেষ্য) + হ (ধাতু) = সাবধান হ (সংযোগমূলক ধাতু)। বাক্য- এখনও সাবধান হও, নতুন আধেরে ধারাপ হবে। সংযোগমূলক ধাতুজাত ক্রিয়া সকর্মক ও অকর্মক দুই-ই হতে পারে। নিচে সংযোগমূলক ধাতু যোগে গঠিত করেকটি ক্রিয়াপদের উদাহরণ দেওয়া হলো।

১. কর-ধাতু যোগে

ক. বিশেষের সঙ্গে	:	ভয় কর, লজ্জা কর, গুণ কর
খ. বিশেষণের সঙ্গে	:	ভালো কর, মন্দ কর, সুখী কর
গ. ক্রিয়াবাচক বিশেষের সঙ্গে	:	ক্রয় কর, দান কর, দর্শন কর, রাখা কর
ঘ. ক্রিয়াজ্ঞাত (কৃদ্রষ্ট) বিশেষণের সঙ্গে	:	সাধিত কর, স্থগিত কর
ঙ. ক্রিয়া-বিশেষণের সঙ্গে	:	জলাদি কর, তাঢ়াতাঢ়ি কর, একজ কর

চ. অব্যয়ের সঙ্গে	: না কর, হাঁ কর, হায় হায় কর, ছি ছি কর
ছ. ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে	: থী থী কর, বন বন কর, টন টন কর
জ. ধ্বন্যাত্মক শব্দসহ ক্রিয়া বিশেষণ গঠনে :	চট কর, ধী কর, হন হন কর
২. হ-ধাতু ঘোগে	: বড় হ, ছেট হ, ভালো হ, রাজি হ, সুখী হ
৩. দে-ধাতু ঘোগে	: উত্তর দে, ঢাকা দে, দাগা দে, জবাব দে, কান দে, দৃষ্টি দে
৪. পা-ধাতু ঘোগে	: কাল্পা পা, তয় পা, দুঃখ পা, লজ্জা পা, ব্যথা পা, টের পা
৫. খা-ধাতু ঘোগে	: মার খা, হিমশিম খা, ছাক খা, ঘষা খা
৬. কাট-ধাতু ঘোগে	: সাঁতার কাট, তেখি কাট, জিন কাট
৭. ছাড়-ধাতু ঘোগে	: গলা ছাড়, ডাক ছাড়, হাল ছাড়
৮. ধর-ধাতু ঘোগে	: গলা ধর, ঘুণে ধর, পচা ধর, মাথা ধর, গৌ ধর।

অনুশীলনী

- ১। ধাতু বলতে কী বোবা? ক্রিয়াপদ দেখে সহজে ধাতু চেনার উপায় কী?
- ২। ধাতু কয় প্রকার ও কী কী? সংকৃত মূল ধাতু ও বাংলা মূল ধাতুর মধ্যে পার্থক্য কী? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।
- ৩। নিচের সাধিত পদসমূহের ধাতু নির্ণয় কর এবং সাধিত ধাতুটি তৎসম হলে তার বাংলা রূপ এবং বাংলা হলে তার তৎসম রূপ নির্ণয় করে বাকেয় প্রয়োগ দেখাও :
 - খাদ্য, কথিত, বুৰা, নাচন, কথা, দৃশ্য, শেখা, দর্শন
- ৪। সাধিত ধাতু কী? সাধিত ধাতু কয় ভাগে বিভক্ত? এদের নাম লেখ।
- ৫। “বিভিন্ন পদের সঙ্গে ‘কর’ বা ‘খা’ ধাতুর সংযোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠিত হয়” – উদাহরণ দাও।
- ৬। ক. কোন্টি ঠিক? ধাতু- দুই প্রকার/ তিন প্রকার/ চার প্রকার
 - খ. বিদেশি ধাতু কোন্টি ? কাট / কৃৎ / টান
- ৭। ডান দিক থেকে শব্দ এনে ঠিক সংজ্ঞার পার্শ্বে বসাও
 - মৌলিক ধাতু ----- কৃ, চল, গড়, খাদ, আঁট
 - সাধিত ধাতু ----- শোনায়, বসায়, মুচড়ানো
 - যৌগিক ধাতু----- উত্তর দে, মার খা, তয় পা।

নবম পরিচ্ছেদ

কৃৎ প্রত্যয়ের বিস্তারিত আলোচনা

তোমরা শক্ষ করেছ যে, ক্রিয়ামূলকে বলা হয় ধাতু, আর ধাতুর সঙ্গে পুরুষ ও কালবাচক বিভক্তি যোগ করে গঠন করা হয় ক্রিয়াগদ। ধাতুর সঙ্গে যখন কোনো ধ্বনি বা ধ্বনি-সমষ্টি যুক্ত হয়ে বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ তৈরি হয়, তখন (১) ক্রিয়ামূল বা ধাতুকে বলা হয় ক্রিয়া প্রকৃতি বা প্রকৃতি; আর (২) ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি যুক্ত হয়, তাকে বলে কৃৎ-প্রত্যয়। যেমন- চল (ক্রিয়া প্রকৃতি)+ অন (কৃৎ-প্রত্যয়)= চলন (বিশেষ্য পদ)। চল (ক্রিয়া প্রকৃতি) + অন (কৃৎ-প্রত্যয়)=চলন (বিশেষণ পদ)।

‘প্রকৃতি’ কথাটি বোঝানোর জন্য প্রকৃতির আগে \checkmark চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এ প্রকৃতি চিহ্নটি ব্যবহার করলে ‘প্রকৃতি’ শব্দটি লেখার প্রয়োজন হয় না। যেমন - \checkmark গড়+উয়া =পড়ুয়া। \checkmark নাচ+উনে = নাচুনে।

কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত পদটিকে বলা হয় কৃদন্ত পদ। যেমন - উপরের উদাহরণে ‘পড়ুয়া’ ও ‘নাচুনে’ কৃদন্ত পদ।

তৎসম বা সংস্কৃত প্রকৃতির সঙ্গেও অনুরূপভাবে কৃৎ-প্রত্যয় যোগে কৃদন্ত পদ সাধিত হয়। যেমন - \checkmark গম+অন=গমন, \checkmark কৃ+ত্ব্য=কর্তব্য।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃৎ-প্রত্যয় যোগ করলে কৃৎ-প্রকৃতির আদিস্বর পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তনকে বলা হয় গুণ ও বৃদ্ধি।

১. গুণ : (ক) ই, ই-স্থলে এ, (খ) উ, উ-স্থলে ও এবং (গ) খ-স্থলে অৱ হয়। যেমন - \checkmark চিন+আ=চেনা (ই স্থলে এ হলো); \checkmark নী+আ=নেওয়া (ই স্থলে এ); \checkmark ধু+আ =ধোয়া (উ স্থলে ও) ; কৃ+তা = করতা > কর্তা (খ স্থলে অৱ)।
২. বৃদ্ধি : (ক) অ-স্থলে আ, (খ) ই ও ই-স্থলে এ, (গ) উ ও উ স্থলে ও এবং (ঘ) খ-স্থলে আৱ হয়। যেমন - পচ + অ (গক) = পাচক (পচ-এর অ স্থলে ‘আ’); শিশু+ অ(ফ) = শৈশব (ই স্থলে এ); যুব+ অন= যৌবন (উ স্থলে ও); কৃ+ঘ্যণ= কার্য (খ স্থলে আৱ)।

বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়

কৃৎ-প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন : বাংলা

১. (০) শূন্য-প্রত্যয় : কোনো প্রকার প্রত্যয়-চিহ্ন ব্যতিরেকেই কিছু ক্রিয়া-প্রকৃতি বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ রূপে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এরূপ স্থলে (০) শূন্য প্রত্যয় ধরা হয়। যেমন - এ মোকদ্দমায় তোমার জিত্ হবে না, হার-ই হবে। গ্রামে খুব ধরু পাকড় চলছে।
২. অ-প্রত্যয় : কেবল ভাববাচ্যে অ-প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন - \checkmark ধৰ+ অ=ধৰ, \checkmark মার +অ=মার। আধুনিক বাংলায় অ-প্রত্যয় সর্বত্র উচ্চারিত হয় না। যেমন - \checkmark হার + অ=হার, \checkmark জিত্+ অ = জিত।

কোনো কোনো সময় অ-প্রত্যয়ুক্ত কৃদন্ত শব্দের দ্বিতীয় প্রয়োগ হয়। যেমন - (আসন্ন সম্ভাব্যতা অর্থে দ্বিতীয়প্রাপ্ত) $\sqrt{\text{কাদ}} + \text{অ} = \text{কাদকাদ}$ (চেহারা)। এরূপ - $\sqrt{\text{পড়}} + \text{অ} = \text{পড়পড়}$, $\sqrt{\text{মর}} + \text{অ} = \text{মরমর}$ (অবস্থা) ইত্যাদি। কখনো কখনো দ্বিতীয়প্রাপ্ত কৃদন্ত পদে উ-প্রত্যয় হয়। যেমন - $\sqrt{\text{ডুব}} + \text{উ} = \text{ডুবডুবু}$ । $\sqrt{\text{উড়}} + \text{উ} = \text{উড়উড়ু}$ ।

৩. অন-প্রত্যয় : ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে ‘অন’ প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। যেমন - $\sqrt{\text{কাদ}} + \text{অন} = \text{কাদন}$ (কান্নার ভাব)। এরূপ - নাচন, বাড়ন, ঝুলন, দোলন।

বিশেষ নিয়ম

(ক) আ-কারাত্ত ধাতুর সঙ্গে অন্য স্থলে ‘ওন’ হয়। যেমন - $\sqrt{\text{খা}} + \text{অন} = \text{খাওন}$, $\sqrt{\text{ছা}} + \text{অন} = \text{ছাওন}$, $\sqrt{\text{দে}} + \text{অন} = \text{দেওন}$ ।

(খ) আ-কারাত্ত প্রযোজক (গিজন্ত) ধাতুর পরে ‘আন’ প্রত্যয় যুক্ত হলে ‘আনো’ হয়। যেমন - $\sqrt{\text{জানা}} + \text{আন} = \text{জানানো}$ । এরূপ - শোনানো, ভাসানো।

৪. অনা-প্রত্যয় : $\sqrt{\text{দুল}} + \text{অনা} = \text{দুলনা}$ । $\sqrt{\text{খেল}} + \text{অনা} = \text{খেলনা}$ ।

৫. অনি, (বিকল্পে) উনি-প্রত্যয় : $\sqrt{\text{চিরি}} + \text{অনি} = \text{চিরনি}$ । $\sqrt{\text{বাঁধি}} + \text{অনি} = \text{বাঁধনি} > \text{বাঁধুনি}$ । $\sqrt{\text{আঁটি}} + \text{অনি} = \text{আঁটনি}$ । আঁটুনি ।

৬. অন্ত-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে ‘অন্ত’ প্রত্যয় হয়। যেমন - $\sqrt{\text{উড়}} + \text{অন্ত} = \text{উড়ন্ত}$, $\sqrt{\text{ডুব}} + \text{অন্ত} = \text{ডুবন্ত}$ ।

৭. অক-প্রত্যয় : $\sqrt{\text{মুড়}} + \text{অক} = \text{মোড়ক}$ । $\sqrt{\text{বল}} + \text{অক} = \text{বলক}$ ।

৮. আ-প্রত্যয় : বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে ‘আ’ প্রত্যয় হয়। যেমন $\sqrt{\text{পড়}} + \text{আ} = \text{পড়া}$ (পড়া বই)। এরূপ রাঁধ (বিশেষ্য), রাঁধা (বিশেষণ), কেনা, বেচা, ফোটা ইত্যাদি।

৯. আই-প্রত্যয় : ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে ‘আই’ প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন - চড়ু + আই = চড়াই
সিল + আই = সিলাই > সেলাই

১০. আও-প্রত্যয় : ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে ‘আও’ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন - $\sqrt{\text{পাকড়}} + \text{আও} = \text{পাকড়াও}$,
 $\sqrt{\text{চড়}} + \text{আও} = \text{চড়াও}$ ।

১১. আন (আনো) প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে প্রযোজক ধাতু ও কর্মবাচ্যের ধাতুর পরে ‘আন/আনো’ প্রত্যয় হয়।
যেমন - $\sqrt{\text{চাল}} + \text{আন} = \text{চালান}/\text{চালানো}$ । $\sqrt{\text{মান}} + \text{আন} = \text{মানান}/\text{মানানো}$ ।

১২. অনি-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে প্রযুক্ত হয়। যেমন - $\sqrt{\text{জান}} + \text{অনি} = \text{জানানি}$, $\sqrt{\text{শুন}} + \text{অনি} = \text{শুনানি}$,
 $\sqrt{\text{উড়}} + \text{অনি} = \text{উড়ানি}$, $\sqrt{\text{উড়}} + \text{উনি} = \text{উড়ুনি}$ ।

১৩. আরি বা আরী বিকল্পে রি/উরি-প্রত্যয় : যেমন - $\sqrt{\text{ডুব}} + \text{আরি}$ / উরি = ডুবুরী। এরূপ - ধূনারী, পূজারী
ইত্যাদি

১৪. আল-প্রত্যয় : $\sqrt{\text{মাত্}} + \text{আল} = \text{মাতাল}$, $\sqrt{\text{মিশ্}} + \text{আল} = \text{মিশাল}$ ।

১৫. ই-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে ‘ই’ প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। যথা - $\sqrt{\text{ভাজ}} + \text{ই} = \text{ভাজি}$, $\sqrt{\text{বেড়}} + \text{ই} = \text{বেড়ি}$ ।

১৬. ইয়া > ইয়ে-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে ইয়া/ ইয়ে প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন - $\sqrt{\text{মর}} + \text{ইয়া} = \text{মরিয়া}$
(মরতে প্রস্তুত), $\sqrt{\text{বল}} + \text{ইয়ে} = \text{বলিয়ে}$ (বাকপটু)। এরূপ - নাচিয়ে, গাইয়ে, লিখিয়ে, বাজিয়ে, কইয়ে
ইত্যাদি।

১৭. উ-প্রত্যয় : বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে ‘উ’ প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা - $\sqrt{\text{ডাক}} + \text{উ} = \text{ডাকু}$, $\sqrt{\text{বাড়}} + \text{উ} = \text{বাডু}$, $\sqrt{\text{উড়}} + \text{উ} = \text{উডু}$ (ষষ্ঠি উডুউডু)
১৮. ‘উয়া’ বিকলে ‘ও’ – প্রত্যয় : বিশেষ্য বিশেষণ গঠনে ‘উয়া’ এবং ‘ও’ প্রত্যয় হয়। যথা - $\sqrt{\text{পড়}} + \text{উয়া} = \text{পডুয়া}$ > পড়ো , $\sqrt{\text{উড়}} + \text{উয়া} = \text{উডুয়া} > \text{উড়ো}$, $\sqrt{\text{উড়}} + \text{ও} + \text{উড়ো} = \text{চিঠি}$ ।
১৯. তা-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে ‘তা’ প্রত্যয় হয়। যেমন - $\sqrt{\text{ফির}} + \text{তা} = \text{ফিরতা}$ ফেরতা, $\sqrt{\text{পড়}} + \text{তা} = \text{পড়তা}$, $\sqrt{\text{বহু}} + \text{তা} = \text{বহতা}$ ।
২০. তি-প্রত্যয় : বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে ‘তি’ প্রত্যয় হয়। যেমন - $\sqrt{\text{ঘাট}} + \text{তি} = \text{ঘাটতি}$, $\sqrt{\text{বাড়}} + \text{তি} = \text{বাড়তি}$ । এরূপ - কাটতি, উঠতি ইত্যাদি।
২১. না-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে ‘না’ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন - $\sqrt{\text{কান্দ}} + \text{না} = \text{কান্দনা} > \text{কান্দা}$, $\sqrt{\text{রাখ}} + \text{না} = \text{রাখনা} > \text{রান্দা}$ । এরূপ-বারনা ইত্যাদি।

কৃ-প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠন : সংস্কৃত

১. অনট-প্রত্যয় : ('ট' ইঁ 'বিলুপ্ত') হয়, 'অন' থাকে) : $\sqrt{\text{নী}} + \text{অনট} = \sqrt{\text{নী}} + \text{অন} > \text{নে} + \text{অন}$ (গুণসূত্রে) = নয়ন, $\sqrt{\text{শু}} + \text{অনট} = \sqrt{\text{শু}} + \text{অন}$ (গুণ ও সমিক্ষণ ফলে) = শ্রবণ। এরূপ - স্থান, তোজন, নর্তন, দর্শন ইত্যাদি।
২. ক্ত-প্রত্যয় ('ক' ইঁ 'ত' থাকে) : $\sqrt{\text{জ্ঞা}} + \text{ক্ত} (\text{জ্ঞা} + \text{ত}) = \text{জ্ঞাত}$, $\sqrt{\text{থ্যা}} + \text{ক্ত} = \text{থ্যাত}$ ।

বিশেষ নিয়ম

- (ক) ক্ত-প্রত্যয় যুক্ত হলে নিম্নলিখিত ধাতুর অন্ত্যস্বর ‘ই’ কার হয়। যেমন - $\sqrt{\text{পঠ}} + \text{ক্ত} = (\text{পঠ} + \text{ই} + \text{ত}) = \text{পঠিত}$ । এরূপ - গিধিত, বিদিত, বেষ্টিত, চলিত, পতিত, মুষ্টিত, ক্ষুধিত, শিক্ষিত ইত্যাদি।
- (খ) ক্ত প্রত্যয় যুক্ত হলে, ধাতুর অন্ত্যস্বর ‘চ’ ও ‘জ’ স্থলে ‘ক’ হয়। যেমন - $\sqrt{\text{সিচ}} + \text{ক্ত} = (\text{সিক} + \text{ত})$ সিক্ত। এরূপ - $\sqrt{\text{মুচ}} + \text{ক্ত} = \text{মুক্ত}$, $\sqrt{\text{ভুজ}} + \text{ক্ত} = \text{ভুক্ত}$ ।

- (গ) এ ছাড়া ক্ত প্রত্যয় পরে থাকলে ধাতুর মধ্যে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন হয়। এখানে এরূপ কয়েকটি প্রকৃতি-প্রত্যয়ের উদাহরণ দেওয়া হলো। যেমন - $\sqrt{\text{গম}} + \text{ক্ত} = \text{গত}$, $\sqrt{\text{গ্রন্থ}} + \text{ক্ত} = \text{গ্রথিত}$, $\sqrt{\text{চূর্ণ}} + \text{ক্ত} = \text{চূর্ণ}$, $\sqrt{\text{ছিদ}} + \text{ক্ত} = \text{ছিন্ন}$, $\sqrt{\text{জন}} + \text{ক্ত} = \text{জ্ঞাত}$, $\sqrt{\text{দা}} + \text{ক্ত} = \text{দভ}$, $\sqrt{\text{দহ}} + \text{ক্ত} = \text{দধ্য}$, $\sqrt{\text{বচ}} + \text{ক্ত} = \text{উক্তি}$, $\sqrt{\text{বপ}} + \text{ক্ত} = \text{উপ্তি}$, $\sqrt{\text{মুহু}} + \text{ক্ত} = \text{মুপ্তি}$, $\sqrt{\text{মুখ}} + \text{ক্ত} = \text{মুখ্য}$, $\sqrt{\text{লভ}} + \text{ক্ত} = \text{লখ্য}$, $\sqrt{\text{ব্যপ}} + \text{ক্ত} = \text{সূপ্তি}$, $\sqrt{\text{সূজ}} + \text{ক্ত} = \text{সূক্ষ্ম্য}$, $\sqrt{\text{হন}} + \text{ক্ত} = \text{হত ইত্যাদি}$ ।

৩. ক্তি-প্রত্যয় ('ক' ইঁ 'তি' থাকে) : $\sqrt{\text{গম}} + \text{ক্তি} = \sqrt{\text{গম}} + \text{তি} = \text{গতি}$ (এখানে 'ম' লোপ হয়েছে)।

বিশেষ নিয়ম

- (ক) ক্তি-প্রত্যয় যোগ করলে কোনো কোনো ধাতুর অন্ত ব্যঙ্গনের লোপ হয়। যথা - $\sqrt{\text{মন}} + \text{ক্তি} = \text{মতি}$, $\sqrt{\text{রম}} + \text{ক্তি} = \text{রতি}$ ।
- (খ) কোনো কোনো ধাতুর উপধা অ-কারের বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ আ-কার হয়। যেমন - $\sqrt{\text{শ্রম}} + \text{ক্তি} = \text{শ্রান্তি}$ (সমিধসূত্রে ম>ন), $\sqrt{\text{শম}} + \text{ক্তি} = \text{শান্তি}$ ।
- (গ) 'চ' এবং 'জ' স্থলে 'ক' হয়। যেমন - $\sqrt{\text{বচ}} + \text{ক্তি} = \text{উক্তি}$, $\sqrt{\text{মুচ}} + \text{ক্তি} = \text{মুক্তি}$, $\sqrt{\text{ভুজ}} + \text{ক্তি} = \text{ভুক্তি}$ ।

(ঘ) নিপাতনে সিদ্ধ : $\sqrt{\text{গৈ}}+\text{ক্তি}=\text{গীতি}$, $\sqrt{\text{সিদ্ধ}}+\text{ক্তি}=\text{সিন্ধি}$, $\sqrt{\text{বুধ}}+\text{ক্তি}=\text{বুন্ধি}$, $\sqrt{\text{শক্ত}}+\text{ক্তি}=\text{শক্তি}$ ।

৪. তব্য ও অনীয় প্রত্যয় : কর্ম ও ভাববাচ্যের ধাতুর পরে (ক) তব্য ও (খ) অনীয় প্রত্যয় হয়।

(ক) তব্য : $\sqrt{\text{কৃ}}+\text{তব্য}=\text{কর্তব্য}$, $\sqrt{\text{দা}}+\text{তব্য}=\text{দাতব্য}$, $\sqrt{\text{পঠ}}+\text{তব্য}=\text{পাঠিতব্য}$ ।

(খ) অনীয় : $\sqrt{\text{কৃ}}+\text{অনীয়}=\text{করণীয়}$, $\sqrt{\text{রক্ষ}}+\text{অনীয়}=\text{রক্ষণীয়}$ । এরূপ-দর্শনীয়, গানীয়, শ্রবণীয়, পাঞ্জীয় ইত্যাদি।

৫. তৃচ-প্রত্যয় ('চ' ইঁ 'তৃ' থাকে) : প্রথমা একবচনে 'তৃ' স্থলে 'তা' হয়। যেমন-
 $\sqrt{\text{দা}}+\text{তৃচ}=\sqrt{\text{দা}}+\text{তৃ}=\sqrt{\text{দা}}+\text{তা}=\text{দাতা}$ $\sqrt{\text{মা}}+\text{তৃচ}=\text{মাতা}$, $\sqrt{\text{ক্রী}}+\text{তৃচ}=\text{ক্রেতা}$ ।

বিশেষ নিয়মে : $\sqrt{\text{বুধ}}+\text{তৃচ}=\sqrt{\text{বুধ}}+\text{তা}=\text{যোদ্ধা}$ ।

৬. গক-প্রত্যয় ('গ' ইঁ 'অক' থাকে) : $\sqrt{\text{পঠ}}+\text{গক}=\sqrt{\text{পঠ}}+\text{অক}=\text{পাঠক}$ । মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়ে 'আ' স্থানে 'আ' হয়েছে। যেমন- $\sqrt{\text{নী}}-\text{গক}=(\text{নৈ}+\text{অক}-\text{প্রথম স্বরের বৃদ্ধি})$ নায়ক, $\sqrt{\text{গৈ}}+\text{গক}=\text{গায়ক}$, $\sqrt{\text{শিখ}}+\text{গক}=\text{শেখক ইত্যাদি}$ ।

বিশেষ নিয়ম

(ক) গক-প্রত্যয় পরে থাকলে গিজন্ত ধাতুর 'ই' কারের লোপ হয়। যেমন - $\sqrt{\text{পুজি}}+\text{গক}=\text{পূজক}$ । এরূপ-অনক, চালক, স্তাবক।

(খ) আ-কারান্ত ধাতুর পরে গক প্রত্যয় হলে ধাতুর শেষে 'য়' আসে। যথা- $\sqrt{\text{দা}}+\text{গক}=\text{দায়ক}$, বি- $\sqrt{\text{ধা}}+\text{গক}=\text{বিধায়ক}$ ।

৭. ঘ্যণ-প্রত্যয় [ঘ, গ-ইঁ, ঘ (ঘ-ফলা) থাকে] : কর্ম ও ভাববাচ্যে ঘ্যণ হয়। যথা- $\sqrt{\text{কৃ}}+\text{ঘ্যণ}=\text{কার্য্য}>\text{কার্য}$, $\sqrt{\text{ধু}}+\text{ঘ্যণ}=\text{ধার্য}$ । এরূপ - পরিহার্য, বাচ্য, ভোজ্য, যোগ্য, হাস্য ইত্যাদি।

(দ্রষ্টব্য : আধুনিক বাংলা বানানে $\text{রেফ}+\text{ঘ}+\text{য}=ঘ্য$ হয় না, র্ঘ হয়।)

৮. ঘ-প্রত্যয় : কর্ম ও ভাববাচ্যে যোগ্যতা ও উচিত্য অর্থে 'ঘ' প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। 'ঘ' যুক্ত হলে আ-কারান্ত ধাতুর আ-কার স্থলে এ-কারান্ত হয় এবং 'ঘ' 'ঘ' হয়। যেমন - $\sqrt{\text{দা}}+\text{ঘ}=\text{দাঙ্দে}+\text{ঘ}=\text{ঘেয়}=$ দেয়। $\sqrt{\text{হা}}+\text{ঘ}=হেয়$ ।

এরূপ - বিধেয়, অজ্ঞেয়, পরিমেয়, অনুমেয় ইত্যাদি।

বিশেষ নিয়ম : ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর 'ঘ' প্রত্যয় স্থলে ঘ-ফলা হয়। যথা- $\sqrt{\text{গম}}+\text{ঘ}=\text{গম্য}$, $\sqrt{\text{জ্ঞ}}+\text{ঘ}=\text{জ্ঞ্য}$ ।

৯. গিন-প্রত্যয় (গ ইঁ, ইঁ থাকে, ইন্দি-কার হয়) : $\sqrt{\text{গহ}}+\text{গিন}=\text{গাহী}$, $\sqrt{\text{পা}}+\text{গিন}=\text{পাহী}$ । এরূপ-কাহী, দ্বাহী, সত্যবাদী, ভাবী, স্থাহী, গাহী। কিন্তু 'গিন' যুক্ত হলে 'হন' ধাতুর স্থলে 'ঘাত' হয়। যথা - আআ- $\sqrt{\text{হণ}}+\text{গিন}=\text{আঘাতী}$ ।

১০. ইন্দি-প্রত্যয় (ইন্দি)-ঁ-কার হয়) : $\sqrt{\text{শুম}}+\text{ইন্দি}=\text{শুমী}$ ।

১১. অল-প্রত্যয় (অ ইঁ, অ থাকে) : $\sqrt{\text{জি}}+\text{অল}=\text{জয়}$, $\sqrt{\text{ক্ষি}}+\text{অল}=\text{ক্ষয়}$ । এরূপ-তয়, নিচয়, বিনয়, ভেদ, বিলয়। ব্যতিক্রম : $\sqrt{\text{হণ}}+\text{অল}=\text{বধ}$ ।

কৃদন্ত বিশেষণ গঠনে কতিপয় কৃৎ-প্রত্যয়

১. ইঁকু-প্রত্যয় : $\sqrt{\text{চল}}+\text{ইঁকু}=\text{চলিকু}$ । এরূপ - ক্ষয়িকু, বর্ধিকু।

২. বর-প্রত্যয় : $\sqrt{\text{ঈশ}}+\text{বর}=\text{ঈশ্বর}$, $\sqrt{\text{ভাস}}+\text{বর}=\text{ভাস্বর}$ । এরূপ-নশ্বর, স্থাবর।

৩. র-প্রত্যয় : $\sqrt{\text{হিন}}+\text{স্ৰ}+\text{র}=\text{হিন্দ্ৰ}$, $\sqrt{\text{নম}}+\text{র}=\text{নম্বৰ}$ ।

৪. উক/উক-প্রত্যয় : $\sqrt{\text{ভু}}+\text{উক}=(\text{ভো}+\text{উক})=\text{ভাবুক}$, $\text{জাগ}+\text{উক}=(\text{জাগর}+\text{উক})\text{ জাগুক}$ ।
৫. শানচ-প্রত্যয় ('শ' ও 'চ' ইৎ, 'আন' বিকলে 'মান' থাকে) : $\sqrt{\text{দীপ}}+\text{শানচ}=\text{দীপ্যমান}$ । এরূপ -
 $\sqrt{\text{চল}}+\text{শানচ}=\text{চলমান}$, $\sqrt{\text{বৃথ}}+\text{শানচ}=\text{বর্ধমান}$ ।
৬. ঘএঁ-প্রত্যয় (কৃদন্ত বিশেষ গঠনে), ঘ এবং এও ইৎ, 'অ' থাকে) : $\sqrt{\text{বস}}+\text{ঘএঁ}=\text{বাস}$, $\sqrt{\text{যুজ}}+\text{ঘএঁ}=\text{যোগ}$,
 $\sqrt{\text{কুধ}}+\text{ঘএঁ}=\text{ক্রোধ}$, $\sqrt{\text{খুদ}}+\text{ঘএঁ}=\text{খেদ}$, $\sqrt{\text{তিদ}}+\text{ঘএঁ}=\text{তেদে}$ ।
- বিশেষ নিরয় : $\sqrt{\text{ত্যজ}}+\text{ঘএঁ}=\text{ত্যাগ}$, $\sqrt{\text{পচ}}+\text{ঘএঁ}=\text{পাক}$, $\sqrt{\text{শুচ}}+\text{ঘএঁ}=\text{শোক}$ ।
কিন্তু, $\sqrt{\text{নন্দি}}+\text{অন}=\text{নন্দন}$ । এক্ষেত্রে আ বোগে 'নন্দনা' হয় না।

অনুশীলনী

- ১। ধাতু ও ক্রিয়া প্রকৃতির পার্থক্য উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও।
- ২। শূন্যস্থান পূর্ণ কর
 (ক) ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি যুক্ত হয় তাকে বলে-----।
 (খ) কৃৎ-প্রত্যয়সাধিত পদটিকে বলা হয়-----।
- ৩। গুণ ও বৃদ্ধি বলতে কী বোঝ ?
- ৪। নিচের প্রত্যয়গুলোর কোনটি 'ইৎ' হয় লেখ।
 অনট, আন, শানচ, তৃচ, শিল, ঘএঁ, ঘ্যণ, ক্ষি, ক্ষ
 নিচের কৃৎ-প্রত্যয়সাধিত শব্দগুলোর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর। $\sqrt{\text{পঠ}}+\text{ক্ষ}=$ পঠিত, $\sqrt{\text{শম}}+\text{ক্ষ}=$ শান্তি,
 $\sqrt{\text{শুচ}}+\text{ঘএঁ}=$ শোক, $\sqrt{\text{নী}}+\text{তৃচ}=$ নেতা
- ৫। প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর।
 নাচনে, ঘরনা, নিবুনিবু, চেনা, মাতাল, ভূত, লিখিত, বুদ্ধ, চরণ, উক্তি, অনুরাগী, বিধায়ক,
 জাগুক
- ৬। ধাতু ও প্রত্যয় নির্ণয় কর
 জমানো, ডরানো, হাঁকানো, লটকানো, ঘরনা
- ৭। যেটি ঠিক তার ডানে টিক (।) চিহ্ন দাও
 ক. ক্রিয়ামূলকে/ ক্রিয়ার কালকে/ক্রিয়াপদকে/ অক্রিয়াবাচক পদকে বলা হয় ক্রিয়াপ্রকৃতি।
 খ. কৃদন্তপদকে / ক্রিয়াপদকে/ক্রিয়া বিশেষণকে/ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি
 যুক্ত হয় তাকে বলে কৃৎ প্রত্যয়।
 গ. কৃৎ প্রত্যয়হীন পদকে/ কৃৎ প্রত্যয় সাধিত পদকে / ক্রিয়ামূলকে বলা হয় কৃদন্তপদ।
- ৮। প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর
 ঘাটতি, ঘলক, ঝাঁধুনি, ঝাড়ু, দর্শন, মুক্ত, মুখ, উল্ত, তোজ্য, জয়

দশম পরিচ্ছেদ

তারিখি প্রত্যয়

১. ছেলেটি বড় লাজুক।
২. বড়াই করা তালো না।
৩. ঘরামি ডেকে ঘর ছেয়ে নে।

ওপরের ‘লাজুক’, ‘বড়াই’ শব্দগুলো গঠিত হয়েছে এভাবে : লাজুক= লাজ + উক; বড়াই=বড়+আই; ঘরামি = ঘর+আমি। ‘লাজ’ ‘বড়’ ও ‘ঘর’ শব্দগুলোর পরে যথাক্রমে ‘উক’, ‘আই’ ও ‘আমি’ (প্রত্যয়) যোগ করে নতুন শব্দ গঠিত হয়েছে।

শব্দের সঙ্গে (শেষে) যেসব প্রত্যয় যোগে নতুন শব্দ গঠিত হয়, তাদের তারিখি প্রত্যয় বলা হয়।

মুক্তব্য : ‘লাজ’ ‘বড়’ ও ‘ঘর’— এ শব্দগুলোর সাথে কোনো শব্দ/বিভক্তি যুক্ত হয় নি। বিভক্তিহীন নাম শব্দকে বলা হয় প্রাতিপদিক। প্রাতিপদিক তারিখি প্রত্যয়ের প্রকৃতি বলে প্রাতিপদিককে নাম প্রকৃতিও বলা হয়।

ধাতু যেমন কৃৎ-প্রত্যয়ের প্রকৃতি, তেমনি প্রাতিপদিকও তারিখি প্রত্যয়ের প্রকৃতি। প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতুকে বলা হয় ক্রিয়া প্রকৃতি এবং প্রাতিপদিককে বলা হয় নাম প্রকৃতি।

তারিখি প্রত্যয়গুলো বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাল্লা ভাষায় তারিখি প্রত্যয় তিনি প্রকার।

- ক. বাল্লা তারিখি প্রত্যয়
- খ. বিদেশি তারিখি প্রত্যয়।
- গ. তৎসম বা সংস্কৃত তারিখি প্রত্যয়।

(ক) বাল্লা তারিখি প্রত্যয়

- (ক) অবজার্বে : চোর + আ = চোরা, কেক্টে + আ = কেক্টা।
- (খ) বৃহদার্বে : ডিঙি + আ= ডিঙা (সম্মতিঙ্গা মধুকর)।
- (গ) সদৃশ অর্বে : বাঘ+আ=বাঘা, হাত + আ=হাতা। এরূপ : কাল –কালা (চিকন কালা), কান–কানা।
- (ঘ) ‘তাতে আছে’ বা ‘তার আছে’ অর্বে : জল + আ=জলা, গোদ + আ=গোদা। এরূপ : রোগ –রোগা, চাল– চালা, শুন–শুনা>লোনা।
- (ঙ) সমষ্টি অর্বে : বিশ –বিশা, বাইশ–বাইশা (মাসের বাইশা)> বাইশে।
- (চ) স্বার্থে : জট+আ=জটা, চোখ–চোখা, চাক–চাকা।
- (ছ) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে : হাজির –হাজিরা, চাষ–চাষা।
- (জ) জাত ও আগত অর্বে : মহিষ>ভইস–ভয়সা (ঘি), দধিন–দধিনা> দখনে (হাওয়া)।

২. আই-প্রত্যয়

- (ক) ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে : বড়+আই=বড়াই, চড়া +আই=চড়াই।
- (খ) আদরার্থে : কানু+আই=কানাই, নিম+আই=নিমাই।
- (গ) স্ত্রী বা পুরুষবাচক শব্দের বিপরীত বোঝাতে : বোন+আই= বোনাই, ননদ-নন্দাই, জেঁস-জেঁসাই (মা)।
- (ঘ) সমগুণবাচক বিশেষ্য গঠনে : মিঠা +আই=মিঠাই।
- (ঙ) জাত অর্থে : ঢাকা+আই=ঢাকাই (জামদানি), পাবনা—পাবনাই (শাড়ি)।
- (চ) বিশেষণ গঠনে : চোর-চোরাই (মাল), মোগল-মোগলাই (পরোটা)।

৩. আমি/আম/আমো/মি-প্রত্যয়

- (ক) ভাব অর্থে : ইতর+আমি =ইতরামি, পাগল+আমি = পাগলামি, চোর+আমি =চোরামি,
বাদর+আমি =বাদরামি, ফাজিল +আমো=ফাজলামো।
- (খ) বৃত্তি (জীবিকা) অর্থে : ঠক+আমো=ঠকামো (ঠকের বৃত্তি বা ভাব), ঘর+আমি=ঘরামি।
- (গ) নিষ্পাদন জ্ঞাপন : জেঁসা+আমি=জেঁসামি, ছেলে+আমি=ছেলেমি।

৪. ই/ঈ-প্রত্যয়

- (ক) ভাব অর্থে : বাহাদুর +ই = বাহাদুরি, উমেদার-উমেদারি।
- (খ) বৃত্তি বা ব্যবসায় অর্থে : ডাক্তার-ডাক্তারি, মোক্তার-মোক্তারি, পোদ্দার-পোদ্দারি, ব্যাপার-ব্যাপারি, চাষ-চাষি।
- (গ) মালিক অর্থে : জমিদার-জমিদারি, দোকান-দোকানি।
- (ঘ) জাত, আগত বা সম্বন্ধ বোঝাতে : ভাগলপুর-ভাগলপুরি, মদ্রাজ-মদ্রাজি, রেশম-রেশমি,
সরকার-সরকারি (সম্বন্ধ বাচক)।

৫. ইয়া/এ-প্রত্যয়

- (ক) তৎকালীনতা বোঝাতে : সেকল + এ=সেকেলে, একাল+এ=একেলে, ভাদৱ +ইয়া = ভাদৱিয়া >
তাদুরে (কইমাছ)।
- (খ) উপকরণ বোঝাতে : পাথর –পাথরিয়া > পাথুরে, মাটি –মেটে, বালি- বেলে।
- (গ) উপজীবিকা অর্থে : জাল-জালিয়া >জেলে, মোট-মুটে।
- (ঘ) নৈপুং বোঝাতে : খুন-খুনিয়া > খুনে, দেমাক-দেমাকে, না (নৌকা) – নাইয়া > নেয়ে।
- (ঙ) অব্যয়জাত বিশেষণ গঠনে : টন্টন- টন্টনে (জ্ঞান), কলকন - কলকনে (শীত), গনগন - গনগনে
(আঘুন), চকচক- চকচকে (ভুতা)।

৬. উয়া > ও-প্রত্যয়

- (ক) রোগছস্ত অর্থে : জ্বর+উয়া = জ্বরুয়া>জ্বরো। বাত+উয়া=বাতুয়া> বেতো (ষোড়া)।
- (খ) যুক্ত অর্থে : টাক - টেকো।
- (গ) সেই উপকরণে নির্মিত অর্থে : খড়-খড়ো (খড়োঘর)।
- (ঘ) জাত অর্থে : ধান-ধেনো।
- (ঙ) সংশ্লিষ্ট অর্থে : মাঠ-মেঠো, গী-গীইয়া> গৌয়ো।
- (চ) উপজীবিকা অর্থে : মাছ-মাছুয়া> মেছো।
- (ছ) বিশেষণ গঠনে : দাঁত-দেঁতো (হাসি), হাদ-হেঁদো (কথা), তেল-তেলো> তেলা (মাথা), কুঁজ-কুঁজো (লোক)।

৭. উ-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে : ঢাল + উ = ঢালু, কল+উ=কলু।

৮. উক-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে : লাজ-লাজুক, মিশ-মিশুক, মিথ্যা-মিথ্যুক।

৯. আরি/আরী/আৰু-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে: ভিখ-ভিখারি, শীখ-শীখারি, বোমা-বোমারু।

১০. আগি/আগো/আগি/আগী>এল-প্রত্যয় : বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে: দাঁত-দাঁতাল, লাঠি-লাঠিয়াল> লেঠেল,
তেজ-তেজাল, ধার-ধারাল, শীস-শীসাল, জমক-জমকালো, দুখ-দুখাল> দুখেল, হিম-হিমেল,
চতুর- চতুরালি, ঘটক- ঘটকালি, সিদ-সিদেল, গীজা-গীজেল।

১১. উরিয়া>উড়িয়া/উড়ে/ৱে-প্রত্যয় : হাট-হাটুরিয়া> হাটুরে, সাপ-সাপুড়িয়া>সাপুড়ে, কাঠ-কাঠুরে।

১২. উড়-প্রত্যয় : অর্ধইনভাবে : লেজ-লেজুড়।

১৩. উয়া/ওয়া>ও-প্রত্যয় : সম্পর্কিত অর্থে : ঘর+ওয়া = ঘরোয়া, জল+ উয়া=জলুয়া>জলো (দুধ)।

১৪. আটিয়া / টে-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে : তামা-তামাটিয়া> তামাটে, ঝগড়া-ঝগড়াটে, তাড়া-
তাড়াটে, রোগা-রোগাটে।

১৫. অট>ট-প্রত্যয় : স্বার্থে : ভরা - ভরাট, জমা-জমাট।

১৬. সা-প্রত্যয় : (ক) বিশেষণ গঠনে : মেঘ-মেঘলা

(খ) স্বার্থে : এক-একলা, আধ-আধলা।

(খ) বিদেশি ভাষিত প্রত্যয়

১. ওয়ালা > আলা (হিন্দি) : বাড়ি-বাড়িওয়ালা (মালিক অর্থে), দিল্লি-দিল্লিওয়ালা (অধিবাসী অর্থে),
মাছ-মাছওয়ালা (বৃক্ষ অর্থে), দুধ-দুধওয়ালা (বৃক্ষ অর্থে)।
২. ওয়ান>আন (হিন্দি) : গাড়ি-গাড়োয়ান, দার -দারোয়ান।
৩. আনা>আনি (হিন্দি) : মুনশি-মুনশিয়ানা, বিবি-বিবিআনা, হিন্দু-হিন্দুয়ানি।

৪. সা (হিন্দি) : পানি-পানসা > পানসে, এক-একসা, কাল (কাল)-কালসা > কালসে।
৫. গর> কর (ফারাসি) : কারিগর, বাজিকর, সওদাগর।
৬. দার (ফারাসি) : তাবেদার, খবরদার, বুটিদার, দেনাদার, চৌকিদার, পাহারাদার।
৭. বাজ (দক্ষ অর্থে – ফারাসি) : বলমবাজ, খড়িবাজ, ধোকাবাজ, গলাবাজ+ই=গলাবাজি (বিশেষ্য)।
৮. বন্দি (বন্দ-ফারাসি) : জবানবন্দি, সারিবন্দি, নজরবন্দি, কোমরবন্দ।
৯. সই : মতো অর্থে : জুতসই, মানানসই, চলনসই, টেকসই।
১০. পনা : মতো অর্থে : গিন্নীপনা, বেহায়াপনা।

দ্রষ্টব্য : ‘টিপসই’ ও ‘নামসই’ শব্দ দুটোর ‘সই’ প্রত্যয় নয়। এটি ‘সহি’ (অর্থ-স্বাক্ষর) শব্দ থেকে উৎপন্ন।

(গ) সংস্কৃত তদ্বিত প্রত্যয়

ঝ, ঝি, ঝঁ, ঝিক, ইত, ইমন, ইল, ইষ্ট, ইন, তর, তম, তা, ত্, নীন, নীয়, বতুপ, বিন্দ, র, ঳ প্রভৃতি সংস্কৃত তদ্বিত প্রত্যয়যোগে যে সমস্ত শব্দ গঠিত হয়, সেগুলো বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। এখানে কতগুলো সংস্কৃত তদ্বিত প্রত্যয়ের উদাহরণ দেয়া হলো।

ক়ম্বেক্টি সাধারণ সূত্র

১. যে শব্দের সঙ্গে ঝ (অ)-প্রত্যয় যুক্ত হয়, তার মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়। যথা— নগর+ঝ=নাগর, মধুর +ঝ=মাধুর্য।

- বৃদ্ধি : (১) অ-স্থানে আ, (২) ই, ঈ-স্থানে ঐ, (৩) উ, উ-স্থানে ঔ এবং (৪) ঝ-স্থানে আর হওয়াকে বৃদ্ধি বলে।
২. যে শব্দের সঙ্গে ঝ (অ) প্রত্যয় যুক্ত হয়, তার প্রাতিপদিকের অন্ত্যস্বরের উ-কারও ও-কারে পরিণত হয়। ও+অ সম্মিলিতে ‘অব’ হয়। যথা—গুরু+ঝ=গৌরব, লঘু+ঝ =লাঘব, শিশু +ঝ=শৈশব, মধু +ঝ=মাধব, মনু +ঝ=মানব।
 ৩. দুটি শব্দের দ্বারা গঠিত সমাসবচ্ছ শব্দের অথবা উপসর্গযুক্ত শব্দের সঙ্গে তদ্বিত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে উপসর্গসহ শব্দের বা শব্দ দুটির মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়। যথা—

পরলোক + ফিক = পারলোকিক।

সুভুগ+ঝঁ=সৌভাগ্য।

পঞ্জভূত+ফিক=পাঞ্জভৌতিক।

সর্বভূমি+ঝ=সার্বভৌম।

- ব্যতিক্রম : ‘বৰ্ষ’ শব্দ পরপদ হলে পূর্বপদের সংখ্যাবাচক শব্দের মূল স্বরের বৃদ্ধি হয় না। যথা—বিবৰ্ষ +ফিক= দ্বিবার্ষিক। সংখ্যাবাচক শব্দ না থাকলেও নিয়মমতো মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়। যেমন—বৰ্ষ + ফিক=বার্ষিক।

৪. ‘য’ প্রত্যয় যুক্ত হলে প্রাতিপদিকের অন্তে স্থিত অ, আ, ই এবং ঈ-এর লোগ হয়। যথা— সম+য =সাম্য, কবি+য =কাব্য, মধুর +য =মাধুর্য, প্রাচী+য=প্রাচ্য।

ব্যতিক্রম : সভা+য=সভ্য (‘সাভ্য’ নয়)।

କମ୍ପ୍ୟୁଟଟି ଶାସ୍ତ୍ରିକ ଭାଷିତ ପ୍ରତ୍ୟୋଗ

- #### ১. ইত-প্রত্যয় : উপকরণজাত বিশেষণ গঠনে

କୁସୁମ + ଇତ = କୁସୁମିତ, ତରଙ୍ଗ + ଇତ = ତରଙ୍ଗିତ, କଣ୍ଟକ + ଇତ = କଣ୍ଟକିତ ।

- ## ২. ইমন-প্রত্যয় : বিশেষ গঠনে

ନୀଳ+ଇମନ=ନୀଲିମା । ମହେତ+ଇମନ=ମହିମା ।

- ### ৩. ইল-প্রত্যয় : উপকরণজাত বিশেষণ গঠনে

পজক+ইল=পজিল, উর্মি+ইল=উর্মিল, ফেন+ইল=ফেনিল।

- #### ৪. ইঞ্চি-প্রত্যয় : অভিশায়নে

ଗୁରୁ+ଇଷ୍ଟ=ଗରିଷ୍ଟ , ଲଘୁ+ଇଷ୍ଟ=ଲଘିଷ୍ଟ ।

- #### ৫. ইন্দিরা-প্রত্যয় : সাধারণ বিশেষণ গঠনে

ଗଣ + ଇନ୍ = ଗପିନ୍

সমাসে ইন্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের পরে তৎসম শব্দ থাকলে ইন্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের নৃ লোগ পায়। যেমন – জ্ঞানীগণ, গণিতগণ, সুবিধাগণ, মানিজন ইত্যাদি ।

কর্তৃকারকের এক বচনে ইন্ম প্রত্যয় ঈ রূপ গ্রহণ করে। যেমন—

জ্ঞান+ইন (ই) - জ্ঞানী, গুণ+ ইন(ই) গুণী ইত্যাদি।

স্ত্রী লিঙ্গে ইন প্রত্যয়ান্ত শব্দের পরে ঈ-যুক্ত হয়ে ইনী রূপ প্রহণ করে। যেমন—

জ্ঞান+ইনী- জ্ঞানিনী, গুণ+ইনী = গুণিনী ইত্যাদি।

- ## ୬. ତା ଓ ତୃ-ପ୍ରତ୍ୟୁଷ : ବିଶେଷ ଗଠନ

বন্ধু+ তা = বন্ধুতা, শত্রু+তা = শত্রুতা।

বক্ষু+ত=বক্ষুত, গুরু+ত = গুরুত।

घन+त्=घनत्, गहृ+त् = गहृत् ।

- ## ୧. ଭର୍ମ ଓ ଭମ-ପ୍ରତ୍ୟୁଷ : ଅଭିଶ୍ଳାସଲେ

ମଧୁର-ମଧୁରତର, ମଧୁରତମ । ପ୍ରିୟ-ପ୍ରିୟତର, ପ୍ରିୟତମ ।

৮. নীল (ইন) – প্রত্যয় : তৎসম্মতিক্রিয় অর্থে বিশেষণ গঠনে

সর্বজন+নীল=সর্বজনীন, কুল+নীল =কুলীন, নব+নীল=নবীন।

১. নীয় (অয়) -প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে

জঙ্গ+নীয় = জঙ্গীয়, বায়ু+নীয় = বায়ুবীয়, বর্ষ+নীয় = বর্ষীয়।

বিশেষ নিয়মে : পর-পরকীয়, স্ব-স্বকীয়, রাজা-রাজকীয়।

১০. বতুপ্ (বৎ) এবং মতুপ্ (মৎ)-প্রত্যয় [প্রথমার এক বচনে যথাক্রমে ‘বাল’ এবং ‘মাল’ হয়] : বিশেষণ গঠনে
গুণ+বতুপ্=গুণবাল, দয়া+বতুপ্ = দয়াবাল।

শ্রী+মতুপ্=শ্রীমাল, বৃদ্ধি+মতুপ্=বৃদ্ধিমাল।

১১. বিন (বী) প্রত্যয় : আছে অর্থে বিশেষণ গঠনে

মেধা+বিন्=মেধাবী, মায়া+বিন্ = মায়াবী, তেজৎ+বিন্= তেজস্বী, যশৎ +বিন্=যশস্বী।

১২. রং-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে

মধু+রং=মধুর, মুখ+রং=মুখর।

১৩. শ-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে

শীত +শ = শীতল, বৎস +শ= বৎসল।

১৪. ক্ষ (অ) প্রত্যয়

(ক) অপত্য অর্থে : মনু+ক্ষ =মানব, যদু +ক্ষ=যাদব।

(খ) উপাসক অর্থে : শিব+ ক্ষ= শৈব, জিন+ক্ষ=জৈন। এবৃপ্তি : শঙ্ক্তি-শাঙ্ক্ত, বৃদ্ধি-বৌদ্ধ, বিষ্ণু-বৈষ্ণব।

(গ) ভাব অর্থে : শিশু +ক্ষ = শৈশব, গুরু+ক্ষ =গৌরব, কিশোর+ক্ষ=কৈশোর।

(ঘ) সম্মর্ক বোঝাতে : পৃথিবী+ ক্ষ = পার্থিব, দেব+ক্ষ=দৈব, চিত্র (একটি নক্ষত্রের নাম)+ ক্ষ=চৈত্র।

নিপাতনে সিদ্ধ : সূর্য+ক্ষ=সৌর (সাধারণ নিয়মে সূর+ক্ষ (অ)=সৌর)।

১৫. ক্ষ্য (ঘ) প্রত্যয়

(ক) অপত্যার্থে : মনুৎ +ক্ষ্য=মনুষ্য, জমদগ্নি+ক্ষ্য=জামদগ্ন্য।

(খ) ভাবার্থে : সুন্দর+ক্ষ্য=সৌন্দর্য, শুরু+ক্ষ্য=শৌর্য। ধীর+ক্ষ্য=ধৈর্য, কুমার +ক্ষ্য =কৌমার্য।

(গ) বিশেষণ গঠনে : পর্বত +ক্ষ্য = পার্বতা, বেদ+ক্ষ্য =বৈদ্য।

১৬. ক্ষি (ই)-প্রত্যয় : অপত্য অর্থে

রাবণ+ক্ষি=রাবণি (রাবণের পুত্র), দশরথ+ক্ষি=দাশরথি।

১৭. ক্ষিক (ইক)-প্রত্যয়

(ক) দক্ষ বা বেতা অর্থে : সাহিত্য +ক্ষিক=সাহিত্যিক, বেদ+ক্ষিক=বৈদিক, বিজ্ঞান+ক্ষিক=বৈজ্ঞানিক।

(খ) বিষয়ক অর্থে : সমুদ্র+ক্ষিক=সামুদ্রিক, নগর-নাগরিক, মাস -মাসিক, ধর্ম-ধার্মিক, সমর -সামরিক, সমাজ-সামাজিক।

(গ) বিশেষণ গঠনে : হেমন্ত +ক্ষিক=হেমন্তিক, অক্ষয়+ক্ষিক=আক্ষিক।

১৮. ক্ষেয় (এয়)-প্রত্যয়

ভগিনী+ক্ষেয়=ভাগিনীয়, অগ্নি+ক্ষেয়=আগ্নেয়, বিমাত্ (বিমাতা) +ক্ষেয়=বৈমাত্রেয়।

অনুশীলনী

১। তদ্বিত প্রত্যয় বলতে কী বোঝ? তদ্বিত প্রত্যয়কে শব্দ প্রত্যয় বলা যায় কি? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

২। প্রাতিপদিককে নাম প্রকৃতি বলা হয় কেন?

৩। নিম্নলিখিত খাটি বাংলা তদ্বিতান্ত শব্দসমূহে কী অর্থে কোন কোন প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে, তা পাশাপাশি লিখে দাও।

হাজিরা	-	জলা	-	মিঠাই	-	গেজুড়	-	চামচা	-
দরকারি	-	টেকো	-	মিথুক	-	ঘরোয়া	-	ঢাকাই	-

৪। দুটি করে উদাহরণ দাও।

(ক) যও (অ) প্রত্যয় যুক্ত হলে প্রকৃতির (প্রাতিপদিকের) স্বরের বৃদ্ধি হয়।

(খ) যও প্রত্যয় যুক্ত হলে মূলস্বরের বৃদ্ধি ছাড়াও প্রাতিপদিকের অন্ত্যস্বর উ-কার থাকলে তা ও-কার হয়।

(গ) তদ্বিতান্ত শব্দের প্রকৃতি দুটি শব্দে গঠিত হলে অথবা শব্দটি উপসর্গযুক্ত থাকলে উভয় ক্ষেত্রেই (উপসর্গসহ) মূলস্বরের বৃদ্ধি হয়।

৫. প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর।

কাব্য, ভাগিনৈয়, বৈজ্ঞানিক, বায়বীয়, সর্বজনীন, সুধী, কুসুমিত, ফেনিল, শীতল, মধুর, কুলীন, পার্বত্য, বৌদ্ধ, সূর্য, পৌরুষ, মেধাবী।

৬. ঠিক উত্তরাচিতে ঠিক (✓) চিহ্ন দাও

ক. প্রাতিপদিক বলা হয়— বিভক্তিযুক্ত পদকে / সমস্যমান পদকে/ বিভক্তিহীন পদকে।

খ. বাংলা ভাষায় তদ্বিত প্রত্যয় — দুই প্রকার / তিন প্রকার / চার প্রকার

গ. ওয়ালা (দুখওয়ালা) — বাংলা / বিদেশি / তৎসম তদ্বিত প্রত্যয়

ঘ. উড় (লেজুড়) — বাংলা / বিদেশি / তৎসম তদ্বিত প্রত্যয়

ঙ. ইত (কুসুমিত) বাংলা / বিদেশি / তৎসম তদ্বিত প্রত্যয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দের শ্রেণিবিভাগ হতে পারে।

১. গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ : (ক) মৌলিক ও (খ) সাধিত
২. অর্ধমূলক শ্রেণিবিভাগ : (ক) যৌগিক, (খ) ঝুঁটি এবং (গ) যোগরূঢ়
৩. উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ : (ক) তৎসম, (খ) অর্ধ-তৎসম (গ) তন্ত্ব (ঘ) দেশি ও (ঙ) বিদেশি।

১. গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ ক. মৌলিক শব্দ : যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না বা ডেঙে আলাদা করা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। যেমন – গোলাপ, নাক, লাল, তিনি।

খ. সাধিত শব্দ : যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করা হলে আলাদা অর্ধবোধক শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে। সাধারণত একাধিক শব্দের সমাস হয়ে কিংবা প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগ হয়ে সাধিত শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। উদাহরণ : চাঁদমুখ (চাঁদের মতো মুখ), নীলাকাশ (নীল যে আকাশ), ডুরুরি (ডুব+উরি), চলন্ত (চল + অন্ত), প্রশাসন (প্র+শাসন), গরমিল (গর+মিল) ইত্যাদি।

২. অর্ধমূলক শ্রেণিবিভাগ

অর্থগতভাবে শব্দসমূহ তিনি ভাগে বিভক্ত। যথা-

ক. যৌগিক শব্দ

খ. ঝুঁটি বা ঝুঁটি শব্দ

গ. যোগরূঢ় শব্দ

ক. যৌগিক শব্দ : যে সকল শব্দের বৃংপস্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই রকম, সেগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন-

গায়ক = গৈ + ক (অক) - অর্থ : গান করে যে।

কর্তব্য = কৃ + তব্য - অর্থ : যা করা উচিত।

বাবুয়ানা = বাবু + আনা - অর্থ : বাবুর ভাব।

মধুর = মধু + র - অর্থ : মধুর মতো মিঞ্চি গুণযুক্ত।

দৌহিত্র = দুহিতা+ষ্ট্রি - অর্থ : কন্যার পুত্র, নাতি।

চিকামারা = চিকা+মারা - অর্থ : দেওয়ালের লিখন।

খ. ঝুঁটি শব্দ : যে শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে, তাকে ঝুঁটি শব্দ বলে। যেমন—হস্তী=হস্ত + ইন, অর্ধ-হস্ত আছে যাই; কিন্তু হস্তী বলতে একটি পশুকে বোঝায়। গবেষণা (গো+এষণা) অর্থ— গুরু খোঁজা। বর্তমান অর্থ ব্যাপক অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা।

এ রকম-

ঁাশি - বাঁশ দিয়ে তৈরি যে কোনো বস্তু নয়, শব্দটি সুরের বিশেষ বাদ্যযন্ত্র, বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়।

তৈল - শুধু তিলজাত মেহ পদার্থ নয়, শব্দটি যে কোনো উচ্চিজ্জ পদার্থজাত মেহ পদার্থকে বোঝায়। যেমন-
বাদাম-তেল।

প্রৰীণ - শব্দটির অর্থ হওয়া উচিত ছিল প্রকৃষ্ট রূপে বীণা বাজাতে পারেন যিনি। কিন্তু শব্দটি ‘অভিজ্ঞতাসম্মত
বয়স্ক ব্যক্তি’ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

সন্দেশ - শব্দ ও প্রত্যয়গত অর্থে ‘সংবাদ’। কিন্তু রূটি অর্থে ‘মিষ্টান্ত বিশেষ’।

গ. যোগরূচি শব্দ : সমাস নিষ্কান্ত যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো
বিশিষ্ট অর্থ প্রাপ্ত করে, তাদের যোগরূচি শব্দ বলে। যেমন-

পঞ্জেজ - পঞ্জেজ জন্মে যা (উপগদ তৎপুরুষ সমাস)। শৈবাল, শালুক, পঞ্চযুক্ত প্রত্তি নানাবিধি উচ্চিদ পঞ্জেজ জন্মে
থাকে। কিন্তু ‘পঞ্জেজ’ শব্দটি একমাত্র ‘পঞ্চযুক্ত’ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তাই পঞ্জেজ একটি যোগরূচি শব্দ।

রাজপুত - ‘রাজার পুত্র’ অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূচি শব্দ হিসেবে অর্থ হয়েছে ‘জাতিবিশেষ’।

মহাযাত্রা - মহাসমারোহে যাত্রা অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূচি শব্দরূপে অর্থ ‘মৃত্যু’।

জলধি - ‘জল ধারণ করে এমন’ অর্থ পরিত্যাগ করে একমাত্র ‘সমুদ্র’ অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

৩. **উৎসমূলক শ্ৰেণিবিভাগ :** বাংলা ভাষা অধ্যায়ে বাংলা ভাষার শব্দভাড়ার পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিশদ
আলোচনা করা হয়েছে।

অনুশীলনী

১। গঠন অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহ কয় ভাগে বিভক্ত হতে পারে। বিভাগগুলোর নাম লেখ।

২। অর্থগতভাবে বা অর্থের বিচার-বিশ্লেষণে বাংলা ভাষার শব্দসমূহ কয় ভাগে বিভক্ত হতে পারে, উদাহরণসহ
উল্লেখ কর।

৩। নিম্নলিখিত শব্দসমূহ রূটি, যোগরূচি ও যৌগিক—এই তিনিটি গুচ্ছে প্রদত্ত ছক অনুসারে সাজাও।

তাগিনেয়, জলধি, রাজপুত, রাজপুত্র, ঁাশি, তেল, সন্দেশ।

রূটি	যোগরূচি	যৌগিক শব্দ

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলোর ব্যৃৎপত্তিগত এবং ব্যবহারিক অর্থ লেখ।

ক) সন্দেশ খ) হরিণ গ) প্রৰীণ ঘ) মহাযাত্রা

৫। নিচের শব্দগুলো কোনটি কোন শ্ৰেণিতে পড়ে দেখ।

নীলিমা, এক, জনৈক, হাত, ছেলেধৰা, সাপ, আসমান-জমিন, বেহায়াপনা, সাপুড়িয়া, হাত-পা,
লাঙ্কুক, সাখাদিক, পাগলামি, বাড়িওয়ালা, চা বাগান।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পদ-প্রকরণ

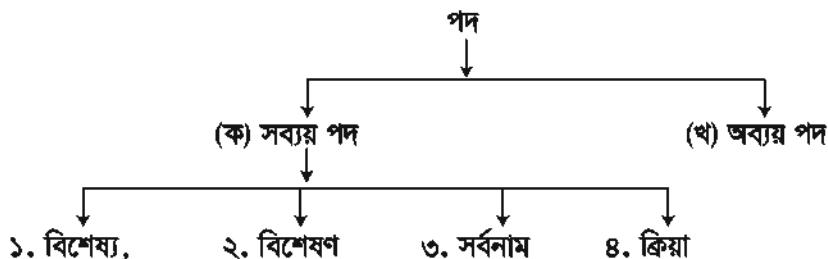
দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা মানুষের চিরন্তন কল্পনার রাজ্য টাঁদের দেশে পৌছেছেন এবং মঙ্গলগ্রহেও যাওয়ার জন্য তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন।

ওপরের বাক্যটিতে ‘রা’ (অভিযাত্রী + রা), ‘এর’ (মানুষ + এর), ‘র’ (কল্পনা + র), ‘এ’ (মঙ্গলগ্রহ + এ) প্রত্তি চিহ্নগুলোকে বিভক্তি বলা হয়।

বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিগুলি শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে।

পদগুলো প্রধানত দুই প্রকার : সব্যয় পদ ও অব্যয় পদ।

সব্যয় পদ চার প্রকার : ১. বিশেষ্য ২. বিশেষণ ৩. সর্বনাম ৪. ক্রিয়া। সুতরাং পদ মোট পাঁচ প্রকার : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া এবং অব্যয়।



আলোচ্য বাক্যটিতে

- | | |
|---------------|---|
| ১. বিশেষ্য পদ | : অভিযাত্রী, মানুষ, কল্পনা, রাজ্য, দেশ, মঙ্গলগ্রহ |
| ২. বিশেষণ পদ | : দুঃসাহসী, চিরন্তন, প্রস্তুত |
| ৩. সর্বনাম পদ | : তাঁরা |
| ৪. ক্রিয়াপদ | : পৌছেছেন, হচ্ছেন, যাওয়ার (অসমাপিকা ক্রিয়া) |
| ৫. অব্যয় পদ | : এবং, জন্য |

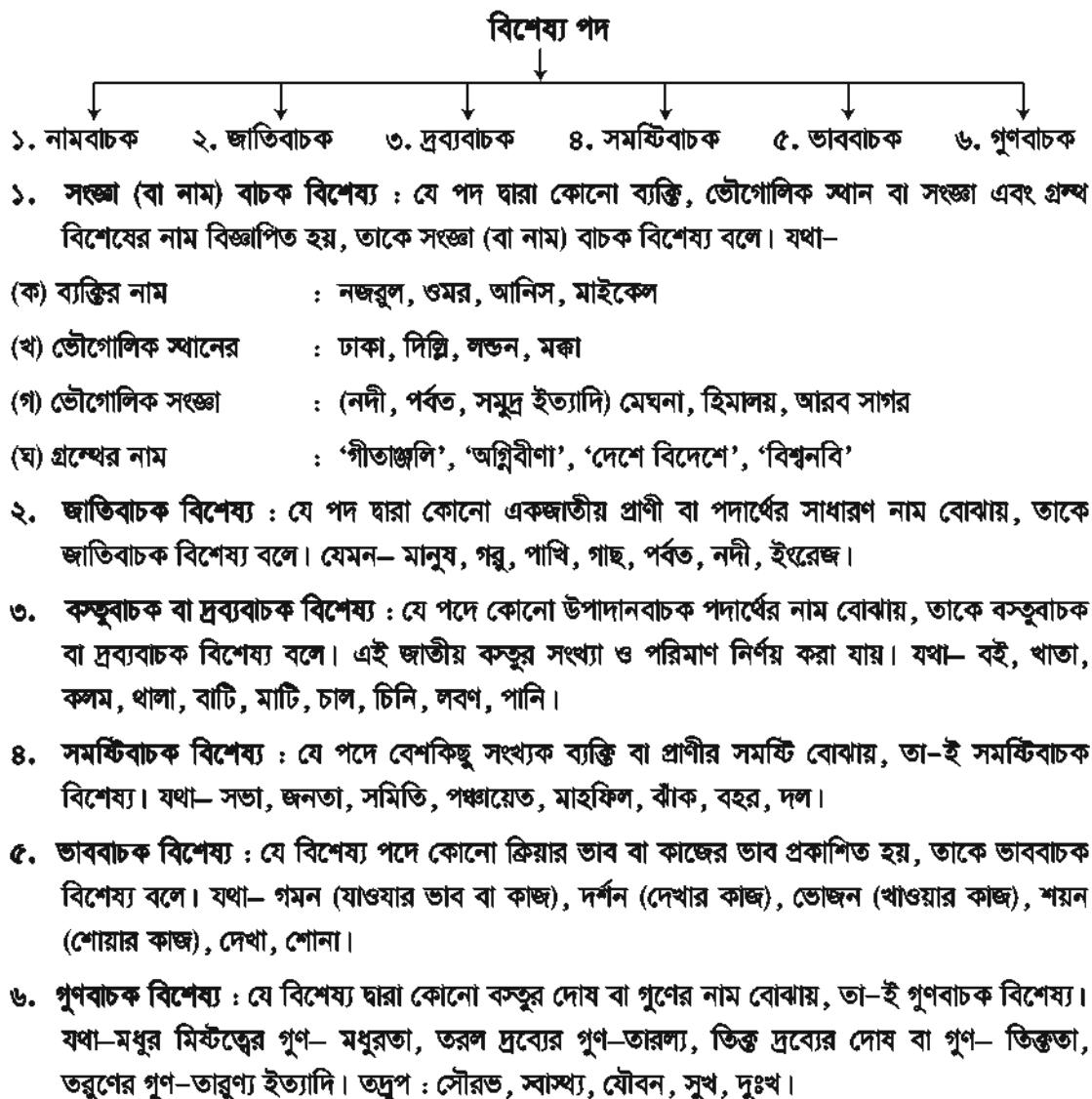
বিশেষ্য পদ

কোনো কিছুর নামকে বিশেষ্য পদ বলে।

বাক্যমধ্যে ব্যবহৃত যে সমস্ত পদ দারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝানো হয় তাদের বিশেষ্য পদ বলে।

বিশেষ পদ ছয় প্রকার

১. সংজ্ঞা (বা নাম) বাচক বিশেষ্য (Proper Noun)
২. জাতিবাচক বিশেষ্য (Common Noun)
৩. কস্তু (বা দ্রব্য) বাচক বিশেষ্য (Material Noun)
৪. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (Collective Noun)
৫. ভাববাচক বিশেষ্য (Verbal Noun)
৬. গুণবাচক বিশেষ্য (Abstract Noun)



বিশেষণ পদ

বিশেষণ : যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে।

চলন্ত গাঢ়ি : বিশেষ্যের বিশেষণ।

কর্মান্বয় তুমি : সর্বনামের বিশেষণ।

দ্রুত চল : ক্রিয়া বিশেষণ।

বিশেষণ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা—১. নাম বিশেষণ ও ২. ভাব বিশেষণ।

১. নাম বিশেষণ : যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে, তাকে নাম বিশেষণ বলে। যথা—

বিশেষ্যের বিশেষণ : সুস্থি সবল দেহকে কে না ভালোবাসে?

সর্বনামের বিশেষণ : সে ঝুগবান ও গুপবান।

নাম বিশেষণের প্রকারভেদ

ক. ঝুগবাচক : নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, কালো মেঘ।

খ. গুণবাচক : চৌকস লোক, দক্ষ কারিগর, ঠাঙ্কা হাওয়া।

গ. অবস্থাবাচক : তাজা মাছ, রোগী ছেলে, খৌড়া পা।

ঘ. সংখ্যাবাচক : হাজার লোক, দশ দশা, শ টাকা।

ঙ. ক্রমবাচক : দশম শ্রেণি, সপ্তম পৃষ্ঠা, প্রথমা কল্যা।

চ. পরিমাণবাচক : বিঘাটকে জমি, পাঁচ শতাংশ ভূমি, হাজার টনী জাহাজ, এক কেজি চাল, দু কিলোমিটার রাস্তা।

ছ. অংশবাচক : অর্ধেক সম্পত্তি, যোল আনা দখল, সিকি পথ।

জ. উপাদানবাচক : বেলে মাটি, মেটে কলসি, পাথুরে মূর্তি।

ঝ. প্রশ্নবাচক : কতদুর পথ? কেমন অবস্থা?

ঝঃ. নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক : এই লোক, সেই ছেলে, ছাবিষ্পে মার্চ।

বিশিষ্টভাবে বিশেষণ গঠনের পদ্ধতি

ক. ক্রিয়াজ্ঞাত : হারানো সম্পত্তি, খাবার পানি, অনাগত দিন।

খ. অব্যয়জ্ঞাত : আচ্ছা মানুষ, উপরি পাওনা, হঠাতে বড়গোক।

গ. সর্বনাম জ্ঞাত : কবেকার কথা, কোথাকার কে, স্বীয় সম্পত্তি।

ঘ. সমাসসিদ্ধ : বেকার, নিয়ম-বিবুদ্ধ, জ্ঞানহারা, চৌচালা ঘর।

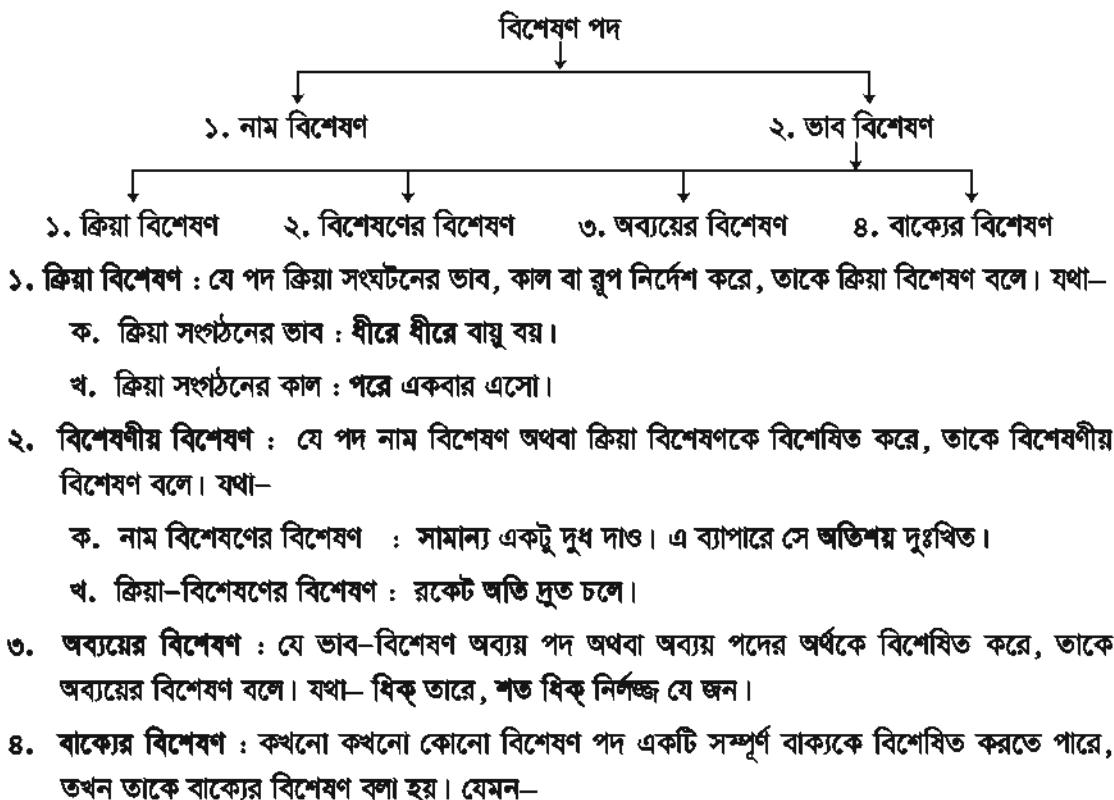
ঙ. বীক্ষামূলক : হাসিহাসি মুখ, কাঁদকাঁদ চেহারা, ডুবডুবু নৌকা।

চ. অনুকার অব্যয়জ্ঞাত : কলকনে শীত, শনশনে হাওয়া, ধিকিধিকি আগুন, টস্টসে ফল, তকতকে মেঝে।

- ছ. কৃদন্ত : কৃতী সন্তান, জানাশোনা লোক, পায়ে-চলা পথ, হৃত সম্পত্তি, অতীত কাল।
 জ. তথিতাত্ত্ব : জাতীয় সম্পদ, নৈতিক বল, মেঠো পথ।
 ঝ. উপসর্গস্থুল্য : নির্খুত কাজ, অগভূত সম্পদ, নির্জলা মিথ্যে।
 ঞ. বিদেশি : নাস্তানাবুদ অবস্থা, লাওয়ারিশ মাল, লাখেরাজ সম্পত্তি, দরপতনি তালুক।

২. ভাব বিশেষণ : যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে তা-ই ভাব বিশেষণ।

ভাব বিশেষণ চার প্রকার : ১. ক্রিয়া বিশেষণ ২. বিশেষণের বিশেষণ বা বিশেষণীয় বিশেষণ ৩. অব্যয়ের বিশেষণ ৪. বাক্যের বিশেষণ।



দুর্ভাগ্যজন্মে দেশ আবার নানা সমস্যাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বাস্তবিকই আজ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন।

বিশেষণের অতিশায়ন

বিশেষণ পদ যখন দুই বা ততোধিক বিশেষ্য পদের মধ্যে গুণ, অবস্থা, পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে তুলনায় একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিয়ে থাকে, তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে। যেমন— যমুনা একটি দীর্ঘ নদী, পদ্মা দীর্ঘতর, কিন্তু মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী। সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে তুলনায় সূর্য বৃহত্তর, পৃথিবী চন্দ্রের চেয়ে বৃহত্তর এবং চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

ক. বাংলা শব্দের অতিশায়ন

১. বাংলা শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে চাইতে, চেয়ে, হইতে, হতে, অপেক্ষা, থেকে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। এসব ক্ষেত্রে দুয়ের মধ্যে তারতম্য বোঝাতে প্রথম বিশেষজ্ঞ প্রায়ই ঘটী বিভক্তিযুক্ত হয়ে থাকে এবং মূল বিশেষণের পর কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না। যথা—

গুরুর থেকে ঘোড়ার দাম বেশি।

বাঘের চেয়ে সিংহ বলবান।

২. বহুর মধ্যে অতিশায়ন : অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝাতে মূল বিশেষণের কোনো পরিবর্তন হয় না। মূল বিশেষণের পূর্বে সবচাইতে, সবচেয়ে, সব থেকে, সর্বাপেক্ষা, সর্বাধিক প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার হয়। যথা—

নবম শ্রেণির ছাত্রদের মধ্যে করিম সবচেয়ে বৃদ্ধিমান। ভাইদের মধ্যে বিমলই সবচাইতে বিচক্ষণ। পশুর মধ্যে সিংহ সর্বাপেক্ষা বলবান।

৩. দুটি বস্তুর মধ্যে অতিশায়নে জোর দিতে হলে মূল বিশেষণের আগে অনেক, অধিক, বেশি, অল্প, কম, অধিকতর প্রভৃতি বিশেষণীয় বিশেষণ যোগ করতে হয়। যথা—

পদ্মফুল গোলাপের চাইতে অনেক সুন্দর। ঘিরের চেয়ে দুধ বেশি উপকারী। কমলার চাইতে পাতিলেবু অল্প ছেট।

৪. কখনো কখনো ঘটী বিভক্তিযুক্ত শব্দে ঘটী বিভক্তিই চেয়ে, থেকে প্রভৃতি শব্দের কার্যসাধন করে। যেমন— এ মাটি সোনার বাড়া।

খ. তৎসম শব্দের অতিশায়ন

১. তৎসম শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে ‘তর’ এবং বহুর মধ্যে ‘তম’ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন— গুরু—গুরুতর—গুরুতম। দীর্ঘ—দীর্ঘতর—দীর্ঘতম।

কিন্তু ‘তর’ প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণটি শুভিকাটু হলে ‘তর’ প্রত্যয় যোগ না করে বিশেষণের পূর্বে ‘অধিকতর’ শব্দটি যোগ করতে হয়। যেমন— অশু হস্তী অপেক্ষা অধিকতর সুশ্রী।

২. বহুর মধ্যে অতিশায়নে তুলনায় বস্তুর উল্লেখ না করেও ‘তম’ প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে। যেমন— মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী। দেশসেবার মহাত্ম ব্রতই সৈনিকের দীক্ষা।

৩. তৎসম শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে তুলনায় ‘ঈয়স্’ প্রত্যয় এবং বহুর মধ্যে তুলনায় ‘ইঠ’ প্রত্যয় যুক্ত হয়। বাংলায় সাধারণত ‘ঈয়স্’ প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলো ব্যবহৃত হয় না। যেমন—

মূল বিশেষণ	দুয়ের তুলনায়	বহুর তুলনায়
লঘু	লাদিয়ান	লাদিষ্ট
অল্প	কলীয়ান	কলিষ্ট
বৃদ্ধ	জ্যায়ান	জ্যেষ্ট
শ্রেষ্ঠ	শ্রেয়ান	শ্রেষ্ট।

উদাহরণ : তিনি ভাইয়ের মধ্যে রাহিমই জ্যেষ্ঠ এবং করিম কনিষ্ঠ। সংখ্যাগুলোর সমিটি সাধারণ গুণিতক বের কর।

৪. ‘ঈয়স’ প্রত্যয়ান্ত কোনো কোনো শব্দের ছালিঙ্গ রূপ বাংলায় প্রচলিত আছে। যেমন— ভূয়সী প্রশংসা।

একই পদের বিশেষ ও বিশেষণ রূপে প্রয়োগ

বাংলা ভাষায় একই পদ বিশেষ ও বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন—

ভালো	: বিশেষণ রূপে	-	ভালো বাড়ি পাওয়া কঠিন।
	বিশেষ্য রূপে	-	আপন ভালো সবাই চায়।
মন্দ	: বিশেষণ রূপে	-	মন্দ কথা বলতে নেই।
	বিশেষ্য রূপে	-	এখানে কী মন্দটা তুমি দেখলে ?
পুণ্য	: বিশেষণ রূপে	-	তোমার এ পুণ্য প্রচেষ্টা সফল হোক।
	বিশেষ্য রূপে	-	পুণ্যে মতি হোক।
নিশ্চীথ	: বিশেষণ রূপে	-	নিশ্চীথ রাতে বাজছে ঝাঁশি।
	বিশেষ্য রূপে	-	গভীর নিশ্চীথে প্রকৃতি সৃষ্টি।
শীত	: বিশেষণ রূপে	-	শীতকালে কুয়াশা পড়ে।
	বিশেষ্য রূপে	-	শীতের সকালে চারদিক কুয়াশায় অম্বকার।
সত্য	: বিশেষণ রূপে	-	সত্য পথে থেকে সত্য কথা বল।
	বিশেষ্য রূপে	-	এ এক বিরাট সত্য।

সর্বনাম পদ

বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে।

সর্বনাম সাধারণত ইতোপূর্বে ব্যবহৃত বিশেষ্যের প্রতিনিধি স্থানীয় শব্দ। যেমন— হস্তী প্রাণিজগতের সর্ববৃহৎ প্রাণী। তাই শরীরটি যেন বিরাট এক মাংসের স্তূপ।

দ্বিতীয় বাক্যে ‘তার’ শব্দটি প্রথম বাক্যের ‘হস্তী’ বিশেষ্য পদটির প্রতিনিধি স্থানীয় শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই, ‘তার’ শব্দটি সর্বনাম পদ। বিশেষ্য পদ অনুকূল থাকলেও ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ্য পদের পরিবর্তে সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন—

ক. যারা দেশের ডাকে সাড়া দিতে পারে, তারাই তো সত্যিকারের দেশপ্রেমিক।

খ. ধান ভানতে যারা শিবের গীত গায়, তারা স্থির লক্ষ্যে পৌছতে পারে না।

সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ

বাঙ্গা ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনামসমূহকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

- (১) ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক : আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তাহারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা, ও, ওরা ইত্যাদি।
- (২) আত্মবাচক : স্বয়ং, নিজে, খোদ, আপনি।
- (৩) সামীপ্যবাচক : এ, এই, এরা, ইহারা, ইনি ইত্যাদি।
- (৪) দূরত্ববাচক : এই, এসব।
- (৫) সাকুল্যবাচক : সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ।
- (৬) প্রশ্নবাচক : কে, কি, কৌন, কাহার, কার, কিসে?
- (৭) অনিদিষ্টতাঞ্জপক : কোন, কেহ, কেউ, কিছু।
- (৮) ব্যতিহারিক : আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপসে, পরস্পর ইত্যাদি।
- (৯) সংযোগজ্ঞপক : যে, যিনি, যাঁরা, যারা, যাহারা ইত্যাদি।
- (১০) অন্যাদিবাচক : অন্য, অপর, পর ইত্যাদি।

সর্বনাম পদ

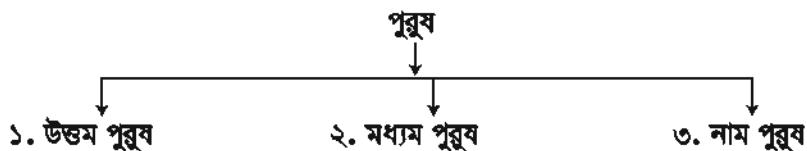
- | | |
|--------------------|-----------------|
| ১. ব্যক্তিবাচক | ২. আত্মবাচক |
| ৩. সামীপ্যবাচক | ৪. দূরত্ববাচক |
| ৫. সাকুল্যবাচক | ৬. প্রশ্নবাচক |
| ৭. অনিদিষ্টতাঞ্জপক | ৮. ব্যতিহারিক |
| ৯. সংযোগজ্ঞপক | ১০. অন্যাদিবাচক |

সর্বনামের পুরুষ

‘পুরুষ’ একটি পারিভাষিক শব্দ। বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়ারই পুরুষ আছে। বিশেষণ ও অব্যয়ের পুরুষ নেই। ব্যাকরণে পুরুষ তিনি প্রকার।

১. উভয় পুরুষ : স্বয়ং বক্তাই উভয় পুরুষ। আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের ইত্যাদি সর্বনাম শব্দ উভয় পুরুষ।
২. মধ্যম পুরুষ : প্রত্যক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা শ্রেতাই মধ্যম পুরুষ। তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদের, তোমাদিগকে, আপনি, আপনারা, আপনার, আপনাদের প্রতৃতি সর্বনাম শব্দ মধ্যম পুরুষ।

৩. নাম পুরুষ : অনুপস্থিত অধিবা পরোক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, কস্তু বা প্রাণীই নাম পুরুষ। সে, তারা, তাহারা, তাদের, তাহাকে, তিনি, তাঁকে, তাঁরা, তাঁদের প্রতৃতি নাম পুরুষ। (সমস্ত বিশেষ শব্দই নাম পুরুষ)।



ব্যক্তিবাচক সর্বনামের রূপ

পুরুষত্ত্বে ব্যক্তিবাচক সর্বনামগুলোর রূপ

রূপ	উচ্চম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	নাম পুরুষ
সাধারণ	আমি, আমরা, আমাকে, আমাদিগকে, আমার, আমাদের; কবিতায় : যোর, মোরা	তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদিগকে, তোমার, তোমাদের	সে, তারা, তাহারা, তাকে, তাহাকে
সন্ত্রমাত্রক		আপনি, আপনারা, আপনাকে, আপনার, আপনাদের	তিনি, তাঁরা, তাঁহারা, তাঁদের, তাঁহাদের, তাঁহাদিগকে, তাঁদেরকে, তাঁহাকে, তাঁকে, ইনি, এর, এঁরা, ইহাদের, এঁদের, ইহাকে, এঁকে, উনি, উঁর, উঁরা, উঁদের
তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠতা-জ্ঞাপক			ইহা, ইহারা, এই, এ, এরা, উহা, উহারা, ও, উরা, উদের

সর্বনামের বিভিন্নগারী রূপ : বাংলা সর্বনামসমূহ কর্তৃকারক শিল্প অন্যান্য কারককে বিভিন্নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। সর্বনামের এ রূপটিকে বিভিন্নগারী রূপ বলা হয়।

কর্তৃকারকে সর্বনামের মূল রূপটিই ব্যবহৃত হয় এবং একে প্রথমা বিভিন্নিযুক্ত একবচন ধরা হয়।

	কর্তৃকারকে প্রথমা একবচন		অন্যান্য কারককে বিভিন্নগারী রূপ	
সাধারণ	সন্ত্রমাত্রক	তুচ্ছার্থক	সন্ত্রমাত্রক	তুচ্ছার্থক
আমি				
তুমি	আপনি	তুই	আপনা	তোমা, তো
সে	তিনি		তাহা, তা	তাহা, তা
যে	যিনি		যাহা, যা	যাহা, যা
	ইনি	এ	ইহা, এ	ইহা, এ
	উনি	উহা	উহা, ও	উহা, ও
কে, কি, কী		কে, কি, কী		কাহা, কা

জ্ঞাতব্য

১. চলিত ভাষায়—

- (ক) তুচ্ছার্থে তাহা স্থানে তা, যাহা স্থানে যা, কাহা স্থানে কা, ইহা স্থানে এ, উহা স্থানে ও আদেশ হয়।
- (খ) সন্ত্রমার্থে এগুলোর সাথে একটি চন্দ্ৰকিন্দু সংযোজিত হয়। যথা— তাহা + দের = তাহাদের (সাধু) > তাদের (চলিত)। (সন্ত্রমার্থে) তাহা + দের = তাহাদের (সাধু) > তাদের (চলিত)।
২. করণ কারকে অনুসর্গ ব্যবহারের পূর্বে মূল সর্বনাম শব্দের সঙ্গে র, এর বা কে বিভক্তি যোগ করে নিতে হয়। যেমন— তাহাকে দিয়া, তাকে দিয়ে, তাহার দ্বারা, তার দ্বারা, আমাকে দিয়ে।
৩. যষ্ঠী বিভক্তি অর্থে ঈয়-প্রত্যয়যুক্ত সর্বনামজাত বিশেষণ শুধু তৎসম সর্বনামের ক্ষেত্ৰেই ব্যবহৃত হয়। যথা :
 মৎ+ ঈয় = মদীয়, ভৎ+ ঈয় = ভবদীয়, তৎ+ ঈয় = তদীয়।
৪. ‘কী’ সর্বনামটি কোনো কোনো কারকে ‘কিসে’ বা (যষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত হয়ে) ‘কীসের’ রূপ প্রহণ করে। যথা :
 কী + দ্বারা = কীসের দ্বারা, কী + থেকে = কীসে থেকে, কীসের থেকে।

সর্বনামের বিশিষ্ট প্রয়োগ

১. বিনয় প্রকাশে উভয় পুরুষের একবচনে দীন, অধম, বাস্দা, সেবক, দাস প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা—
 ‘আজ্জা কর দাসে, শাস্তি নয়াথমে’। ‘দীনের আরজ’।
২. ছন্দবদ্ধ কবিতায় সাধারণত ‘আমার’ স্থানে মম, ‘আমাদের’ স্থানে মোদের এবং ‘আমরা’ স্থানে মোরা
 ব্যবহৃত হয়। যেমন — ‘কে ঝুঁকিবে ব্যথা মম’। ‘মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি! বাঙ্গা ভাষা’।
 ‘কৃত্তু শিশু মোরা, করি তোমারি কৃদন্তা’।
৩. উপাস্যের প্রতি সাধারণত ‘আপনি’ স্থানে তুমি প্রযুক্ত হয়। যেমন— (উপাস্যের প্রতি ভক্ত) ‘প্রভু, তুমি রক্ষা
 কর এ দীন সেবকে।’
৪. অভিন্নদনপত্র রচনায়ও অনেক সময় সম্মানিত ব্যক্তিকে ‘তুমি’ সম্মোধন করা হয়।
৫. তুমি : ঘনিষ্ঠজন, আপনজন বা সমবয়স্ক সাথীদের প্রতি ব্যবহার্য।
 তুই : তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়, ঘনিষ্ঠতা বোঝাতেও আমরা তাই ব্যবহার করি।

অব্যয় পদ

ন ব্যয় = অব্যয়। যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ যা অপরিবর্তনীয় শব্দ তাই অব্যয়। অব্যয় শব্দের সাথে
 কোনো বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় না, সেগুলোর একবচন বা বহুবচন হয় না এবং সেগুলোর স্ত্রী ও পুরুষবাচকতা
 নির্ণয় করা যায় না।

যে পদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থেকে কখনো বাক্যের শোভা বর্ধন করে, কখনো একাধিক পদের, বাক্যাংশের বা
 বাক্যের সংযোগ বা বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটায়, তাকে অব্যয় পদ বলে।

বাঙ্গা ভাষায় তিন প্রকার অব্যয় শব্দ রয়েছে— বাঙ্গা অব্যয় শব্দ, তৎসম অব্যয় শব্দ এবং বিদেশি অব্যয় শব্দ।

১. বাংলা অব্যয় শব্দ : আৱ, আবাৱ, ও, ইঁয়া, না ইত্যাদি।
২. তৎসম অব্যয় শব্দ : যদি, যথা, সদা, সহসা, হঠাৎ, অৰ্থাৎ, দৈবাং, বৱৎ, পুনশ্চ, আপাতত, বস্তুত ইত্যাদি। ‘এবৎ’ ও ‘সুতৰাং’ তৎসম শব্দ হলেও বাঙালি এগুলোৱ অৰ্থ পৰিবৰ্তিত হয়েছে। সংস্কৃতে ‘এবৎ’ শব্দেৱ অৰ্থ এমন, আৱ ‘সুতৰাং’ অৰ্থ অত্যন্ত, অবশ্য। কিন্তু এবৎ = ও (বাংলা), সুতৰাং = অতএব (বাংলা)।

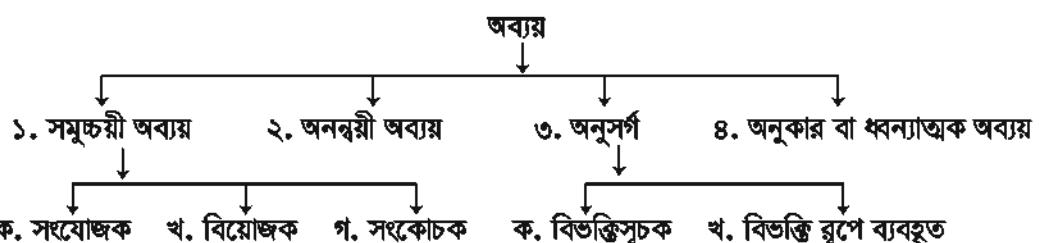
৩. বিদেশি অব্যয় শব্দ : আলবত, বহুত, খুব, শাবাশ, খাসা, মাইরি, মারহাবা ইত্যাদি।

বিবিধ উপায়ে গঠিত অব্যয় শব্দ

১. একাধিক অব্যয় শব্দযোগে : কদাপি, নতুবা, অতএব, অথবা ইত্যাদি।
২. আনন্দ বা দুঃখ প্ৰকাশক একই শব্দেৱ দুইবাৱ প্ৰয়োগে : ছি ছি, ধিক্ ধিক্, বেশ বেশ ইত্যাদি।
৩. দুটি ভিন্ন শব্দযোগে : মোটকথা, হয়তো, যেহেতু, নইলে ইত্যাদি।
৪. অনুকাৱ শব্দযোগে : কুহু কুহু, গুন গুন, ঘেউ ঘেউ, শন শন, ছল ছল, কল কল ইত্যাদি।

অব্যয়েৱ প্ৰকাৱতদে

অব্যয় প্ৰধানত চাৱ প্ৰকাৱ : ১. সমুচ্ছয়ী, ২. অনন্বয়ী, ৩. অনুসৰ্গ, ৪. অনুকাৱ বা ধৰন্যাত্মক অব্যয়।



১. সমুচ্ছয়ী অব্যয় : যে অব্যয় পদ একটি বাক্যেৱ সঙ্গে অন্য একটি বাক্যেৱ অথবা বাক্যস্থিত একটি পদেৱ সঙ্গে অন্য একটি পদেৱ সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়, তাকে সমুচ্ছয়ী অব্যয় বা সম্বন্ধবাচক অব্যয় বলে।

ক. সংযোজক অব্যয়

- (i) উচ্চপদ ও সামাজিক মৰ্যাদা সকলেই চায়। এখানে ‘ও’ অব্যয়টি বাক্যস্থিত দুটি পদেৱ সংযোজন কৰছে।
- (ii) তিনি সৎ, তাই সকলেই তাকে শ্ৰদ্ধা কৰে। এখানে ‘তাই’ অব্যয়টি দুটি বাক্যেৱ সংযোজন ঘটাচ্ছে। আৱ, অধিবক্তু, সুতৰাং শব্দগুলোও সংযোজক অব্যয়।

খ. বিয়োজক অব্যয়

- (i) হাসেম কিংবা কাসেম এৱ জন্য দায়ী।

এখানে ‘কিংবা’ অব্যয়টি দুটি পদেৱ (হাসেম এৱ কাসেমেৱ) বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটাচ্ছে।

- (ii) ‘মন্ত্ৰেৱ সাধন কিংবা শ্ৰীৱ পাতন’। এখানে ‘কিংবা’ অব্যয়টি দুটি বাক্যাংশেৱ বিয়োজক।

আমৱা চেষ্টা কৱেছি বটে, কিন্তু কৃতকাৰ্য হতে পাৱিনি। এখানে ‘কিন্তু’ অব্যয় দুটি বাক্যেৱ বিয়োজক।

বা, অথবা, নতুবা, না হয়, নয়তো শব্দগুলো বিয়োজক অব্যয়।

গ. সংকোচক অব্যয় : তিনি বিদ্বান, অথচ সৎ ব্যক্তি নন। এখানে ‘অথচ’ অব্যয়টি দুটি বাক্যের মধ্যে ভাবের সংকোচ সাধন করেছে। কিন্তু, বরং শব্দগুলোও সংকোচক অব্যয়।

ঘ. অনুগামী সমৃচ্ছয়ী অব্যয় : যে, যদি, যদিও, যেন প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ সংযোজক অব্যয়ের কাজ করে থাকে। তাই তাদের অনুগামী সমৃচ্ছয়ী অব্যয় বলে। যেমন-

১. তিনি এত পরিশ্রম করেন যে তার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা আছে।

২. আজ যদি (শর্ত বাচক) পারি, একবার সেখানে যাব।

৩. এভাবে চেষ্টা করবে যেন কৃতকার্য হতে পার।

২. অনন্ধয়ী অব্যয় : যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না রেখে স্বাধীনভাবে নানাবিধি ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়, তাদের অনন্ধয়ী অব্যয় বলে। যেমন-

ক. উচ্ছ্঵াস প্রকাশে : মরি মরি! কী সুন্দর প্রভাতের রূপ!

খ. স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে : হ্যাঁ, আমি যাব। না, আমি যাব না।

গ. সম্মতি প্রকাশে : আমি আজ আলবত যাব। নিষ্ঠয়ই পারব।

ঘ. অনুমোদনবাচকতায় : আপনি যখন বলছেন, বেশ তো আমি যাব।

ঙ. সমর্থনসূচক জবাবে : আপনি যা জানেন তা তো ঠিকই বটে।

চ. যত্নণা প্রকাশে : উঃ! পায়ে বড় লেগেছে। নাঃ! এ কষ্ট অসহ্য।

ছ. ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশে : ছি ছি, তুমি এত নীচ!
কী আপদ! লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।

জ. সম্মোধনে : ‘ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।’

ঝ. সন্ত্বাবনায় : ‘সংশয়ে সংকল্প সদা টলে
পাছে গোকে কিছু বলে।’

এও. বাক্যালংকার অব্যয় : কয়েকটি অব্যয় শব্দ নির্বর্থকভাবে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের শোভাবর্ধন করে, এদের বাক্যালংকার অব্যয় বলে। যেমন-

১. কত না হারানো স্ফূর্তি জাগে আজও মনে।

২. ‘হায়রে ভাগ্য, হায়রে লজ্জা, কোথায় সতা, কোথায় সজ্জা।’

৩. অনুসর্গ অব্যয় : যে সকল অব্যয় শব্দ বিশেষ ও সর্বনাম পদের বিভক্তির ন্যায় বসে কারকবাচকতা প্রকাশ করে, তাদের অনুসর্গ অব্যয় বলে। যথা— ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না। (দিয়ে অনুসর্গ অব্যয়)।

অনুসর্গ অব্যয় ‘পদান্ধয়ী অব্যয়’ নামেও পরিচিত।

অনুসর্গ অব্যয় দুই প্রকার : ক. বিভক্তিসূচক অব্যয় এবং খ. বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত অনুসর্গ।

৪. অনুকার অব্যয় : যে সকল অব্যয় অব্যক্ত রব, শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয়, সেগুলোকে অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে। যথা-

বন্ধের ধ্বনি- কড় কড়	মেঘের গর্জন - গুড় গুড়
বৃষ্টির তুমুল শব্দ - বাম বাম	সিংহের গর্জন - গর গর
স্নোতের ধ্বনি - কল কল	ঘোড়ার ডাক - চিহি চিহি
বাতাসের গতি - শন শন	কাকের ডাক- কা কা
শুষক পাতার শব্দ - মর মর	কোকিলের রব - কুহু কুহু
নুপুরের আওয়াজ - ঝুম ঝুম	চুড়ির শব্দ - টুঁ টাঁ

অনুভূতিমূলক অব্যয়ও অনুকার অব্যয়ের প্রেগিভুন্ট। যথা-

ঝীঁ ঝীঁ (প্রথরতাবাচক), ঝীঁ ঝীঁ (শূন্যতাবাচক), কচ কচ, কট কট, টল মল, ঝল মল, চক চক, ছম ছম, টল টল, খট খট ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট

ক. অব্যয় বিশেষণ : কতগুলো অব্যয় বাকেয়ে ব্যবহৃত হলে নাম-বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ এবং বিশেষণীয় বিশেষণের অর্থবাচকতা প্রকাশ করে থাকে। এদের অব্যয় বিশেষণ বলা হয়। যথা-

নাম-বিশেষণ : অতি ভস্তি ঢোরের সঙ্কণ।

ভাব-বিশেষণ : আবার যেতে হবে।

ক্রিয়া-বিশেষণ : অন্যত্র চলে যায়।

খ. নিত্য সম্মতীয় অব্যয় : কতগুলো যুগ্মশব্দ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, সেগুলো নিত্য সম্মতীয় অব্যয় রূপে পরিচিত। যেমন : যথা-তথা, যত-তত, যখন-তখন, যেমন-তেমন, যেরূপ-সেরূপ ইত্যাদি। উদাহরণ-যথা ধর্ম তথা জয়। যত গর্জে তত বর্ষে না।

গ. ত (সম্মৃত তস) প্রত্যয়ান্ত অব্যয় : এরকম তৎসম অব্যয় বাঙ্গায় ব্যবহৃত হয়। যথা - ধর্মত বলছি। দুর্ভাগ্যবশত পরীক্ষায় ফেল করেছি। অন্তত তোমার যাওয়া উচিত। জ্ঞানত মিথ্যা বলিনি।

একই অব্যয় শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার

১. আর - পুনরাবৃত্তি অর্থে : ও দিকে আর যাব না।
- নির্দেশ অর্থে : বল, আর কী চাও?
- নিরাশায় : সে দিন কি আর আসবে?
- বাক্যালংকারে : আর কি বাজবে বাঁশি?

২. ও - সংযোগ অর্থে	:	করিম ও রাহিম দুই ভাই।
সম্ভাবনায়	:	আজ বৃক্ষ হতেও পারে।
তুলনায়	:	ওকে বলাও যা, না বলাও তা।
স্বীকৃতি জ্ঞাপনে	:	খেতে যাবে? গেলেও হয়।
হতাশা জ্ঞাপনে	:	এত চেষ্টাতেও হলো না।
৩. কি/কী-জিজ্ঞাসায়	:	‘তুমি কি বাড়ি যাচ্ছ?
বিরাস্তি প্রকাশে	:	কী বিপদ, লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।
সাকুল্য অর্থে	:	কি আমীর কি ফরিদ, একদিন সকলকেই যেতে হবে।
বিড়ম্বনা প্রকাশে	:	তোমাকে নিয়ে কী মুশকিলেই না পড়লাম।
৪. না-নিষেধ অর্থে	:	এখন যেও না।
বিকল্প প্রকাশে	:	তিনি যাবেন, না হয় আমি যাব।
আদর প্রকাশে বা অনুরোধে	:	আর একটি মিষ্টি খাও না খোকা। আর একটা গান গাও না।
সম্ভাবনায়	:	তিনি না কি ঢাকায় যাবেন।
বিষয়ে	:	কী করেই না দিন কাটাচ্ছ!
তুলনায়	:	ছেলে তো না, যেন একটা হিটলার।
৫. যেন - উপমায়	:	মুখ যেন পদ্ধফুল।
প্রার্থনায়	:	খোদা যেন তোমার মঙ্গল করেন।
তুলনায়	:	ইস্, ঠাঙ্ডা যেন বরফ।
অনুমানে	:	লোকটা যেন আমার পরিচিত মনে হলো।
সতর্কীকরণে	:	সাবধানে চল, যেন পা পিছলে না পড়।
ব্যঙ্গ প্রকাশে	:	ছেলে তো নয় যেন ননীর পুতুল।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেকটি প্রশ্নের চারটি উভয়ের মধ্যে সর্বোত্তম উভয়টির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

(i) পদ কয় প্রকার?

ক. চার

গ. ছয়

খ. পাঁচ

ঘ. সাত

- (ii) বিশেষ্য পদ কয় প্রকার ?
 ক. তিন
 খ. চার
 গ. পাঁচ
 ঘ. ছয়

(iii) ভাববিশেষণ কয় প্রকার ?
 ক. দুই
 খ. তিন
 গ. চার
 ঘ. পাঁচ

(iv) সর্বনাম পদ কয় প্রকার ?
 ক. দশ
 খ. নয়
 গ. আট
 ঘ. সাত

(v) অব্যয় পদ কয় প্রকার ?
 ক. তিন
 খ. চার
 গ. পাঁচ
 ঘ. ছয়

(vi) কোনটি সংযোগজ্ঞাপক সর্বনাম ?
 ক. যারা-তারা
 খ. তোরা
 গ. এরা
 ঘ. করা

(vii) কোন বাক্যে বিশেষণের বিশেষণ রয়েছে ?
 ক. ধীরে চল
 খ. সে গুণবান
 গ. ঘোড়া খুব দ্রুত চলে
 ঘ. মেটে কলসি

(viii) কোনটি ভাববাচক বিশেষ্য ?
 ক. ভোজন
 খ. সৌরভ
 গ. চিনি
 ঘ. জনতা

(ix) কোনটিতে বস্তুবাচক বিশেষ্য রয়েছে ?
 ক. সবুজ মাঠ
 খ. তাজা মাছ
 গ. বেলে মাটি
 ঘ. অর্ধেক পথ

(x) কোন বাক্যের মোটা অক্ষরটি অনন্ধয়ী অব্যয় ?
 ক. তাকে দিয়ে এ কাজ হবে না।
 খ. বৃক্ষ পড়ে ঝমকাম।
 গ. তুমি ভালো ছাত্র তাই তোমাকে সবাই ভালোবাসে।
 ঘ. উঃ বজ্জ লেগেছে।

- ২। পদ বলতে কী বোঝা? পদ প্রধানত কয় ভাগে বিভক্ত হতে পারে?
- ৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলোতে যে সমস্ত বিশেষ্য পদ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো প্রকারভেদ অনুসারে সাজাও।
 - ক. নজরুল বাংলাদেশের চিরস্মরণীয় কবি।
 - খ. তাঁর কাব্য প্রতিভা জাতিকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেছে।
 - গ. ‘ঠোকাঠুকি লেগে গেল বরগাকড়িতে।’
 - ঘ. ‘জীবন, যৌবন, বল সকলই ঘূচায় কাল, আয়ু যেন পদ্ধপত্রে নীর।’
- ৪। নাম বিশেষণকে আমরা কয় ভাগে ভাগ করতে পারি? প্রত্যেকটি ভাগের উদাহরণ দাও।
- ৫। নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক, প্রশ্নবাচক, নাম বিশেষণের উদাহরণ দাও।
- ৬। ক্রিয়া, অব্যয় ও সর্বনামজ্ঞাত বিশেষণ পদের উদাহরণ দাও এবং বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।
- ৭। ‘বিশেষণের অতিশায়ন’ বলতে কী বোঝা? খাঁটি বাংলা বিশেষণ শব্দের অতিশায়নের বিষয়সমূহ বিশদ আলোচনা কর।
- ৮। বাক্যগঠনে অতিশায়নের ভূল থাকলে শুন্দ কর।
মেঘনা বাংলাদেশের অধিকতম দীর্ঘতর নদী। হস্তী অশ্ব অপেক্ষা বলবত্তর। সভায় তার ভূয়াসন প্রশংসা হয়েছিল। ভাইদের মধ্যে মুমিনই সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণতম।
- ৯। কোন কোন ক্ষেত্রে সর্বনামের সম্মতাক রূপটি ব্যবহৃত হয়? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।
- ১০। ‘তুই’ ও ‘তুমি’ সর্বনামের ব্যবহারবিধি লেখ।
- ১১। সরচিত বাক্যে উদাহরণ দাও।
সংকোচন অব্যয়, সম্ভাবনা ও সম্মতি প্রকাশে অনন্বয়ী অব্যয়, অনুভূতিগ্রাহ্য অনুকার অব্যয়।
- ১২। বিভিন্ন অর্থে ‘ও’ এবং ‘না’ অব্যয়ের ব্যবহার দেখাও।
- ১৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলোর বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয় পদ রূপে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।
ধনী, সাধু, কাল, মধু, সুন্দর, গোলাপ, পুণ্য
- ১৪। বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।
ভাববাচক, বিশেষ্য, বিশেষণ, রূপবাচক বিশেষণ, দূরত্ত্বাপক সর্বনাম, অব্যয়, নিত্যসম্বন্ধীয় অব্যয়, সমুচ্চয়ী অব্যয়।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚେଦ

କ୍ରିୟାପଦ

୧. କବିର ବହି ପଡ଼ିଛେ ।

୨. ତୋମରା ଆଗାମୀ ବହର ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ।

‘ପଡ଼ିଛେ’ ଏବଂ ‘ଦେବେ’ ପଦ ଦୁଟୀ ଦୀର୍ଘ କୋଣୋ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରା ବୋବାଛେ ବଲେ ଏରା କ୍ରିୟାପଦ ।

ଯେ ପଦେର ଦୀର୍ଘ କୋଣୋ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରା ବୋବାଯେ, ତାକେ କ୍ରିୟାପଦ ବଲେ ।

ବାକ୍ୟେର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେ ପଦ ଦୀର୍ଘ କୋଣୋ ପୁରୁଷ କର୍ତ୍ତ୍ଵ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳେ କୋଣୋ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଘଟନ ବୋବାଯେ, ତାକେ କ୍ରିୟାପଦ ବଲେ । ଓପରେର ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣେ ନାମ ପୁରୁଷ ‘କବିର’ କର୍ତ୍ତ୍ଵ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳେ ‘ପଡ଼ା’ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଘଟନ ପ୍ରକାଶ କରଇଛେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣେ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ, ‘ତୋମରା’ ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ରିୟା ସଂଘଟନେର ସଞ୍ଚାବନା ପ୍ରକାଶ କରଇଛେ ।

କ୍ରିୟାପଦେର ଗଠନ : କ୍ରିୟାମୂଳ ବା ଧାତୁର ସଙ୍ଗେ ପୁରୁଷ ଅନୁଯାୟୀ କାଳସୂଚକ କ୍ରିୟାବିଭକ୍ତି ଯୋଗ କରେ କ୍ରିୟାପଦ ଗଠନ କରଇତେ ହେଲା । ଯେମନ-

‘ପଡ଼ିଛେ’ – ପଡ଼, ‘ଧାତୁ’ + ‘ଛେ’ ବିଭିନ୍ନ ।

ଅନୁକ୍ତ କ୍ରିୟାପଦ : କ୍ରିୟାପଦ ବାକ୍ୟଗଠନେର ଅପରିହାର୍ୟ ଅଞ୍ଜା । କ୍ରିୟାପଦ ଭିନ୍ନ କୋଣୋ ମନୋଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରା ଯାଇ ନା । ତବେ କଥନୋ କଥନୋ ବାକ୍ୟ କ୍ରିୟାପଦ ଉହ୍ୟ ବା ଅନୁକ୍ତ ଥାକିତେ ପାରେ । ଯେମନ-

ଇନି ଆମାର ଭାଇ = ଇନି ଆମାର ଭାଇ (ହେ) ।

ଆଜ ପ୍ରଚନ୍ଦ ଗରମ = ଆଜ ପ୍ରଚନ୍ଦ ଗରମ (ଅନୁକ୍ତ ହଛେ) ।

ତୋମାର ମା କେମନ ? = ତୋମାର ମା କେମନ (ଆହେନ) ?

ବାକ୍ୟେ ସାଧାରଣତ ହ୍ୟ ଏବଂ ‘ଆହ୍’ ଧାତୁ ଗଠିତ କ୍ରିୟାପଦ ଉହ୍ୟ ଥାକେ ।

କ୍ରିୟାର ପ୍ରକାରଭେଦ

ବିବିଧ ଅର୍ଥେ କ୍ରିୟାପଦକେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗେ ଭାଗ କରା ହେଯେ ଥାକେ ।

୧. ଭାବ ପ୍ରକାଶେର ଦିକ୍ ଦିଯେ କ୍ରିୟାପଦକେ ଦୁଇ ଭାଗେ ଭାଗ କରା ଯାଇ-କ ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଏବଂ ଥ. ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ।

କ. ସମାପିକା କ୍ରିୟା : ଯେ କ୍ରିୟାପଦ ଦୀର୍ଘ ବାକ୍ୟେର (ମନୋଭାବେର) ପରିସମାପ୍ତି ଘଟାପିତ ହେ, ତାକେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବଲେ । ଯେମନ – ହେଲେରୀ ଖେଳା କରଇଛେ । ଏ ବହର ବନ୍ୟାଯ ଫସଲେର କ୍ଷତି ହେଲେଇଛେ ।

ଥ. ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା : ଯେ କ୍ରିୟା ଦୀର୍ଘ ବାକ୍ୟେର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ ନା, ବକ୍ତାର କଥା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥେକେ ଯାଇ, ତାକେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ବଲେ । ଯେମନ-

୧. ପ୍ରଭାତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଲେ

୨. ଆମରା ହାତ-ମୁଖ ଧୂମେ

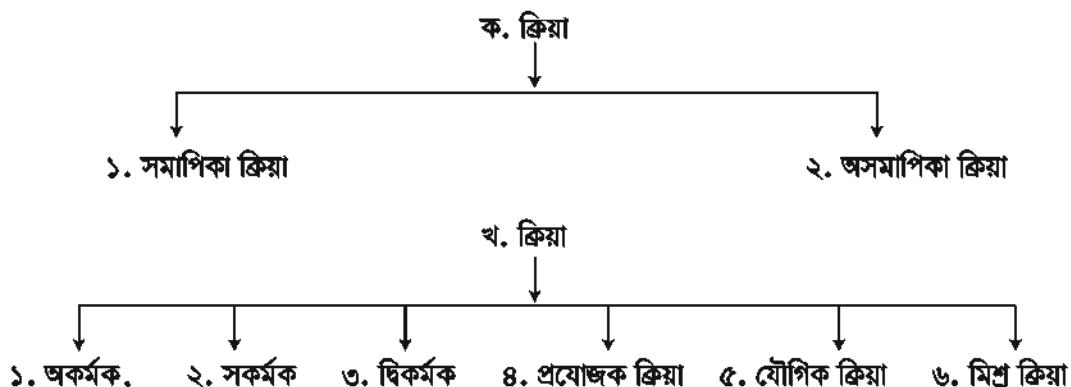
৩. আমরা বিকেলে খেলতে
.....

এখানে, ‘উঠলে’ ‘ধূয়ে’ এবং ‘খেলতে’ ক্রিয়াপদগুলোর দ্বারা কথা শেষ হয়নি; কথা সম্পূর্ণ হতে আরও শব্দের প্রয়োজন। তাই এ শব্দগুলো অসমাপিকা ক্রিয়া।

উপর্যুক্ত বাক্যগুলো পূর্ণ মনোভাব জ্ঞাপন করলে দাঢ়াবে-

১. প্রভাতে সূর্য উঠলে অন্ধকার দূর হয়।
২. আমরা হাত মুখ ধূয়ে পড়তে বসলাম।
৩. আমরা বিকেলে খেলতে যাই।

পূর্ণজ্ঞ বাক্য গঠন করতে হলে সমাপিকা ক্রিয়া অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। সাধারণত ইয়া (পড়িয়া), ইলে (পড়িলে), ইতে (পড়িতে), এ (পড়ে), লে (পড়লে), তে (পড়তে) বিভিন্ন্যুক্ত ক্রিয়াপদ অসমাপিকা ক্রিয়া।



২. সর্কর্মক ক্রিয়া ও অসর্কর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার কর্মপদ আছে তা-ই সর্কর্মক ক্রিয়া। ক্রিয়ার সাথে কী বা কাকে প্রশ্ন করলে যে উভর পাওয়া যায়, তা-ই ক্রিয়ার কর্মপদ। কর্মপদযুক্ত ক্রিয়াই সর্কর্মক ক্রিয়া। যেমন-বাবা আমাকে একটি কলম কিনে দিয়েছেন।

প্রশ্ন : কী দিয়েছেন ?

উত্তর : কলম (কর্মপদ)।

প্রশ্ন : কাকে দিয়েছেন ?

উত্তর : আমাকে (কর্মপদ)।

‘দিয়েছেন’ ক্রিয়াপদটির কর্ম পদ থাকায় এটি সর্কর্মক ক্রিয়া।

যে ক্রিয়ার কর্ম নেই, তা অসর্কর্মক ক্রিয়া। যেমন-মেয়েটি হাসে। ‘কী হাসে’ বা ‘কাকে হাসে’ প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর হয় না। কাজেই ‘হাসে’ ক্রিয়াটি অসর্কর্মক ক্রিয়া।

দ্বিকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার দুটি কর্মপদ থাকে, তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে।

দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্মপদটিকে মুখ্য বা প্রধান কর্ম এবং ব্যক্তিবাচক কর্মপদটিকে গৌণ কর্ম বলে। বাবা আমাকে একটি কলম কিনে দিয়েছেন বাকে ‘কলম’ (বস্তু) মুখ্যকর্ম এবং ‘আমাকে’ (ব্যক্তি) গৌণ কর্ম।

সমধাতুজ কর্ম : বাক্যের ক্রিয়া ও কর্মপদ একই ধাতু থেকে গঠিত হলে ঐ কর্মপদকে সমধাতুজ কর্ম বা ফর্মা-১৫, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ-৯ম-১০ম প্রশ্ন।

ধাতৃর্থক কর্মপদ বলে। যেমন— আর কত খেলা খেলবে। মূল ‘খেল’ ধাতু থেকে ক্রিয়াপদ ‘খেলবে’ এবং কর্মপদ ‘খেলা’ উভয়ই গঠিত হয়েছে। তাই ‘খেলা’ পদটি সমধাতুজ বা ধাতৃর্থক কর্ম।

সমধাতুজ কর্মপদ অকর্মক ক্রিয়াকে সকর্মক করে। যেমন—

এমন সুখের মরণ কে মরতে পারে?

বেশ এক ঘূম ঘুমিয়েছি।

আর মায়াকান্না কেঁদো না গো বাপু।

সকর্মক ক্রিয়ার অকর্মক রূপ : প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য সকর্মক ক্রিয়া ও অকর্মক হতে পারে। যেমন—

অকর্মক	সকর্মক
আমি চোখে দেখি না।	আকাশে চাঁদ দেখি না।
ছেলেটা কানে শোনে না।	ছেলেটা কথা শোনে।
আমি রাতে খাব না।	আমি রাতে ভাত খাব না।
অন্ধকারে আমার খুব ভয় করে।	বাবাকে আমার খুব ভয় করে।

৩. প্রযোজক ক্রিয়া : যে ক্রিয়া একজনের প্রযোজনা বা চালনায় অন্য কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। (সংস্কৃত ব্যাকরণে একে গিজন্ত ক্রিয়া বলা হয়)

প্রযোজক ক্রিয়া : যে ক্রিয়া প্রযোজনা করে, তাকে প্রযোজক কর্তা বলে।

প্রযোজ্য কর্তা : যাকে দিয়ে ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয়, তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। যেমন—

প্রযোজক কর্তা	প্রযোজ্য কর্তা	প্রযোজক ক্রিয়া
মা	শিশুকে	চাঁদ দেখাচ্ছেন।
(তুমি)	খোকাকে	কাঁদিও না।
সাপড়ে	সাপ	খেলায়।

জ্ঞাতব্য : প্রযোজক ক্রিয়া রূপে ব্যবহৃত হলে অকর্মক প্রযোজক ক্রিয়া সকর্মক হয়।

প্রযোজক ক্রিয়ার গঠন : প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতু = মূল ক্রিয়ার ধাতু + আ। যেমন মূল ধাতু $\sqrt{\text{হাস}}$ + আ = হাসা (প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতু)। হাসা + চেন বিভক্তি = হাসাচ্ছেন (প্রযোজক ক্রিয়া)।

৪. নামধাতু ও নামধাতুর ক্রিয়া : বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ধ্বনাত্মক অব্যয়ের পরে ‘আ’ প্রত্যয়যোগে যেসব ধাতু গঠিত হয়, সেগুলোকে নামধাতু বলা হয়। নামধাতুর সঙ্গে পুরুষ বা কালসূচক ক্রিয়া-বিভক্তি যোগে নামধাতুর ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন—

ক. বাঁকা (বিশেষণ) + আ (প্রত্যয়) = বাঁকা (নামধাতু)। যথা—

কঞ্চিটি বাঁকিয়ে ধর (নামধাতুর ক্রিয়াপদ)।

খ. ধ্বনাত্মক অব্যয় : কন কন – দাঁতটি ব্যথায় কনকনাচ্ছে। ফোঁস – অজগরটি ফোঁসাচ্ছে।

আ-প্রত্যয় যুক্ত না হয়েও কয়েকটি নামধাতু বাংলা ভাষায় মৌলিক ধাতুর মতো ব্যবহৃত হয়। যেমন-

ফল- বাগানে বেশ কিছু লিছু ফলেছে।

টক - তরকারি বাসি হলে টকে।

ছাপা- আমার কল্পু বইটা ছেপেছে।

৫। ঘোষিক ক্রিয়া : একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে একটি বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থে প্রকাশ করে, তবে তাকে ঘোষিক ক্রিয়া বলে। যেমন-

ক. তাগিদ দেওয়া অর্থে : ঘটনাটা শুনে রাখ।

খ. নির্বাচন অর্থে : তিনি বলতে শাগলেন।

গ. কার্যসম্পত্তি অর্থে : ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়ল।

ঘ. আকর্ষিকতা অর্থে : সাইরেন বেজে উঠল।

ঙ. অভ্যন্তরতা অর্থে : শিক্ষায় মন সংস্কারযুক্ত হয়ে থাকে।

চ. অনুমোদন অর্থে : এখন যেতে পার।

৬। মিশ্র ক্রিয়া : বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বনাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর, হ, দে, পা, যা, কাট, গা, ছাড়, ধর, মার, প্রভৃতি ধাতুযোগে গঠিত ক্রিয়াপদ বিশেষ বিশেষ অর্থে মিশ্র ক্রিয়া গঠন করে। যেমন-

ক. বিশেষ্যের উভয় (পরে) : আমরা তাজমহল দর্শন করলাম। এখন গোল্দায় যাও।

খ. বিশেষণের উভয় (পরে) : তোমাকে দেখে বিশেষ প্রীত হলাম।

গ. ধ্বনাত্মক অব্যয়ের উভয় (পরে) : মাথা বিম বিম করছে। বাম বাম করে বৃক্তি পড়ছে।

ক্রিয়ার ভাব (Mood)

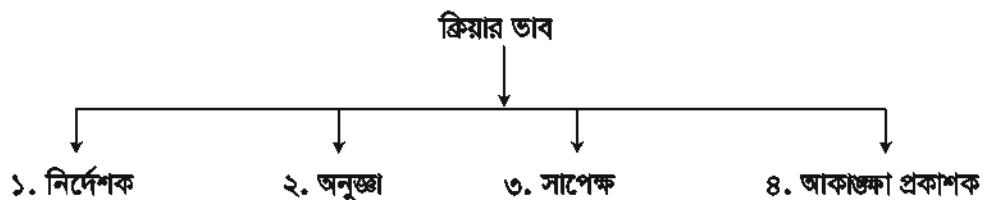
১. সূর্য অস্ত যাচ্ছে।
২. এখন বাঢ়ি যাও।
৩. সে পড়লে পাশ করত।
৪. তোমার কল্যাণ হোক।

ওপরের বাক্যগুলোতে ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার বিভিন্ন রীতি প্রকাশ পেয়েছে।

ক্রিয়ার যে অবস্থার দ্বারা তা ঘটার ধরন বা রীতি প্রকাশ পায়, তাকে ক্রিয়ার ভাব বা প্রকার বলে।

ক্রিয়ার ভাব বা ধরন চার প্রকার

১. নির্দেশক ভাব (Indicative Mood)
২. অনুজ্ঞা ভাব (Imperative Mood)
৩. সাপেক্ষ ভাব (Subjunctive Mood)
৪. আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাব (Optative Mood)



୧. ନିର୍ଦେଶକ ଭାବ : ସାଧାରଣ ସଟନା ନିର୍ଦେଶ କରଲେ ବା କିଛୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେ କ୍ରିୟାପଦେର ନିର୍ଦେଶକ ଭାବ ହୁଏ ।
ଯଥା—

କ. ସାଧାରଣ ନିର୍ଦେଶକ : ଆମରା ବହି ପଡ଼ି । ତାରା ବାଡ଼ି ଯାବେ ।

ଖ. ପ୍ରଶ୍ନ ଜିଜ୍ଞାସାଯ : ଆପଣି କି ଆସବେନ ? ମେ କି ଗିଯେଛିଲ ?

୨. ଅନୁଜ୍ଞା ଭାବ : ଆଦେଶ, ନିମେଥ, ଉପଦେଶ, ଅନୁରୋଧ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ସୂଚିତ ହୁଳେ କ୍ରିୟାପଦେର ଅନୁଜ୍ଞା ଭାବ ହୁଏ । ଯେମନ—

କ. ଆଦେଶାତ୍ମକ : ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳେ — ଚୁପ କର ।

: ଭବିଷ୍ୟତ କାଳେ — ଭୂମି କାଳ ଯେଓ ।

ଖ. ନିମେଥାତ୍ମକ : ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳେ — ଅନ୍ୟାୟ କାଜ କରୋ ନା ।

: ଭବିଷ୍ୟତ କାଳେ — ମିଥ୍ୟା ବଲବେ ନା ।

ଗ. ଅନୁରୋଧସୂଚକ : ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳେ — ଛାତାଟା ଦିନ ତୋ ଭାଇ ।

: ଭବିଷ୍ୟତ କାଳେ — ଆପନାରା ଆସବେନ ।

ଘ. ଉପଦେଶାତ୍ମକ : ବର୍ତ୍ତମାନେ କାଳେ — ମନ ଦିଯେ ପଡ଼ ।

: ଭବିଷ୍ୟତ କାଳେ — ଯାଦ୍ୟେର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରେଖୋ ।

୩. ସାଙ୍କେକ ଭାବ : ଏକଟି କ୍ରିୟାର ସଂଘଟନ ଅନ୍ୟ ଏକଟି କ୍ରିୟାର ଓପର ନିର୍ଭର କରଲେ, ନିର୍ଭରଶୀଳ କ୍ରିୟାକେ ସାଙ୍କେକ ଭାବେର କ୍ରିୟା ବଲା ହୁଏ । ଯେମନ—

କ. ସମ୍ଭବନାୟ : ତିନି ଫିରେ ଏହେ ସବକିଛୁର ମୀମାଂସା ହବେ । ଯଦି ମେ ପଡ଼ୁତ ତବେ ପାଶ କରତ ।

ଖ. ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ବୋଝାତେ : ଭାଲୋ କରେ ପଡ଼ିଲେ ସଫଳ ହବେ ।

ଗ. ଇଚ୍ଛା ବା କାମନାୟ : ଆଜ ବାବା ବୈଚେ ଥାକଲେ ଆମାର ଏତ କଷ୍ଟ ହତୋ ନା ।

୪. ଆକାଙ୍କ୍ଷା ପ୍ରକାଶକ ଭାବ : ଯେ କ୍ରିୟାପଦେ ବନ୍ଦୋ ସୋଜାସୁଜି କୋନୋ ଇଚ୍ଛା ବା ଆକାଙ୍କ୍ଷା ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାକେ ଆକାଙ୍କ୍ଷା ପ୍ରକାଶକ ଭାବେର କ୍ରିୟା ବଲା ହୁଏ । ଯେମନ—ମେ ଯାକ । ଯା ହୁଏ ହୋକ । ମେ ଏକଟୁ ହାସୁକ । ବୃକ୍ଷି ଆସେ ଆସୁକ । ତାର ମଞ୍ଚଳ ହୋକ ।

ଅନୁଶୀଳନୀ

୧। ନୈର୍ଯ୍ୟକ୍ରିୟାପଦ

ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଚାରଟି କରେ ଉତ୍ତର ଦେଖ୍ୟ ହେବେ । ଠିକ ଉତ୍ତରଟିଟିକେ ଠିକ (V) ଚିହ୍ନ ଦାଓ ।

(i) କୋନ ବାକ୍ୟଟିଟିକେ ସମଧାତୁଜ କର୍ମ ରଯେଛେ?

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| କ. ଆମି ଘୁମ ଥେକେ ଜେଗେଛି । | ଖ. ଆମି ବେଶ ଏକ ଘୁମ ଘୁମିଯେଛି । |
| ଗ. ଆମି ବେଶ ଘୁମ ଦିଯେଛି । | ଘ. ତୋମାର ଭାଲୋ ଘୁମ ହେଯିଲ ତୋ ? |

(ii) କୋନଟି ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା?

- | | |
|----------------|--------------|
| କ. ଗୋଲାଯ ଯାଓ । | ଖ. କନକନାଚେ । |
| ଗ. ବେଜେ ଖଟା । | ଘ. ଦେଖାଚେନ । |

(iii) କୋନ ବାକ୍ୟଟି ଅନୁଭା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରଛେ?

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| କ. ଆମି ବାଡ଼ି ଯାଇ । | ଖ. ମନ ଦିଯେ ଲେଖାପଡ଼ା କର । |
| ଗ. ପରିଶ୍ରମ କରଲେ ସଫଳ ହବେ । | ଘ. ତାର ମଞ୍ଚଳ ହୋକ । |

(iv) କୋନ ବାକ୍ୟଟିଟିକେ ନାମଧାତୁର କ୍ରିୟାପଦ ରଯେଛେ?

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| କ. ମା ଶିଶୁକେ ଟାଂଦ ଦେଖାଚେନ । | ଖ. ଆମରା କୃତୁବମିନାର ଦର୍ଶନ କରଲାମ । |
| ଗ. ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକେ ବେତାଚେନ । | ଘ. ଭୂମି ଯେତେ ପାର । |

(v) କୋନ ବାକ୍ୟଟି ସାପେକ୍ଷ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରଛେ?

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| କ. ଆମାକେ ବହି ଦାଓ । | ଖ. ସଦି ସେ ଯେତ, ଆମି ଆସତାମ । |
| ଗ. ତୋମାର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋକ । | ଘ. ରେବା ଭାଲୋ ଗାନ କରେ । |

(vi) କୋନ ବାକ୍ୟଟିଟିକେ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟାପଦ ରଯେଛେ?

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| କ. ଭୂମି ଏଥନ ଗାନ କରତେ ପାର । | ଖ. ଆମି ଏଇମାତ୍ର ଏଲାମ । |
| ଗ. ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ବାହ୍ଳା ପଡ଼ାଚେନ । | ଘ. ହାମିଦକେ ଦେଖେ ଖୁଶି ହଲାମ । |

(vii) କୋନ ବାକ୍ୟଟି ଦିକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଦାରା ଗଠିତ?

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| କ. ଚଳ ଖେଲତେ ଯାଇ । | ଖ. ଆର ମାୟାକାନ୍ତା କେଂଦୋ ନା । |
| ଗ. ଆମାକେ ବହିଟା ଦାଓ । | ଘ. ସାପୁଡ଼େ ସାପ ଖେଲାୟ । |

(viii) কোন বাক্যটির ক্রিয়া সকর্মক?

- ক. চুপ করে থাক।
- খ. আকাশে টাঁদ ঘোঁটছে।
- গ. শিশুটি কাদে।

(ix) কোন বাক্যটি প্রযোজক ক্রিয়া দ্বারা গঠিত?

- ক. মাথা বিম বিম করছে।
- খ. তোমার পরিশ্রমের ফল ফলেছে।
- গ. মা শিশুটিকে হাসান।
- ঘ. শিশুটি কাদে।

(x) কোন বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়া আছে?

- ক. এ নদীতে প্রচুর মাছ আছে।
- খ. আমরা হাত-মুখ ধুয়ে বেড়াতে বের হব।
- গ. বুপকথার গল্প শোন।
- ঘ. তুমি কোথায় যাচ্ছ?

২। ক্রিয়াপদের সংজ্ঞা লেখ এবং উদাহরণ দাও।

৩। বাংলা বাক্য গঠনে কোন কোন ধাতুগঠিত ক্রিয়াপদ উহ্য থাকতে পারে? উদাহরণ দাও।

৪। সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া, সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার পার্থক্য কী? উদাহরণ সহযোগে বিশদ ব্যাখ্যা কর।

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক. দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্মপদটিকে বলা হয় এবং ব্যক্তিবাচক কর্মপদটিকে বলা হয়।

খ. বাকেয়ের ক্রিয়া ও কর্মপদ একটি থেকে গঠিত হলে ঐ কর্মপদকে বলা হয়।

৬। প্রযোজক ক্রিয়া এবং নামধাতু ক্রিয়াপদের উদাহরণ দাও।

৭। যৌগিক ক্রিয়া কাকে বলে? যৌগিক ও মিশ্র ক্রিয়ার পার্থক্য লেখ।

৮। যৌগিক ক্রিয়া গঠনের উপায় কী? উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও।

৯। ‘ক্রিয়ার ভাব’ বলতে কী বোঝা? বাক্য গঠন করে সাপেক্ষ ভাবের ক্রিয়াপদের তিনটি উদাহরণ দাও।

১০। ‘আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাব’ বলতে কী বোঝা? বাক্য গঠন করে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাবের প্রয়োগ দেখাও।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাল, পুরুষ এবং কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

কাল : ক্রিয়া সংঘটনের সময়কে কাল বলে।

১. আমরা বই পড়ি। ‘পড়া’ ক্রিয়াটি এখন অর্থাৎ বর্তমানে সংঘটিত হচ্ছে।
 ২. কাল তুমি শহরে গিয়েছিলে। ‘যাওয়া’ ক্রিয়াটি পূর্বে অর্থাৎ অতীতে সম্পন্ন হয়েছে।
 ৩. আগামীকাল স্কুল কথ থাকবে। ‘কথ থাকা’ কাজটি পরে বা ভবিষ্যতে সম্পন্ন হবে।
- সুতরাং, ক্রিয়া, বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যতে সম্পন্ন হওয়ার সময় নির্দেশই ক্রিয়ার কাল।
- এ হিসেবে ক্রিয়ার কাল প্রধানত তিনি প্রকার : ১. বর্তমান কাল, ২. অতীত কাল এবং ৩. ভবিষ্যৎ কাল।
- ক্রিয়াপদ : ক্রিয়ামূল অর্থাৎ ধাতুর সঙ্গে কাল সময় ও পুরুষ জাপক (ক্রিয়া) বিভক্তিযোগে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়।

ক. পুরুষভৌতে ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য দেখা যায়। যেমন-

আমি যাই। তুমি যাও। আপনি যান। সে যায়। তিনি যান।

(সাধারণ ভবিষ্যৎ কালে নাম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার রূপ অভিন্ন।)

খ. বচনভৌতে ক্রিয়ার রূপের কোনো পার্থক্য হয় না। যথা-

আমি (বা আমরা) যাই। তুমি (বা তোমরা) যাও। আপনি (বা আপনারা) যান। সে (বা তারা) যায়।
তিনি (বা তাঁরা) যান।

গ. সাধারণ, সন্ত্রমাত্রক, তুচ্ছার্থকভৌতে মধ্যম ও নাম পুরুষের ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য হয়ে থাকে
(উভয় পুরুষে হয় না)। যেমন –

সাধারণ	সন্ত্রমাত্রক	তুচ্ছার্থক/সন্তোষার্থক
উভয় পুরুষ	আমি যাই	--
মধ্যম পুরুষ	তুমি যাও	আপনি যান
	তোমরা যাও	আপনারা যান
নাম পুরুষ	সে যায়	তিনি যান
	তারা যায়	তাঁরা যান

কালের প্রকারভৌত

ক্রিয়া সংঘটনের প্রধান কাল বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় :

১. বর্তমান কাল : ক. সাধারণ বর্তমান বা নিত্যবৃত্ত বর্তমান
খ. ঘটমান বর্তমান
গ. পুরাপাতিত বর্তমান

২. অতীত কাল : ক. সাধারণ অতীত
 খ. নিত্যবৃত্ত অতীত
 গ. ঘটমান অতীত
 ঘ. পুরাঘটিত অতীত।

৩. ভবিষ্যৎ কাল : ক. সাধারণ ভবিষ্যৎ^১
 খ. ঘটমান ভবিষ্যৎ^২
 গ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ^৩

বর্তমান কাল

১. সাধারণ বর্তমান কাল : যে ক্রিয়া বর্তমানে সাধারণভাবে ঘটে, তার কালকে সাধারণ বর্তমান কাল বলে। যেমন— সে ভাত খায়। আমি বাড়ি যাই।

ক. নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল : স্বাভাবিক বা অভ্যস্ততা বোঝালে সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়াকে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল বলে। যথা—

- সম্ধ্যায় সূর্য অস্ত যায়। (স্বাভাবিকতা)
 আমি রোজ সকালে বেড়াতে যাই। (অভ্যস্ততা)

নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ।

- (১) স্থায়ী সত্য প্রকাশে : চার আর তিনে সাত হয়।
- (২) ঐতিহাসিক বর্তমান : অতীতের কোনো ঐতিহাসিক ঘটনায় যদি নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের প্রয়োগ হয়, তাহলে তাকে ঐতিহাসিক বর্তমান কাল বলে।
 যেমন—
 বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন।
- (৩) কাব্যের ভগিনীয় : মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
 কাশীরাম দাস ভনে শুনে পুণ্যবান।
- (৪) অনিচ্ছাতা প্রকাশে : কে জানে দেশে আবার সুদিন আসবে কি না।
- (৫) ‘যদি’, ‘যখন’, ‘যেন’ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল জ্ঞাপনের জন্য সাধারণ বর্তমান কালের ব্যবহার হয়। যেমন—
 বৃক্ষ যদি আসে, আমি বাড়ি চলে যাব।
 সকলেই যেন সভায় হাজির থাকে।
 বিপদ যখন আসে, তখন এমনি করেই আসে।

সাধারণ বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

- (১) অনুমতি প্রার্থনায় (ভবিষ্যৎ কালের অর্থে) : এখন তবে আসি।
- (২) প্রাচীন লেখকের উল্ল্যতি দিতে (অতীত কালের অর্থে) : চঙ্গীদাস বলেন, ‘সবার উপরে মানুষ
সত্য, তাহার উপরে নাই।’
- (৩) বর্ণিত বিষয় প্রত্যক্ষীভূত করতে (অতীতের স্থলে) : আমি দেখেছি, বাচ্চাটি রোজ রাতে কাঁদে।
- (৪) ‘নেই’, ‘নাই’ বা ‘নি’ শব্দযোগে অতীত কালের ক্রিয়ায় : তিনি গতকাল হাটে যাননি।

ধ. ঘটমান বর্তমান কাল : যে কাজ শেষ হয়নি, এখনও চলছে, সে কাজ বোবানোর জন্য ঘটমান বর্তমান কাল
ব্যবহৃত হয়। যথা—হাসান বই পড়ছে। নীরা গান গাইছে।

ঘটমান বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

- (১) বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিতে ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যথা—বক্তা বললেন, “শত্রুর অত্যাচারে
দেশ আজ বিপন্ন, ধন—সম্পদ শুষ্ঠিত হচ্ছে, দিকে দিকে আগুন ঝুঁগছে।”
- (২) ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অর্থে : চিন্তা করো না, কালই আসছি।

গ. পুরাঘটিত বর্তমান কাল : ক্রিয়া পূর্বে শেষ হলে এবং তার ফল এখনও বর্তমান থাকলে, পুরাঘটিত বর্তমান
কাল ব্যবহৃত হয়। যেমন—

এবার আমি পরীক্ষায় উন্নীর্ণ হয়েছি।

এতক্ষণ আমি অঙ্ক করোছি।

অতীত কাল

১. সাধারণ অতীত : বর্তমান কালের পূর্বে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে, তার সংষ্টুপ কালই সাধারণ অতীত
কাল। যেমন—

প্রদীপ নিতে গেল। শিকারি পাখিটিকে গুলি করল।

সাধারণ অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার

- (১) পুরাঘটিত বর্তমান স্থলে : ‘এক্ষণে জানিলাম, কুসুমে কীট আছে।’
- (২) বিশেষ ইচ্ছা অর্থে বর্তমান কালের পরিবর্তে : তোমরা যা খুশি কর, আমি বিদায় হলাম।

২. নিত্যবৃন্ত অতীত : অতীত কালে যে ক্রিয়া সাধারণ অভ্যন্তর অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে নিত্যবৃন্ত অতীত কাল
বলে। যেমন—

আমরা তখন রোজ সকালে নদী তীরে ভ্রমণ করতাম।

নিত্যবৃন্ত অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার

- (১) কামনা প্রকাশে : আজ যদি সুমন আসত, কেমন মজা হতো।

(২) অসমৰ কলনায় : ‘সাতাশ হতো যদি একশ সাতাশ’।

(৩) সম্মান প্রকাশে : তুমি যদি যেতে, তবে ভালোই হতো।

৩. ঘটমান অতীত কাল : অতীত কালে যে কাজ চলছিল এবং যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, তখনও কাজটি সমাপ্ত হয়নি—কিয়া সংঘটনের এরূপ ভাব বোঝালে ক্রিয়ার ঘটমান অতীত কাল হয়। যেমন-

কাল সম্ম্যায় বৃক্ষ পড়ছিল। আমরা তখন বই পড়ছিলাম। বাবা আমাদের পড়াশুনা দেখছিলেন।

৪. পুরাষ্টিত অতীত কাল : যে ক্রিয়া অতীতের বহু পূর্বেই সংঘটিত হয়ে গিয়েছে এবং যার পরে আরও কিছু ঘটনা ঘটে গেছে, তার কালকে পুরাষ্টিত অতীত কাল বলা হয়। যেমন-

সেবার ভাকে সুস্থই দেখেছিলাম। কাজটি কি তুমি করেছিলে?

(ক) অতীতে সংঘটিত ঘটনার নিশ্চিত বর্ণনায় : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে এক লক্ষ সৈন্য মারা গিয়েছিল।

আমি সমিতিতে সেদিন পাঁচ টাকা নগদ দিয়েছিলাম।

(খ) অতীতে সংঘটিত ক্রিয়ার পরম্পরা বোঝাতে শেষ ক্রিয়াপদে পুরাষ্টিত অতীত কালের প্রয়োগ হয়। যেমন—
বৃক্ষ শেষ হওয়ার পূর্বেই আমরা বাড়ি পৌছেছিলাম।

ভবিষ্যৎ কাল

সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল : যে ক্রিয়া পরে বা অনাগত কালে সংঘটিত হবে, তার কালকে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল বলে। যথা—

আমরা মাঠে খেলতে যাব।

শীঘ্ৰই বৃক্ষ আসবে।

সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

(১) আক্ষেপ প্রকাশে অতীতের স্বল্পে ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহার হয়। যেমন—কে জানত, আমার ভাগ্য এমন হবে? সেদিন কে জানত যে ইউরোপে আবার মহাযুদ্ধের ভেরি থাকবে?

(২) অতীত কালের ঘটনা সম্পর্কিত যে ক্রিয়াপদে সন্দেহের ভাব বর্তমান থাকে, তার বর্ণনায় সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার হয়। যেমন— ভাবলাম, তিনি এখন বাড়ি গিয়ে থাকবেন। তোমরা হয়তো ‘বিশ্বনবি’ পড়ে থাকবে।

১. ঘটমান ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার বৃপ্ত

নাম পুরুষ সাধারণ :—ইতে থাকিবে/-তে থাকবে। (করিতে থাকিবে/করতে থাকবে)।

নাম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ :—ইতে থাকিবেন/-তে থাকবেন। (করিতে থাকিবেন/করতে থাকবেন)।

(সত্ত্বমাত্রক)

মধ্যম পুরুষ সাধারণ :—ইতে থাকিবে/-তে থাকবে। (করিতে থাকিবে/করতে থাকবে)।

মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থক :—ইতে থাকিবে/-তে থাকবি। (করিতে থাকিবি/করতে থাকবি)।

উভয় পুরুষ :—ইতে থাকিব/-তে থাকব। (করিতে থাকিব/করতে থাকব)।

যে কাজ ভবিষ্যৎ কালে চলতে থাকবে তার কালকে ঘটমান ভবিষ্যৎ বলে।

সক্ষ করার বিষয়, এখানে মূল ক্রিয়ার সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়ার -ইতে / -তে বিভক্তি যুক্ত হয় এবং সেই সঙ্গে থাক ধাতুর, সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়।

জ্ঞাতব্য : মূল ধাতুর সঙ্গে -ইতে/তে-বিভক্তি যোগে যে অসমাপিকা ক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তা অপরিবর্তনীয় এবং কোনো কালবাচক নয়। মূল ধাতুর সঙ্গে ভবিষ্যৎ কালের কোনোরূপ ক্রিয়া বিভক্তিই যুক্ত হয় না। অর্থের দিক থেকে ঘটমান ভবিষ্যতের ক্রিয়াপদ সৃষ্টি হয়েছে মনে করা যেতে পারে। রূপের দিক থেকে এগুলো সাধারণ ভবিষ্যতের ক্রিয়ার রূপ মাত্র। তাই অনেকে ঘটমান ভবিষ্যতের ক্রিয়াপদের রূপ আছে বলে স্বীকার করেন না।

২. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার রূপ : যে ক্রিয়া সম্ভবত ঘটে গিয়েছে, সাধারণ ভবিষ্যৎ কালবোধক শব্দ ব্যবহার করে তা বোঝাতে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল হয়।

পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কালের অর্থ প্রকাশের জন্য মূল ধাতুর সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি-ইয়া/এ যোগ করে এবং থাক ও গম্ ধাতুর সঙ্গে সাধারণ ভবিষ্যতের ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত করে যৌগিক ক্রিয়াপদ তৈরি হয়। যথা - গিয়ে থাকব/যাইয়া থাকিব।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেক প্রশ্নের ঠিক উত্তরটিতে ঠিক (✓) চিহ্ন দাও

- (i) কোন বাক্যে পুরাঘটিত অতীত কালের ক্রিয়া আছে?
 - ক. আমরা গিয়েছি
 - খ. তুমি যেতে থাক
 - গ. সে কি গিয়েছিল?
 - ঘ. সেখানে গিয়ে দেখে এসো
- (ii) কোন বাক্যটি ঘটমান বর্তমানের ক্রিয়া দ্বারা গঠিত?
 - ক. এ কথা জানতে তুমি
 - খ. ‘দেখে এলাম তারে’
 - গ. কে যেন আসছে
 - ঘ. ‘আবার আসিব ফিরে’
- (iii) কোন বাক্যটি ঐতিহাসিক বর্তমানের ক্রিয়াপদ দ্বারা গঠিত?
 - ক. আমি রোজ স্কুলে যাই
 - খ. বাবরের পর হুমায়ুন বাদশা হন
 - গ. কেন যে তুমি আস না
 - ঘ. রোজ দেরি হয় কেন?
- (iv) সে হয়তো ‘এসে থাকবে’—এখানে কোন কালের পরিবর্তে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহৃত হয়েছে?
 - ক. পুরাঘটিত বর্তমান
 - খ. ঘটমান অতীত
 - গ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ
 - ঘ. সাধারণ অতীত
- (v) কাজ শেষ করার জন্য সে আদাজল ‘থেয়ে লেগেছে’—এখানে ক্রিয়া পদটির কাল হচ্ছে-
 - ক. সাধারণ বর্তমান
 - খ. ঘটমান বর্তমান
 - গ. পুরাঘটিত বর্তমান
 - ঘ. ঐতিহাসিক বর্তমান

- (vi) ‘সাতাশ ‘হত’ যদি একশ সাতাশ’—এখানে ‘হত’ কোন কালের ক্রিয়া?
 ক. পুরাঘটিত অতীত
 খ. পুরাঘটিত বর্তমান
 গ. সাধারণ অতীত
 ঘ. নিত্যবৃন্ত অতীত
- (vii) ত্রিপ লক্ষ শহিদের রক্তে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। বাক্যটি কোন কালের?
 ক. সাধারণ বর্তমান
 খ. নিত্যবৃন্ত বর্তমান
 গ. পুরাঘটিত অতীত
 ঘ. পুরাঘটিত বর্তমান
- (viii) তিনি গতকাল ঢাকা ‘যান’ নি—ক্রিয়াটি কোন কালের?
 ক. পুরাঘটিত বর্তমান
 খ. সাধারণ বর্তমান
 গ. পুরাঘটিত অতীত
 ঘ. ঐতিহাসিক বর্তমান
- (ix) কোনটি নিত্যবৃন্ত অতীতের উদাহরণ?
 ক. আমি রোজ সকালে বেড়াই
 খ. আমি রোজ বেড়াতে যাব
 গ. তোমাকে রোজ যেতে হবে
 ঘ. আমি রোজ স্কুলে যেতাম
- (x) কোনটি পুরাঘটিত বর্তমানের উদাহরণ?
 ক. আমি তার সঙ্গে কথা কয়ে থাকি
 খ. আমি কথা কইব না
 গ. আমি তার সঙ্গে কথা কয়েছিলাম
 ঘ. আমি তার সঙ্গে কথা কয়েছি
- ২। ‘কাল’ বলতে কী বোঝায়? ক্রিয়ার কাল প্রধানত কয় ভাগে বিভক্ত? তাদের নাম লেখ।
- ৩। ‘পুরুষ ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ।’—উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।
- ৪। ‘পুরুষভোগে ক্রিয়ার প্রয়োগে বিভিন্নতা দেখা যায়, কিন্তু বচনভোগে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না।’—উদাহরণ সহযোগে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।
- ৫। স্বরচিত বাক্যে নিত্যবৃন্ত বর্তমান কালের চারটি বিশিষ্ট প্রয়োগ দেখাও।
- ৬। নিম্নলিখিত বাক্যগুলোতে কী কী অর্থে বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ হয়েছে তা নির্দেশ কর।
- ক. ‘এ জগতে হায়, সেই বেশি চায়, আছে যাই ভূরি ভূরি।’
 - খ. ‘একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।’
 - গ. ‘চিন্তার কারণ নেই, কালই তাকে মজা দেখাচ্ছি।’
 - ঘ. সে গত মাসেও কাজে যোগদান করেনি।
 - ঙ. ‘একক্ষণে বুঝিলাম, প্রীতির উৎস পার্থিব সম্পদ।’
- ৭। নিত্যবৃন্ত অতীত কালের ক্রিয়ার বিশিষ্ট ব্যবহার দেখিয়ে চারটি বাক্য রচনা কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমাপিকা, অসমাপিকা ও যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োগ

সমাপিকা, অসমাপিকা ও যৌগিক ক্রিয়ার সম্ভাব্য ও উদাহরণ ‘ক্রিয়াপদ’ সম্পর্কে আলোচনা (চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) দেওয়া হয়েছে। এখানে সমাপিকা, অসমাপিকা, যৌগিক ক্রিয়ার গঠন ও প্রয়োগ বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলা হবে।

সমাপিকা ক্রিয়া

সমাপিকা ক্রিয়ার গঠন

সমাপিকা ক্রিয়া সকর্মক, অকর্মক ও দ্বিকর্মক হতে পারে। ধাতুর সঙ্গে বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যৎ কালের বিভিন্ন যুক্ত হয়ে সমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যথা-

আনোয়ার বই পড়ে। (ক্রিয়া – সকর্মক, কাল – বর্তমান)।

মাসুদ সারাদিন খেলেছিল। (ক্রিয়া – অকর্মক, কাল – অতীত)।

আমি তোমাকে একটি কলম উপহার দেব। (ক্রিয়া – দ্বিকর্মক, কাল-ভবিষ্যৎ)।

অসমাপিকা ক্রিয়া

অসমাপিকা ক্রিয়ার গঠন

ধাতুর সঙ্গে কাল নিরপেক্ষ-ইয়া (য়ে), -ইতে (তে) অথবা -ইলে (লে) বিভিন্ন যুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন – যত্ত্ব করলে রত্ন মেলে। তাকে খুঁজে নিয়ে আসতে চেষ্টা করবে।

অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা

অসমাপিকা ক্রিয়া ঘটিত বাক্যে একাধিক প্রকার কর্তা (কর্তৃকারক) দেখা যায়–

১. এক কর্তা : বাক্যস্থিত সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা এক বা অভিন্ন হতে পারে। যথা – তুমি চাকরি পেলে আর কি দেশে আসবে? ‘পেলে’ (অসমাপিকা ক্রিয়া) এবং ‘আসবে’ (সমাপিকা ক্রিয়া) উভয় ক্রিয়ার কর্তা এখানে ‘তুমি’।
২. অসমান কর্তা : বাক্যস্থিত সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা এক না হলে সেখানে কর্তাগুলোকে অসমান কর্তা বলা হয়। যেমন–
৩. শর্তাধীন কর্তা : এ জাতীয় কর্তাদের ব্যবহার শর্তাধীন হতে পারে। উদাহরণ – তোমরা বাড়ি এলে আমি রওনা হব। এখানে ‘এলে’ অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা ‘তোমরা’ এবং ‘রওনা হব’ সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা ‘আমি’। তোমাদের বাড়ি আসার উপর আমার রওনা হওয়া নির্ভরশীল বলে এ জাতীয় বাক্যে কর্তৃপক্ষের ব্যবহার শর্তাধীন।

খ. নিরপেক্ষ কর্তা : শর্তাধীন না হয়েও সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার তিনি তিনি কর্তৃপদ থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথম কর্তৃপদটিকে বলা হয় নিরপেক্ষ কর্তা। যেমন – সূর্য অস্তমিত হলে যাত্রীদল পথ চলা শুরু করল। এখানে ‘যাত্রীদের’ পথ চলার সঙ্গে ‘সূর্য’ অস্তমিত হওয়ার কোনো শর্ত বা সম্পর্ক নেই বলে ‘সূর্য’ নিরপেক্ষ কর্তা।

অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

১. ‘ইলে’ > ‘লে’ বিভক্তিমুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

- | | |
|------------------------------|---|
| ক. কার্যপরম্পরা বোঝাতে | : চারটা বাজলে স্কুলের ছুটি হবে। |
| খ. প্রশ্ন বা বিস্তার জ্ঞাপনে | : একবার মরলে কি কেউ ফেরে? |
| গ. সম্ভাব্যতা অর্থে | : এখন বৃক্ষ হলে ফসলের ক্ষতি হবে। |
| ঘ. সাপেক্ষতা বোঝাতে | : তিনি গেলে কাজ হবে। |
| ঙ. দার্শনিক সত্য প্রকাশে | : ‘জনিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?’ |
| চ. বিধিনির্দেশে | : এখানে প্রচারপত্র লাগালে ফৌজদারিতে সোপন্দ হবে। |
| ছ. সম্ভাবনার বিকল্পে | : আজ গেলেও যা, কাল গেলেও তা। |
| জ. পরিণতি বোঝাতে | : বৃক্ষিতে ডিজলে সর্দি হবে। |

২. ‘ইয়া’ > ‘এ’ বিভক্তি মুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

- | | |
|---------------------------------|--|
| ক. অনন্তরতা বা পর্যায় বোঝাতে | : হাত-মুখ খুঁয়ে পড়তে বস। |
| খ. হেতু অর্থে | : ছেলেটি কুসঙ্গে মিশে নষ্ট হয়ে গেল। |
| গ. ক্রিয়া বিশেষণ অর্থে | : চেঁচিয়ে কথা বলো না। |
| ঘ. ক্রিয়ার অবিচ্ছিন্নতা বোঝাতে | : ‘হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া গাহিয়া গান।’ |
| ঙ. ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে | : সেখানে আর গিয়ে কাজ নেই। |
| চ. অব্যয় পদের অনুরূপ | : ঢাকা গিয়ে বাড়ি যাব। |

৩. ‘ইতে’ > ‘তে’ বিভক্তি মুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| ক. ইচ্ছা প্রকাশে | : এখন আমি যেতে চাই। |
| খ. উদ্দেশ্য বা নির্মিত অর্থে | : মেলা দেখতে ঢাকা যাব। |
| গ. সামর্থ্য বোঝাতে | : খোকা এখন ইঁটিতে পারে। |
| ঘ. বিধি বোঝাতে | : বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস করতে হয়। |
| ঙ. দেখা বা জানা অর্থে | : রমলা গাইতে জানে। |
| চ. আবশ্যিকতা বোঝাতে | : এখন ট্রেন ধরতে হবে। |

- ছ. সূচনা বোঝাতে : রানি এখন ইঁরেজি পড়তে শিখেছে।
 জ. বিশেষণবাচকতায় : লোকটাকে দৌড়াতে দেখলাম।
 ঘ. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে : তোমাকে তো এ গ্রামে থাকতে দেখিনি।
 ঞ. অনুসর্গরূপে : ‘কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল।’
 ট. বিশেষ্যের সঙ্গে অব্যয় সাধনে : ‘দেখিতে বাসনা মাগো তোমার চরণ।’
 ঠ. বিশেষণের সঙ্গে অব্যয় সাধনে : পদ্মফুল দেখতে সুন্দর।

৪. ‘ইতে’ > ‘তে’ বিভক্তি মুক্ত ক্রিয়ার বিত্ত প্রয়োগ

- ক. নিরন্তরতা প্রকাশে : ‘কাটিতে কাটিতে ধান এলো বরমা।’
 খ. সমকাল বোঝাতে : ‘সেউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
 সেউতি হইল সোনা ‘দেখিতে দেখিতে’।

টিকা : রীতিসিদ্ধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমাপিকা ক্রিয়া অনুপস্থিত থেকে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারে বাক্য গঠিত হতে পারে। যেমন— গুরু মেরে জুতা দান। আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ।

যৌগিক ক্রিয়া

যৌগিক ক্রিয়ার গঠন বিধি : অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে যা, পড়, দেখ, লাগ, ফেল, আস, উঠ, দে, লহ, থাক, প্রভৃতি ধাতু থেকে সমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়ে উভয়ে মিলিতভাবে যৌগিক ক্রিয়া তৈরি করে, এসব যৌগিক ক্রিয়া বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। যেমন—

১. যা-ধাতু

- ক. সমাপ্তি অর্থে : বৃক্ষ ধেমে গেল।
 খ. অবিরাম অর্থে : গায়ক গেয়ে যাচ্ছেন।
 গ. ক্রমশ অর্থে : চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।
 ঘ. সম্ভাবনা অর্থে : এখন যাওয়া যেতে পারে।

২. পড়-ধাতু

- ক. সমাপ্তি অর্থে : এখন শুয়ে পড়।
 খ. ব্যাপ্তি অর্থে : কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে।
 গ. আকর্ষিকতা অর্থে : এখনই তুফান এসে পড়বে।
 ঘ. ক্রমশ অর্থে : কেমন যেন মনমরা হয়ে পড়েছি।

- ৩. দেখ-ধাতু**
- ক. মনোযোগ আকর্ষণে : এদিকে চেয়ে দেখ।
 - খ. পরীক্ষা অর্থে : লবণটা ঢেখে দেখ।
 - গ. ফল সম্ভাবনায় : সাহেবকে বলে দেখ।
- ৪. আস-ধাতু**
- ক. সম্ভাবনায় : আজ বিকেলে বৃষ্টি আসতে পারে।
 - খ. অভ্যন্তরায় : আমরা এ কাজই করে আসছি।
 - গ. আসন্ন সমাপ্তি অর্থে : ছুটি ফুরিয়ে আসছে।
- ৫. দি-ধাতু**
- ক. অনুমতি অর্থে : আমাকে যেতে দাও।
 - খ. পূর্ণতা অর্থে : কাজটা শেষ করে দিলাম।
 - গ. সাহায্য প্রার্থনায় : আমাকে অঙ্কটা বুঝিয়ে দাও।
- ৬. নি-ধাতু**
- ক. নির্দেশ জ্ঞাপনে : এবার কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নাও।
 - খ. পরীক্ষা অর্থে : কষ্টি পাখরে সোনাটা করে নাও।
- ৭. ফেল-ধাতু**
- ক. সম্পূর্ণতা অর্থে : সল্দেশগুলো খেয়ে ফেল।
 - খ. আকস্মিকতা অর্থে : ছেলেরা হেসে ফেলল।
- ৮. উঠ-ধাতু**
- ক. ক্রমান্বয়তা বোঝাতে : খণের বোঝা ভারী হয়ে উঠছে।
 - খ. অভ্যাস অর্থে : শুধু শুধু তিনি রেগে উঠেন।
 - গ. আকস্মিকতা অর্থে : সে হঠাতে টেঁচিয়ে উঠল।
 - ঘ. সম্ভাবনা অর্থে : আমার আর থাকা হয়ে উঠল না।
 - ঙ. সামর্থ্য অর্থে : এসব কথা আমার সহ্য হয়ে উঠে না।
- ৯. শাঙ-ধাতু**
- ক. অবিরাম অর্থে : খোকা কাঁদতে শাঙল।
 - খ. সূচনা নির্দেশে : এখন কাজে শাঙ তো দেখি।

୧୦. ପାକ-ଶାତ

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| ক. নিরস্তরতা অর্থে | : এবার ভাবতে থাক। |
| খ. সম্ভাবনায় | : তিনি হয়তো বলে থাকবেন। |
| গ. সম্দেহ প্রকাশে | : সে-ই কাজটা করে থাকবে। |
| ঘ. নির্দেশে | : আর দরকার নেই, এবার বসে থাক। |

ଅନୁଶୀଳନୀ

১। সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) টিক দাও

- (i) কোন বাক্যের ক্রিয়াটি সম্ভবনা প্রকাশ করছে?

 - ক. বৃষ্টি থেমে গেল
 - খ. এঙ্গুণি বৃষ্টি এসে পড়বে
 - গ. তাড়াতাড়ি চল, বৃষ্টি আসতে পারে
 - ঘ. সে গান করতে পারে।

(ii) কোন বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়াটি অনুসর্গ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে?

 - ক. জন্মভূমি স্বর্গের চাইতে শ্রেষ্ঠ
 - খ. সে আমার দিকে চাইতে থাকে
 - গ. এমন চাওয়া চাইতে নেই
 - ঘ. কী চাইতে ইচ্ছা করে?

(iii) কোন বাক্যে অসমান কর্তা আছে?

 - ক. সে যেতে যেতে থেমে গেল
 - খ. বালিকাটি গান করে চলে গেল
 - গ. সে কেঁদে কেঁদে বলল
 - ঘ. সে এলে আমি যাব।

(iv) কোন বাক্যের কর্তা নিরপেক্ষ?

 - ক. আকাশে টাঁদ উঠলে আজ্ঞা ভাঙে
 - খ. বৃষ্টি হয়েছে তাই আমরা যাব না
 - গ. বৃক্ষিতে ভিজলে কেন, সর্দি হবে
 - ঘ. ভূমি যদি যাও, সে যাবে।

(v) কোন বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়া প্রশংসিতাস্য ব্যবহৃত হয়েছে?

 - ক. তুমি কি এখন যাবে?
 - খ. মরলে কি ফেউ ফেরে?
 - গ. ‘জন্মালে মরিতে হবে।’
 - ঘ. আজ গেলেও যা, কাল গেলেও তা।

(vi) কোন বাক্যে আবশ্যিকতা বোঝাতে ইতে > তে বিভিন্ন যুক্তি অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে?

 - ক. তোমাকে দেখতে চাই
 - খ. আমি এখানে থাকতে আসিনি
 - গ. খোকা এখন পড়তে পারে
 - ঘ. এখন দেই ধরতে হবে।

(vii) কোন বাক্যে পরীক্ষা অর্থে যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে?

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ক. কফি পাথরে সোনা কয়ে নাও | গ. এখন ভাবতে থাক |
| খ. আমাকে করতে দাও | ঘ. আমরা পরীক্ষা দিয়ে আসছি। |

(viii) কোন বাক্যে নির্দেশ অর্থে যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে?

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| ক. তিনি হয়তো বসে থাকবেন | গ. অনেক কাজ করেছ, এখন বসে থাক |
| খ. কাজ করে সে বসে থাকবে | ঘ. তুমি কি এখন বসে থাকবে? |

(ix) কোন বাক্যে ইয়া (>এ) বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া ক্রিয়ার অবিচ্ছিন্নতা বোঝাচ্ছে?

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| ক. কথা কয়ে দেখ | গ. রাজশাহী গিয়ে ফিরে আসব |
| খ. গান গেয়ে গেয়ে পথ চলেছে | ঘ. এখন গিয়ে কী করবে? |

(x) কোন বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়া নিমিস্ত অর্থ প্রকাশ করছে?

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| ক. দেখতে দেখতে সে এসে গেল | গ. পরীক্ষা দিতে ঢাকা যাব |
| খ. মেয়েটি গাইতে জানে | ঘ. সে খেতে ভালোবাসে। |

২। সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার পার্থক্য কী? উদাহরণ দিয়ে বুবিয়ে দাও।

৩। এক কর্তা, সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার উদাহরণ দাও। নিরপেক্ষ কর্তা কাকে বলে?

৪। অসমাপিকা ক্রিয়াতে কী কী বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত থাকে? স্বরচিত বাক্যে এদের প্রয়োগ দেখাও।

৫। নিম্নলিখিত বাক্যসমূহে কী কী অর্থে ‘ইলে’ বা ‘লে’ বিভক্তির প্রয়োগ হয়েছে বুবিয়ে লেখ।

- ক. ছুটি হলে দেশে যাব।
- খ. বৃক্ষি হলে ভালো ফসল হয়।
- গ. ‘জন্মলে মরিতে হবে।’
- ঘ. তার কথা শুনলে হাসি পায়।
- ঙ. চাচা গোলেও যে কাজ হবে, আমি গোলেও সেই কাজ হবে।

৬। উদাহরণ দাও।

- ক. ক্রিয়া সংঘটনের অবিচ্ছেদ্য প্রবাহ-----‘ইতে’ বা ‘তে’ বিভক্তি।
- খ. হেতু অর্থে----‘ইয়া’ বা ‘এ’ বিভক্তি।
- গ. অনুসর্গ বুপে----‘ইতে’ বা ‘তে’ বিভক্তি।

- ৭। নিম্নলিখিত অর্থে ‘ইয়া’ বা ‘এ’ বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার দেখাও-
- বিধি বোঝাতে।
 - ক্রিয়ার নিরন্তরতা প্রকাশে।
 - শেখা অর্থে।
 - ক্রিয়ার বিশেষ্য গঠনে।
 - সমকালতা বোঝাতে।
 - উপকূল অর্থে।
 - আবশ্যকতা অর্থে।
- ৮। যৌগিক ক্রিয়া বলতে কী বোঝ ? যৌগিক ক্রিয়ার গঠনবিধি সংক্ষেপে লেখ।
- ৯। নিম্নলিখিত বাক্যের মধ্যে মোটা হয়ফে লিখিত পদসমূহে কোন কোন অর্থে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার হয়েছে ?
- সাইরেন বেজে উঠল।
 - সন্ধ্যা স্বলিপে এল।
 - নির্যাতিতরাই একদিন মাথা উচিয়ে উঠবে।
 - নেয়ে খেয়ে এস।
 - হঠাত ঘূম ভেঙে যাব।
 - এ কাকে ডেকে এনেছিস ?
 - তারপরই নিরুদ্দেশ হয়ে যাই দীর্ঘ দিনের জন্য।
- ১০। অসমাপিকা ক্রিয়াযোগে শূন্যস্থান পূরণ কর-
- কাদিতে----জীবন গেল।
 - বড় যদি----চাও, ছোট হও তবে।
 - খোকাকে----দেখলে----দিও।
 - নাসিমা কি গান----জানত ?
 - আজ বৃক্ষ----পারে।
 - ডেকে দিও।
 - ‘-----করিও কাজ----ভাবিও না।’
 - সুধের-----এ ঘর বাঁধিনু অনলে---গেল।’

প্রথম পরিচেদ

বাংলা অনুজ্ঞা

ক. কাল একবার এসো।

খ. তুই বাড়ি যা।

গ. ‘ক্ষমা কর মোর অপরাধ।’

ওপরের বাক্যগুলোর প্রথম বাক্যে অনুরোধ, দ্বিতীয় বাক্যে আদেশ এবং তৃতীয় বাক্যে প্রার্থনা বোবাছে।

আদেশ, অনুরোধ, অনুমতি, প্রার্থনা, অনুনয় প্রভৃতি অর্থে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালে মধ্যম পুরুষে ক্রিয়াপদের যেনুপ হয় তাকে অনুজ্ঞা পদ বলে।

অনুজ্ঞা পদের গঠন

১. মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠার্থক সর্বনামের অনুজ্ঞায় ক্রিয়াপদে কোনো বিভক্তি যোগ হয় না। মূল ধাতুটিই ক্রিয়াপদ রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন— মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠার্থক তুই (বই) পড়। তোরা (বই) পড়।

কিন্তু অনুরোধ, আদেশ বা অনুনুপ অর্থে সন্ত্বাত্মক মধ্যম পুরুষের সর্বনাম ‘আপনি’ বা ‘আপনারা’ এবং সাধারণ মধ্যম পুরুষের সর্বনাম ‘তুমি’ বা ‘তোমরা’ পদের সঙ্গে যে অনুজ্ঞা পদের ব্যবহার হয়, তাতে বিভক্তি যুক্ত থাকে। যেমন—

সন্ত্বাত্মক মধ্যম পুরুষ— আপনি (আপনারা) আসুন (আস্+উন)।

সাধারণ মধ্যম পুরুষ— তুমি (তোমরা) আস (আস্ + অ)।

২. প্রাচীন বাংলা রীতিতে মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞায় ক্রিয়ার সঙ্গে ‘হ’ যোগ করার নিয়ম ছিল। এই ‘হ’ বর্তমানে অ এবং ও তে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন—

ক. ‘করহ [=কর] আপনি কাজ, তাতে কিবা তয় লাজ।’

খ. ‘অধম সন্তানের মাগো দেহ [দাও] পদচ্ছায়া।’

৩. ক. উভয় পুরুষের অনুজ্ঞা পদ হতে পারে না। কারণ, কেউ নিজেকে আদেশ করতে পারে না।

খ. অপ্রত্যক্ষ বলে নাম পুরুষের অনুজ্ঞা হয় না। তবে এই মত সকলে সমর্থন করেন না।

৪. ক. মধ্যম ও নাম পুরুষের বর্তমান অনুজ্ঞার রূপ :

ধরন	সর্বনাম	বিভক্তি	উদাহরণ/ক্রিয়াপদ
১. সন্ত্বাত্মক	আপনি, আপনারা, তিনি, তাঁরা	উন, ন	যাউন, যান
২. সাধারণ	তুমি, তোমরা	অ, ও	কর, করো, যাও
৩. তুচ্ছার্থক/ঘনিষ্ঠার্থক	তুই, তোরা	০ (শূন্য)	কর, যা
৪. সাধারণ	সে, তারা	উক	করুক

জ্ঞাতব্য : ক. লিদেশক ভাবের সাধারণ বর্তমান কালের সন্ত্বাত্মক মধ্যম পুরুষের বিভক্তি = এন। যেমন— আপনি দেখেন।

সত্ত্বমাত্রাক মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞা পদের বিভক্তি—‘উন’। যেমন—আপনারা দেখুন।

খ. চলতি ভাষায় ধাতুর মূল স্বর এ-কারান্ত বা ও-কারান্ত হলে উক্ত পার্থক্য লোপ পায়। যেমন—নেন, লেন, নিন < লউন, লোন।

গ. মধ্যম ও নাম পুরুষে ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞার রূপ :

ধরন	সর্বনাম	বিভক্তি		ক্রিয়াপদ	
		সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
সত্ত্বমাত্রাক	আপনি, আপনারা,	-ইবেন	-বেন	করিবেন	করবেন
	তিনি, তাঁরা				
সাধারণ	তুমি, তোমরা	-ইও	-ও	করিও	করো
ভুজ্জৰ্থক/ঘনিষ্ঠার্থক	তুই, তোরা	-ইস	-স	করিস, খাইস	খাস
সাধারণ	সে, তারা	-ইবে	-বে	করিবে	করবে

মুক্তব্য : ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞা এবং ঘটমান ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা

১. ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞা : মূল ক্রিয়াপদের সঙ্গে -ইতে/-তে বিভক্তি মুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠন করা যায়। এই অসমাপিকা ক্রিয়াপদ এবং ধাক্ ধাতুর সঙ্গে (সাধারণ) বর্তমান অনুজ্ঞার বিভক্তি মুক্ত করে যে ক্রিয়াপদ হয়, উভয়ে মিলে যৌগিক ক্রিয়া উৎপন্ন করে। এই যৌগিক ক্রিয়া ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞার অর্থ প্রকাশ করে। যেমন—

(সে)-ইতে/-তে + -টক (করিতে/করতে ধাক্কুক)।

(তিনি/আপনি) -ইতে/-তে + উন (করিতে/করতে ধাক্কুন)

(তুমি)-ইতে/-তে + -অ-ও (করিতে/করতে ধাক/ধাকে)।

(তুই)-ইতে/তে + - ০ (করিতে/করতে ধাক)

মূল ধাতুর সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি-ইতে/-তে মুক্ত হয়; এরূপ বিভক্তিমুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া সর্বদা অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। এই অসমাপিকা ক্রিয়া এবং সাধারণ বর্তমানের অনুজ্ঞার ক্রিয়াবিভক্তিমুক্ত ধাক্ ধাতু (ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞার) মিলে যৌগিক ক্রিয়া উৎপন্ন করে। এই যৌগিক ক্রিয়া ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞার অর্থ প্রকাশ করে।

ধাক্ ধাতুর সঙ্গে মুক্ত ক্রিয়াবিভক্তিগুলোই অনুজ্ঞা অর্থ প্রকাশ করে। মূল ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন অসমাপিকা ক্রিয়াটি ঘটমানতা প্রকাশে সাহায্য করে।

২. ঘটমান ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা : উপর্যুক্ত কারণেই ঘটমান ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার জন্য পৃথক ক্রিয়াবিভক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা অনাবশ্যিক। যেমন—

-ইতে/-তে+ - ইবেন/- বেন (করিতে থাকিবেন/করতে থাকবেন)।

-ইতে/ -তে + ইও - এ/-ও (করিতে থাকিও/করতে থেকো)।

-ইতে/ - তে + -ইস (করিতে থাকিস/করতে থাকিস)।

-ইতে/ -তে+ - ইবে/-বে (করিতে থাকিবে/করতে থাকবে)।

জ্ঞাতব্য

- ক) ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞায় উভয় পুরুষ ব্যবহৃত হয় না।
 খ) সম্মানাক মধ্যম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যতের ক্রিয়ার রূপটি সম্মানাক মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ব্যবহৃত হয়।

ক. বর্তমান কাল

(১) আদেশ	: কাঞ্চিটি করে ফেল। তোমরা এখন যাও।
(২) উপদেশ	: সত্য গোপন করো না। কড়া রোদে ঘোরাফেরা করিস না। 'পাত্তিস লে শিলাতলে পঞ্চপাতা।'
(৩) অনুরোধ	: আমার কাঞ্চিটা এখন কর। অঙ্কটা বুঝিয়ে দাও না।
(৪) প্রার্থনা	: আমার দরখাস্তটা গড়ুন।
(৫) অভিশাপ	: মর, পাপিষ্ঠ।

খ. ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা

(১) আদেশে	: সদা সত্য বলবে।
(২) সম্ভাবনায়	: চেষ্টা কর, সবই বুঝতে পারবে।
(৩) বিধান অর্থে	: রোগ হলে ওযুধ ধাবে।
(৪) অনুরোধে	: কাল একবার এসো (বা আসিও বা আসিবে)।

অনুশীলনী

- ১। প্রতি প্রশ্নের চারটি উভয়ের ঠিক উভরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও।
- (i) কোন ক্রিয়াটি ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞায় সম্ভাবনা বোঝাচ্ছে?
- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| ক. রোগ হলে ওযুধ ধেতে হবে | গ. চেষ্টা কর, বুঝতে পারবে |
| খ. সদা সত্য বলবে | ঘ. কাল এসো। |
- (ii) তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠার্থক মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞার চলিত রীতির বিভিন্ন কোনটি?
- | | |
|--------|--------|
| ক. -ইস | গ. -ও |
| খ. -স | ঘ. -ইও |
- (iii) সাধারণ মধ্যম পুরুষের বর্তমান কালের অনুজ্ঞার চলিত রীতির বিভিন্ন কোনটি?
- | | |
|--------|----------|
| ক. -উন | গ. -ও |
| খ. -ন | ঘ. শুন্য |

- (iv) ‘ওখানে যাস না।’ – কোন অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে?

ক. আদেশ	গ. অনুরোধ
খ. উপদেশ	ঘ. বিধান

(v) ‘থোদা আপনার মঙ্গল করুন।’ – কী অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে?

ক. আদেশ	গ. উপদেশ
খ. প্রার্থনা	ঘ. অনুরোধ।

(vi) ‘ধর্ম ও ন্যায়ের পথে চলো।’ – কী অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে?

ক. আদেশ	গ. অনুরোধ
খ. উপদেশ	ঘ. বিধান।

(vii) ‘তোর সর্বনাশ হোক।’ – কী অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে?

ক. প্রার্থনা	গ. অভিশাপ
খ. উপদেশ	ঘ. আদেশ।

(viii) ‘আমাকে সাহায্য করুন।’ – কী অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে?

ক. অনুরোধ	গ. আদেশ
খ. প্রার্থনা	ঘ. উপদেশ।

অনুজ্ঞা বলতে কী বোঝ? কোন কোন অর্থে অনুজ্ঞা পদের ব্যবহার হয়?

বর্তমান কালের অনুজ্ঞার বিভিন্নসমূহ লেখ।

‘ভবিষ্যৎ অর্থে অনুজ্ঞা পদ মধ্যম পুরুষেই সীমাবদ্ধ।’ – এ উক্তিটি বুবিয়ে দাও।

বাক্য গঠন কর

ক. অনুরোধ বর্তমান অনুজ্ঞা
খ. সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা
গ. অভিশাপে বর্তমান অনুজ্ঞা
ঘ. উপদেশে বর্তমান অনুজ্ঞা।

কোন কোন অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে, নিম্নলিখিত বাক্যগুলোর পাশে লেখ

 - ‘ওগো আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।’
 - ‘তবে যদি দয়া কর, ক্ষমা করো মোর অপরাধ।’
 - ‘রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিলতি করি পদে।’
 - ‘থোদা তোমার হায়াত দরাজ করুন।’
 - ‘সে জাহানামে যাক।’

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ক্রিয়া-বিভক্তি : সাধু ও চলিত

আমি যাই।

আপনারা যাবেন।

সে যাচ্ছে।

তাঁরা যাচ্ছিলেন।

উপরে যা-ধাতুর সঙ্গে ‘ই’, ‘বেন’, ‘ছে’ ও ‘ছিলেন’ বিভক্তি যুক্ত করে সমাপিকা ক্রিয়াপদগুলো গঠিত হয়েছে।

ধাতুর উভয় যে সকল বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে সমাপিকা ক্রিয়া গঠন করে, এই সমস্ত বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে ক্রিয়া বিভক্তি বলা হয়।

১. বিভক্তিসমূহ ক্রিয়ার কাল, পুরুষ ও বাচ্যভেদে বিভিন্ন রূপ পরিপন্থ করে। যেমন-

আমি যাই—সাধারণ বর্তমান কালে উভয় পুরুষের ক্রিয়াপদ।

আপনারা যাবেন—সাধারণ ভবিষ্যৎ কালে (সন্ত্রমাত্রক) মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াপদ।

২. সাধু ও চলিত রীতিভেদেও ক্রিয়াবিভক্তির পরিবর্তন হয়। যথা—

সাধু

আপনি ভাত খাইয়াছেন।

তাহারা বাড়ি যাইতেছে।

চলিত

আপনি ভাত খেয়েছেন।

তারা বাড়ি যাচ্ছে।

৩. প্রযোজক ক্রিয়াতেও ক্রিয়াবিভক্তির অনুরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন—

সাধু রীতি (প্রযোজক)

আমি তাহাকে দিয়া কাজটি করাইয়াছি।

রত্ন মণিকে গান শিখাইতেছিল।

চলিত রীতি (প্রযোজক)

আমি তাকে দিয়ে কাজটি করিয়েছি।

রত্ন মণিকে গান শেখাচ্ছিল।

ধাতুর গণ : ‘গণ’ শব্দের অর্থ শ্রেণি। কিন্তু ধাতুর ‘গণ’ বলতে ধাতুগুলোর বানানের ধরন বোঝায়। ‘ধাতুর গণ’ ঠিক করতে দুটি বিষয় লক্ষ রাখতে হয়। যেমন—

(ক) ধাতুটি কয়টি অক্ষরে গঠিত?

(খ) ধাতুর প্রথম বর্ণে স্থুক্ত স্বরবর্ণটি কী?

‘হওয়া’ ক্রিয়ার ধাতু ০ হ (হ + অ)। ‘হ’ একাক্ষর ধাতু এবং প্রথম বর্ণ হ—এর সাথে স্বরবর্ণ ‘অ’ যুক্ত আছে। সূতরাং হ-আসিগণের মধ্যে স-ধাতু (ক্রিয়াপদ-সওয়া) পড়বে।

বাংলা ভাষার সমস্ত ধাতুকে বিশটি গণে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

- ১। হ-আদিগণ : হ (হওয়া), ল (লওয়া) ইত্যাদি।
- ২। খ-আদিগণ : খা (খাওয়া), ধা (ধাওয়া), পা (পাওয়া), যা (যাওয়া) ইত্যাদি।
- ৩। দি-আদিগণ : দি (দেওয়া), নি (নেওয়া) ইত্যাদি।
- ৪। শু-আদিগণ : ছু (চোয়ানো), নু (নোয়ানো), ছৌ (ছোয়া) ইত্যাদি।
- ৫। কর-আদিগণ : কর (করা), কম (কমা), গড় (গড়া), চল (চলা) ইত্যাদি।
- ৬। কহ-আদিগণ : কহ (কহা), সহ (সহা), বহ (বহা) ইত্যাদি।
- ৭। কাট-আদিগণ : গীৰ্ধ, চাল, আক, বাঁধ, কাদ, ইত্যাদি।
- ৮। গাহ-আদিগণ : চাহ, বাহ, নাহ (নাহানস্নান) ইত্যাদি।
- ৯। লিখ-আদিগণ : কিন, ঘির, জিজ্ঞ, ফির, ভিড়, চিন্হ ইত্যাদি।
- ১০। উঠ-আদিগণ : উড়, শুন, ফুট, ঝুঁজ, ঘুল, ভুব, তুল ইত্যাদি।
- ১১। জাফা-আদিগণ : কাটা, ডাকা, বাজা, আগা (অগ্রসর হওয়া) ইত্যাদি।
- ১২। নাহা-আদিগণ : গাহা ইত্যাদি।
- ১৩। ফিরা-আদিগণ : ছিটা, শিখা, বিমা, চিরা ইত্যাদি।
- ১৪। ঘূরা-আদিগণ : উঁচা, লুকা, কুড়া (কুড়াচে) ইত্যাদি।
- ১৫। খোয়া-আদিগণ : শোয়া, থোচা, খোয়া, গোছা, যোগা ইত্যাদি।
- ১৬। দৌড়া-আদিগণ : পৌছা, দৌড়া ইত্যাদি।
- ১৭। চটকা-আদিগণ : সম্বা, ধম্বা, কচ্ছা ইত্যাদি।
- ১৮। বিগড়া-আদিগণ : হিচড়া, ছিটকা, সিটকা ইত্যাদি।
- ১৯। উল্টা-আদিগণ : দুমড়া, মুচড়া, উপ্চা ইত্যাদি।
- ২০। ছোবলা - আদিগণ : কোঁচকা, কোকড়া, কোদলা ইত্যাদি।

ধাতু-বিভক্তির রূপ

বর্তমান কাল

কাল	নাম পুরুষ (সাধারণ)		নাম ও মধ্যম (সম্মানাক)		মধ্যম পুরুষ (সাধারণ)		মধ্যম পুরুষ (তুষ্ণ)		উভয় পুরুষ	
	সে				তুমি		তুই		আমি	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
১. সাধারণ	-এ	-এ	-এন	-এন	-অ	-অ	-ইস্	-ইস্	-ই	-ই
২. ঘটমান	-ইতেছে	-ছে	-ইতেছেন	-ছেন	-ইতেছ	-ছ	-ইতেছিস্	-ছিস্	-ইতেছি	-ছি
		-ছে		-ছেন		-ছ		-ছিস		-ছি
৩. পুরাধাতিত	-ইয়াছে	-এছে	-ইয়াছেন	-এছেন	-ইয়াছ	-এছ	-ইয়াছিস্	-এছিস্	-ইয়াছি	-এছি
৪. অনুজ্ঞা	-উক	-উক	-উন	-উন	-অ	-ও	-অ	-মূলধাতু	-মূলধাতু	

মন্তব্য : -ইতেছ, -ছ, -ইয়াছ, -এছ, বিভক্তিগুলোর চিহ্ন অ-কারাত্ত।

অতীত কাল

কাল	নাম পুরুষ (সাধারণ)		নাম ও মধ্যম পুরুষ (সন্তোষাত্মক)		মধ্যম পুরুষ (সাধারণ)		মধ্যম পুরুষ (ভুঁচ)		উভয় পুরুষ	
	সে		তিনি	আপনি	তৃতীয়		তৃতীয়		আমি	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
৫। সাধারণ	-ইল	-ল	-ইলেন	-লেন	-ইলে	-লে	-ইলি	-লি	-ইলাম	-লাম -লুম
৬। নিষ্ঠ্যবৃত্ত	-ইত	-তে	-ইতেন	-তেন	-ইতে	-তে	-ইতিস্	-তিস্	-ইতাম	-তাম -ভুম
৭। ঘটমান	-ইতেছিল	-ছিল	-ইতেছিলেন-ছিলেন	-ইতেছিলে-ছিলে	-ইতেছিলে-ছিলে	-ইতেছিলি-ছিলি	-ইতেছিলাম-ছিলাম	-ছিলি		
৮। পুরাণাচিত	ইয়াছিল	-এছিল	-ইয়াছিলেন-এছিলেন	-ইয়াছিলে-এছিলে	-ইয়াছিলি-এছিলি	-ইয়াছিলি-এছিলি	-ইয়াছিলাম-এছিলাম	-ইয়াছিলি-এছিলি	-ইয়াছিলাম-এছিলাম	

দ্রষ্টব্য : পরে, ‘ছ’ থাকলে কর ধাতুর ‘র’ লোগ পায়। (কচ্ছিলে, কচ্ছিলি)।

ভবিষ্যৎ কাল

৯। সাধারণ	-ইবে	-বে	-ইবেন	-বেন	-ইবে	-বে	-ইবি	-বি	-ইব	-ব	-বো
১০। অনুজ্ঞা	-ইবে	-বে	-ইবেন	-বেন	-ইও	-ও	-ইস	-ইস			

দ্রষ্টব্য : -ইল, -ল, -ইত, -ইতেছিল, -ছিল, -এছিল বিভিন্নগুলো উচ্চারণে অ-কারান্ত।

কর ধাতুর রূপ (সর, গড়, চল প্রভৃতি কর-আদিগণ)

কাল	সে	তিনি	আপনি	তৃতীয়		তৃতীয়		আমি		
				সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	
১। সাধারণ বর্তমান	করে	করে	করেন	করেন	কর	কর	করিস	করিস	করি	করি
২। ঘটমান বর্তমান	করিতেছে	করাহে	করিতেছেন	করাহেন	করিতছ	করাছ	করিতেছিস	করাহিস	করিতেছি	করাই
৩। পুরাণাচিত বর্তমান	করিয়াছে	করাহে	করিয়াহেন	করাহেন	করিয়াছ	করাহ	করিয়াছিস	করাহিস	করিয়াছি	করেছি
৪। বর্তমান অনুজ্ঞা/ আকাঙ্ক্ষা	করুক	করুক	করুন	করুন	কর	কর	করি	করি	০	০
৫। সাধারণ অতীত	করিল	করল	করিলেন	করলেন	করিলে	করলে	করিলি	করালি	করিলাম	করলাম
৬। নিষ্ঠ্যবৃত্ত অতীত	করিত	করত	করিতেন	করতেন	করিতে	করাতে	করিতিস	করাতিস	করিতাম	করতাম
৭। ঘটমান অতীত	করিতেছিল	করালি	করিতেছিলেন	করালিলেন	করিতেছিল	করালিলে	করিতেছিলি	করালিলি	করিতেছিলাম	করালিলাম
৮। পুরাণাচিত অতীত	করিয়াছিল	করেছিল	করিয়াছিলেন	করেছিলেন	করিয়াছিলে	করেছিলে	করিয়াছিলি	করেছিলি	করিয়াছিলাম	করেছিলাম
৯। সাধারণ ভবিষ্যৎ	করিবে	করবে	করিবেন	করবেন	করিবে	করবে	করিবি	করবি	করিব	করব
১০। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	করিবে	করবে	করিবেন	করবেন	করিও	করো	করিস	করিস	০	০

বিশেষ দ্রষ্টব্য : তিনটি কালের দশটি ক্রমিক রূপের জন্য আমরা ধাতুরূপ সাধনে এরপর কালের পরিবর্তে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এবং ১০ ক্রমিক সংখ্যাগুলো ব্যবহার করব।

কর, করিতেছ, করাছ, করিয়াছ, করেছ – শব্দগুলো শেষ ধ্বনির উচ্চারণ অ-কারান্ত।

যা-ধাতুর রূপ

(আদিবর্ণ আ-কার যুক্ত-থা, যা, পা, ধা প্রভৃতি থা-আদিগণ)

সাধু	চলিত
১। যায় যান যাও যাইস যাই।	১। যায় যান যাও যাস যাই।
২। যাইতেছে যাইতেছেন যাইতেছ যাইতেছিস যাইতেছি।	২। যাচ্ছে যাচ্ছেন যাচ্ছ যাচ্ছিস যাচ্ছি।
৩। গিয়াছে গিয়াছেন গিয়াছ গিয়াছিস গিয়াছি।	৩। গেছে (গিয়েছে) গিয়েছেন (গেছেন) গিয়েছ (গেছ) গিয়েছিস (গেছিস) গিয়েছি (গেছি)।
৪। যাউক (যাক) যান যাও যা।	৪। যাক যান যাও যা।
৫। গেল (যাইল) গেলেন (যাইলেন) গেলে (যাইলে) গেলি (যাইলি) গেলাম (যাইলাম)	৫। গেল গেলেন গেলে গেলি গেলাম।
৬। যাইত যাইতেন যাইতে যাইতিস যাইতাম।	৬। যেত যেতেন যেতে যেতিস যেতাম।
৭। যাইতেছিল যাইতেছিলেন যাইতেছিলে যাইতেছিলি যাইতেছিলাম।	৭। যাচ্ছিল যাচ্ছিলেন যাচ্ছিলে যাচ্ছিলি যাচ্ছিলাম।
৮। গিয়াছিস গিয়াছিলেন গিয়াছিলে গিয়াছিলি গিয়াছিলাম।	৮। গিয়েছিল গিয়েছিলেন গিয়েছিলে গিয়েছিলি গিয়েছিলাম।
৯। যাইবে যাইবেন যাইবে যাইবি যাইব।	৯। যাবে যাবেন যাবে যাবি যাব।
১০। যাইবে যাইবেন যাইও যাইস।	১০। যাবে যাবেন যেও (যেয়ো) যাস।

মুক্তব্য : গিয়াছ, গেল, গিয়াছিল, যাইব, যাচ্ছ, গিয়েছ, গেছ, যেত, যাচ্ছিল, গিয়েছিল, যাব-শব্দগুলোর উচ্চারণ অ-কারান্ত।

লিখ ধাতুর রূপ

(আদিবর্ণ ই-কার যুক্ত-কিন্তু ঘির, জিত্ ফির, কিড়, চিন প্রভৃতি লিখ-আদিগণ)

সাধু	চলিত
১। লিখে লিখেন লিখ লিখিস লিখি।	১। লেখে লেখেন লেখ লিখিস লিখি।
২। লিখিতেছে লিখিতেছেন লিখিতেছ লিখিতেছিস লিখিতেছি।	২। লিখছে লিখছেন লিখছ লিখছিস লিখছি।
৩। লিখিয়াছে লিখিয়াছেন লিখিয়াছ লিখিয়াছিস লিখিয়াছি।	৩। লিখেছে লিখেছেন লিখেছ লিখেছিস লিখেছি।
৪। লিখুক লিখুন লিখ লিখ।	৪। লিখুক লিখুন লেখ লেখ।
৫। লিখিল লিখিলেন লিখিলে লিখিলি লিখিলাম।	৫। লিখল লিখলেন লিখলে লিখলি লিখলাম।
৬। লিখিত লিখিতেন লিখিতে লিখিতিস লিখিতাম।	৬। লিখত লিখতেন লিখতে লিখতিস লিখতাম।
৭। লিখিতেছিল লিখিতেছিলেন লিখিতেছিলে লিখিতেছিলি লিখিতেছিলাম।	৭। লিখছিল লিখছিলেন লিখছিলে লিখছিলি লিখছিলাম।
৮। লিখিয়াছিল লিখিয়াছিলেন লিখিয়াছিলে লিখিয়াছিলি লিখিয়াছিলাম।	৮। লিখেছিল লিখেছিলাম লিখেছিলে লিখেছিলি লিখেছিলাম।
৯। লিখিবে লিখিবেন লিখিবে লিখিবি লিখিব।	৯। লিখবে লিখবেন লিখবে লিখবি লিখব।
১০। লিখিবে লিখিবেন লিখিও (লিখিয়ো) লিখিস।	১০। লিখবে লিখবেন লিখো লিখিস।

মুক্তব্য : লিখ, লেখ, লিখিয়াছ, লিখেছ, লিখছ, লিখিত, লিখল, লিখিতেছিল, লিখছিল, লিখিত, লিখত— শব্দগুলোর উচ্চারণ অ-কারান্ত।

দে (দি) থাতুর ঝুঁপ

(আদ্যবর্ণ ই-কার যুক্ত - 'নি' ইত্যাদি দি-আদিগণ)

সাধু	চলিত
১। দেয় দেন দাও দিস দেই	১। দেয় দেন দাও দিস দি (দিই)
২। দিতেছে দিতেছেন দিতেছ দিতেছিস দিতেছি	২। দিছে দিছেন দিছ দিছিস দিছি
৩। দিয়াছে দিয়াছেন দিয়াছ দিয়াছিস দিয়াছি	৩। দিয়েছে দিয়েছেন দিয়েছ দিয়েছিস দিয়েছি
৪। দিক দিন দাও দে	৪। সাধু রীতির মতো
৫। দিল (দিলো) দিলেন দিলে দিলি দিলাম	৫। সাধু রীতির মতো
৬। দিত দিতেন দিতে দিতি দিতাম	৬। সাধু রীতির মতো
৭। দিতেছিল দিতেছিলেন দিতেছিলে দিতেছিলি দিতেছিলাম	৭। দিছিল দিছিলেন দিছিলে দিছিলি দিছিলাম
৮। দিয়াছিল দিয়াছিলেন দিয়াছিলে দিয়াছিলি দিয়াছিলাম	৮। দিয়েছিল দিয়েছিলেন দিয়েছিলে দিয়েছিলি দিয়েছিলাম
৯। দিবে দিবেন দিবি দিব	৯। দেবে দেবেন দিবি দেব
১০। দিবে দিবেন দিও (দিয়ো) দিস	১০। দেবে দেবেন দিও (দিয়ো) দিস

উঠ থাতুর ঝুঁপ

(আদ্যবর্ণ উ-কার যুক্ত - উড়, শুন, পুট, খুঁজ, খুল, ঢুব, তুল ইত্যাদি উঠ-আদিগণ)

সাধু	চলিত
১। উঠে উঠেন উঠ উঠিস উঠি	১। ওঠে ওঠেন ওঠ উঠিস উঠি
২। উঠিতেছে উঠিতেছেন উঠিতেছ উঠিতেছিস উঠিতেছি	২। উঠছে উঠছেন উঠছ উঠছিস উঠছি
৩। উঠিয়াছে উঠিয়াছেন উঠিয়াছ উঠিয়াছিস উঠিয়াছি	৩। উঠেছে উঠেছেন উঠেছ উঠেছিস উঠেছি
৪। উঠুক উঠুন উঠ উঠ	৪। উঠুক উঠুন ওঠ ওঠ
৫। উঠিল উঠিলেন উঠিলে উঠিলি উঠিলাম	৫। উঠল উঠলেন উঠলে উঠলি উঠলাম
৬। উঠিত উঠিতেন উঠিতে উঠিতিস উঠিতাম	৬। উঠত উঠতেন উঠতে উঠতিস উঠতাম
৭। উঠিতেছিল উঠিতেছিলেন উঠিতেছিলে উঠিতেছিলি উঠিতেছিলাম	৭। উঠছিল উঠছিলেন উঠছিলে উঠছিলি উঠছিলাম
৮। উঠিয়াছিল উঠিয়াছিলেন উঠিয়াছিলে উঠিয়াছিলি উঠিয়াছিলাম	৮। উঠেছিল উঠেছিলেন উঠেছিলে উঠেছিলি উঠেছিলাম
৯। উঠিবে উঠিবেন উঠিবে উঠিবি উঠিব	৯। উঠবে উঠবেন উঠবে উঠবি উঠব
১০। উঠিবে উঠিবেন উঠিও (উঠিয়ো) উঠিস্।	১০। উঠবে উঠবেন উঠো উঠিস

মুক্তব্য : উঠ, ওঠ, উঠছ, উঠিল, উঠিতেছিল, উঠছিল, উঠিয়াছিল-শব্দগুলো উচ্চারণে অ-কারাত্ত।

শু-ধাতু (আদ্যবর্ণ উ-কার যুক্ত-ইঁ, নু, ইঁ ইত্যাদি শু-আদিগণ)

সাধু	চলিত
১। শোয়। শোন। শোও। শুস। শুই।	১। শোয়। শোন। শোও। শুস। শুই।
২। শুইতেছে। শুইতেছেন। শুইতেছ। শুইতেছিস। শুইতেছি।	২। শুচ্ছে। শুচ্ছেন। শুচ্ছ। শুচ্ছিস। শুচ্ছি।
৩। শুইয়াছে। শুইয়াছেন। শুইয়াছ। শুইয়াছিস। শুইয়াছি।	৩। শুয়েছে। শুয়েছেন। শুয়েছ। শুয়েছিস। শুয়েছি।
৪। শুক। শোন। শোও। শো।	৪। সাধু রীতির মতো।
৫। শুইল। শুইলেন। শুইলে। শুইলি। শুইলাম।	৫। শুল। শুলেন। শুলে। শুলি। শুলাম।
৬। শুইত। শুইতেন। শুইতে। শুইতিস। শুইতাম।	৬। শুম। শুতেন। শুতে। শুতিস। শুতাম।
৭। শুইতেছিল। শুইতেছিলেন। শুইতেছিলে। শুইতেছিলি। শুইতেছিলাম।	৭। শুচ্ছিল। শুচ্ছিলেন। শুচ্ছিলে। শুচ্ছিলি। শুচ্ছিলাম।
৮। শুইয়াছিল। শুইয়াছিলেন। শুইয়াছিলে। শুইয়াছিলি। শুইয়াছিলাম।	৮। শুয়েছিল। শুয়েছিলেন।। শুয়েছিলে। শুয়েছিলি। শুয়েছিলাম।
৯। শুইবে। শুইবেন। শুইবে। শুইবি। শুইব।	৯। শোবে। শোবেন। শোবে। শুবি। শোবো।
১০। শুইবে। শুইবেন। শুইও (শুইয়ো)। শুইবি।	১০। শোবে। শোবেন। শুয়ো। শুস।

দ্রষ্টব্য : শুইছ, শুইতেছ, শুইয়াছ, শুয়েছ, শুইল, শুল, শুইত, শুত, শুইতেছিল, শুচ্ছিল, শুইয়াছিল, শুয়েছিল,
শুইত- শব্দগুলো উচ্চারণে অ-কারান্ত।

প্রযোজক ধাতুর রূপ

১। প্রযোজক ধাতুর চলিত রূপ সাধনে কখনো কখনো মূল ধাতুর সঙ্গে শুধু প্রযোজক রূপটি যুক্ত হয়।
যেমন- শিক্ষক ছাত্রটিকে পড়াইয়াছেন। - সাধু রূপ।

[√ পড় + আ= পড়া (প্রযোজক ধাতু) + ইয়াছেন (বিভঙ্গ)।

শিক্ষক ছাত্রটিকে পড়িয়েছেন - চলিত রূপ।

[√পড় + o (অর্থাৎ প্রযোজক-প্রকরণের আ যুক্ত হলো না) + ইয়েছেন = পড়িয়েছেন- চলিত
রূপ।] চলিত রূপে আরও কয়েকটি ধাতুর পরিবর্তন সক্ষণীয়-

হ-ধাতু : দাঢ়াও, তোমাকে হওয়াচ্ছ।

শিখ-ধাতু : কে তোমাকে গান শেখাচ্ছে?

শুন-ধাতু : এ কী কথা শোনালি রে।

**প্রযোজক ধাতুর বিভক্তি
বর্তমান কাল**

কাল বিভাগ	সে	তিনি	আপনি	ভূমি	তুই	আমি
	সাধু চলিত	সাধু চলিত	সাধু চলিত	সাধু চলিত	সাধু চলিত	সাধু চলিত
১। সাধারণ	*য় *য়	*ন *ন	*ও *ও	*ইস *স	*ই *ই	
২। ঘটমান	*ইতেছে *ছে	*ইতেছেন *ছেন	*ইতেছ *ছ	*ইতেছিস *ছিস	*ইতেছি *ছি	
৩। পুরাধিত	*ইয়াছে *ইয়েছে	*ইয়াছেন *ইয়েছেন।	*ইয়াছ *ইয়েছ	*ইয়াছিস *ইয়েছিস	*ইয়াছি *ইয়েছি।	
৪। অনুজ্ঞা	*টক *ক	*ন *ন	*ও *ও	*ইস *স		

অতীত কাল

৫। সাধারণ	*ইল *ল * লো	*ইলেন *লেন	*ইলে *লে	*ইলি *লি	*ইলাম *লাম
৬। নিত্যবৃত্ত	*ইত *ত * তো	*ইতেন *তেন	*ইতে *তে	*ইতিস *তিস	*ইতাম *তাম
৭। ঘটমান	*ইতেছিল *ছিল	*ইতেছিলেন *ছিলেন	*ইতেছিলে *ছিলে	*ইতিছিলি *ছিলি	*ইতেছিলাম *ছিলাম
৮। পুরাধিত	*ইয়াছিল ০ ইয়েছিল	*ইয়াছিলেন ০ ইয়েছিলেন	*ইয়াছিলে ০ ইয়েছিলে	*ইয়াছিলি ০ ইয়েছিলি	*ইয়াছিলাম ০ ইয়েছিলাম

ভবিষ্যৎ কাল

৯। সাধারণ	*ইবে *বে	*ইবেন *বেন	*ইবে *বে	*ইবি *বি	*ইব*ব *বো
১০। অনুজ্ঞা	*টক *ক	*বেন *বেন	*ইও *য়ো	*ইস *স	

জ্ঞাতব্য : ধাতুর প্রযোজক রূপ সাধনে তারকা চিহ্নের (*) স্থলে মূল ধাতুর পরে (আ-কার) সংযোজিত হবে, কিন্তু ০ স্থলে হবে না।

‘কর’ ধাতুর প্রযোজক রূপ

কাল	সে		তিনি		আপনি		তুমি		তুই		আমি	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
১। সাধারণ বর্তমান	করায়	করায়	করান	করান	করাও	করাও	করাইস	করাস	করাই	করাই		
২। ঘটমান বর্তমান	করাইতেছে	করাছে	করাইতেছেন	করাছেন	করাইতেছ	করাছ	করাইতেছিস	করাছিস	করাইতেছি	করাছি		
৩। পুনাদ্বিতী বর্তমান	করাইয়াছে	করায়েছে	করাইয়াছেন	করিয়েছেন	করাইয়াছ	করিয়েছ	করাইয়াছিস	করিয়েছিস	করাইয়াছি	করিয়েছি		
৪। অনুভা/আকস্মা বর্তমান	করাক	করাক	করান	করান	করাও	করাও	করাইস	করাস	করাই	করাই		
৫। সাধারণ অতীত	করাইল	করাল	করাইলেন	করালেন	করাইলে	করালে	করাইলি	করালি	করাইলাম	করালাম		
৬। নিষ্ঠাবৃত্ত অতীত	করাইত	করাত	করাইতেন	করাতেন	করাইতে	করাতে	করাইতিস	করাতিস	করাইতাম	করাতাম		
৭। ঘটমান অতীত	করাইতেছি	করাছিল	করাইতেছিলেন	করাছিলেন	করাইতেছিলে	করাছিলে	করাইতেছিলি	করাছিলি	করাইতেছিলাম	করাছিলাম		
৮। পুনাদ্বিতী অতীত	করাইয়াছিল	করিয়েছিল	করাইয়াছিলেন	করিয়েছিলেন	করাইয়াছিলে	করিয়েছিলে	করাইয়াছিলি	করিয়েছিলি	করাইয়াছিলাম	করিয়েছিলাম		
৯। সাধারণ ভবিষ্যৎ	করাইবে	করাবে	করাইবেন	করাবেন	করাইবে	করাবে	করাইবি	করাবি	করাইব	করাব		
১০। ভবিষ্যৎ অনুভা	করাক	করাক	করান	করান	করাইও	করারো	করাইস	করাস				

পরিশিষ্ট : ধাতুর চলিত রূপ সাধনে কতিপয় পরিবর্তন

১. মূলস্বর অ-কারান্ত

কহ ধাতু : কইতাম, কইলাম, কইতি, কইতিস, কয়েছিস ইত্যাদি।

২. মূলস্বর আ-কারান্ত

(ক) খা-ধাতু : খেলাম (খাইলাম), খেলেন (খাইলেন), খেল, খেলে, (খাইল), খেয়েছে ইত্যাদি।

(খ) যা-ধাতু : গেল (যাইল), গিয়েছিল, যেত-যেতো (যাইত), যেতেছিল, যাছিল (যাইতেছিল) ইত্যাদি।

(গ) গাহ (গৈ)-ধাতু : (চলিত রূপ)- গাইত, গাইলাম, গেয়েছি, গেয়েছিলাম, গেয়েছ, গাইলে,
গাইতিস, গাইছিস, গাইবে, গাবে, গাইব, গাব ইত্যাদি।

৩. মূলস্বর ই বা ঈ-কারান্ত : শিখ ধাতু (চলিত রূপ)-শেখো, শেখেন, শেখে (শিখে), শিখিস, শিখলাম, শেখ ইত্যাদি।

৪। মূলস্বর উ-কারান্ত : শুন ধাতু- শোনো, শোনেন, শোনে, শুনলাম, শুনেছি, শুনতাম, শুনেছিস, শোনাও ইত্যাদি।

৫। মূলস্বর এ-কারান্ত : দে, (দি) ধাতু-দিই, দেয়, দেন, দিন, দাও, দিলাম, দিয়েছিলাম, দিতাম (দিতুম), দেব (দেবো), দিচ্ছে, দিচ্ছিলুম, দাও, দে, দিন, দিক, দিয়ো (দিবো) ইত্যাদি।

৬। মূলস্বর শ-কারান্ত : ধো-ধাতু-ধোয়, ধোন, ধোও, ধুচ্ছিস, ধুইবি, ধুয়েছিল, ধোস, ইত্যাদি। বাকি
সকলো উ-কার যুক্ত ধাতুর রূপের ন্যায়।

প্রযোজক ধাতুর চলিত রূপ সাধনে কয়েকটি পরিবর্তন

(বন্ধনীর মধ্যে সাধু রূপটিও দেখানো হলো)

- (ক) মূলবর অ-কারান্ত : ‘হ’ – হইয়েছে (হওয়াইয়াছে), হইয়েছিস (হওয়াইয়াছিস), হইয়েছিল্লম (হওয়াইয়াছিলাম), হওয়াচ্ছি (হওয়াইতেছি), হয়ায়ো (হওয়াইও)।
- (খ) মূলবর ই-ই-কারান্ত : হলে প্রযোজক ধাতুর চলিত রূপ কখনো ই-কারান্ত এবং কখনো এ-কারান্ত হয়। যেমন – (সাধু) শিখ > (চলিত) শেখ (ধাতু)।

রূপ সাধন : শিখাই-শেখাই-শিখুই। শেখাও-শিখোও। শেখালুম,-শিখেলুম। শেখালে-শিখোলে। শেখাতুম-শিখেতুম। শেখাতিস-শিখেতিস। শেখাত-শিখোতো। শেখাবি-শিখোবি। শিখাচ্ছি-শিখেচ্ছি (শিখাচ্ছি)। শেখাচ্ছে-শিখুচ্ছে। শেখাচ্ছিল-শিখেচ্ছিল। শেখাও-শেখোও। শেখ-শিখো।

- (গ) মূলবর উ-কারান্ত : এর দুটো রূপ দেখা যায়। বন্ধনীর মধ্যে দ্বিতীয় রূপটিও দেখানো হলো।

শুন-ধাতুর রূপ সাধন : শুনাই (শোনাই)। শোনাও (শুনোও)। শুনান (শুনোন)। শোনায় (শুনোয়)। শুনানি (শুনোনি)। শুনালুম (শুনোলুম)। শোনাতুম (শুনোতুম)। শোনাতিস (শুনেতিস-শুনোতিস-শুনুতিস)। শোনাব (শুনোব)। শোনাচ্ছ (শুনাচ্ছ)। শোনাও (শোনোও)। শোনাস (শুনোস) ইত্যাদি।

বাক্য গঠন : আহা! কী হওয়াটাই না তুমি হওয়ালে। দাঢ়াও তোমাকে শেখাচ্ছি। তুই আর আমাকে কী শিখুবি? রোজ তোমাকে কত রূপকথা শোনাই। ‘কী কথা শুনালি যোরে’। ওকে তুমি কী শুনাচ্ছ?

কয়েকটি অসম্পূর্ণ ধাতু

বাংলা ভাষায় কয়েকটি ধাতুর সকল কালের রূপ পাওয়া যায় না। সাধারণ সহকারী ক্রিয়া গঠনে এদের কয়েকটি রূপ পাওয়া যায় মাত্র। যেমন –

১. √আ-আইল>এল। আইলেন>এলেন। আইলে>এলে। আইলি>এলি। আইলাম>এলাম। আয় (অনুজ্ঞা)।
২. √আছ – (বর্তমান কালে) : আছে, আছেন, আছ, আছিস, আছি। (অভীত কালে) ছিল, ছিলেন, ছিলে, ছিলি, ছিলাম।
- ৩। নহ ধাতু-(বর্তমান কালে) : নন, নহে, নহেন > নন, নহ, নও, নহস, নহিস, নস, নহি, নই।
- ৪। বট ধাতু – (বর্তমান কালে) : বটে, বটেন, বট, বটিস, বটি।
- ৫। ধাক (রহ) ধাতু (বর্তমান কালে) : ধাকে, ধাকেন, রহেন, ধাক, (রও), ধাকিস, (রস, রোস, রাইস), ধাকি (রই), ধাকে (রয়) ইত্যাদি।

অভীত কাল : রহিত (রইত), রহিতেন (রইতেন), রহিতাম (রইতাম-রইতুম) ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ কাল : রহিবে, (রইবে, রবে), রহিবেন (রইবেন), রহিবি (রইবি), রহিব (রইবো), রহিস (রোস, রোসো)।

বাক্য গঠন : ‘কোথাকার জানুকর এলি এখানে।’ ‘আইল রাঙ্কসকূল প্রভঙ্গন বেগে।’ কেমন আছিস? কোথায় ছিলি? সে ব্যক্তিটি তুমি নও। ‘একা দেখি কুলবধু, কে বট আপনি? ‘আজি ঘরে একলাটি পারবো না রইতে।’ ঝোনো, তোমাকে মজা দেখাচ্ছি। ‘হেথো নয়, হেথো নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন খানে।’

অনুশীলনী

১। প্রত্যেক প্রশ্নের চারটি উভয় দেওয়া হয়েছে। ঠিক উভয়টির পাশে টিক (\checkmark) টিক দাও :

(ক) বাঙ্গা ভাষার ধাতুর রূপ কোনটি?

ক. ১৮টি

খ. ২০টি

গ. ১৯টি

ঘ. ২১টি

(খ) কোন গুচ্ছের সকলো ধাতু উঠ-আদি গণের অন্তর্ভুক্ত?

ক. শুন, খুঁজ, দুব,, তুস

খ. সহ, কহ, বস, শুন,

গ. শিখ, কিন, বাহ, দুব

ঘ. কিহ, দুব, শিখ, শুন

(গ) কর-ধাতুর উভয় পুরুষ পুরাঘটিত অতীতে চলিত রূপ কোনটি?

ক. করতাম

খ. করিয়াছিলাম

গ. করিতাম

ঘ. করেছিলাম

(ঘ) যা-ধাতুর মধ্যম পুরুষ নিত্যবৃত্ত অতীতের চলিত ভাষার রূপ কোনটি?

ক. গিয়েছিলে

খ. যেতে

গ. যাইছিলি

ঘ. যাইত

(ঙ) দে-ধাতুর প্রথম পুরুষ ঘটমান বর্তমানের চলিত রীতির রূপ কোনটি?

ক. দিতেছে

খ. দিত

গ. দিছে

ঘ. দিয়েছিল

(চ) কোন গুচ্ছের সকলো ধাতু অসম্পূর্ণ ধাতু?

ক. \checkmark আ, \checkmark বট, \checkmark শিখ, \checkmark যা

খ. \checkmark আছ, \checkmark তা, \checkmark শিখ, \checkmark যা

গ. \checkmark আ, \checkmark থাক, \checkmark আছ, \checkmark বট

ঘ. \checkmark থাক, \checkmark বট, \checkmark আ, \checkmark শিখ

(ছ) প্রযোজক যা-ধাতুর পুরাঘটিত অতীত কালের প্রথম পুরুষের চলিত রূপ কোনটি?

ক. গেল

খ. গিয়াছিল

গ. যেত

ঘ. গিয়েছিল

(বা) নতুন ধাতুর সাধারণ বর্তমান উভয় পুরুষের চলিত রূপ কোনটি?

ক. নহি

খ. নহে

গ. নই

ঘ. নয়

- ২। ধাতু কাকে বলে? ধাতু কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার ধাতুর দুটো করে উদাহরণ দাও।
- ৩। নামধাতু বলতে কী বোঝ? নামধাতু কীভাবে গঠিত হয়, বাকেয় এর ব্যবহার দেখাও।
- ৪। সত্ত্বা লেখ এবং বিশদভাবে বুঝিয়ে দাও।
শিজস্ত ধাতু, অসম্পূর্ণ ধাতু, সংযোগমূলক ধাতু
- ৫। নিম্নলিখিত ধাতুগুলোর সাথু ও চলিত রূপ লেখ।
বল, শিখ, দে, শুন, যা, কহ, পড়, লিখ।
- ৬। শুন-ধাতুর শিজস্ত-প্রকরণের রূপগুলো লেখ।
- ৭। বাকেয় প্রয়োগ দেখাও।
 - (ক) তিনটি ঘটমান কালের গাহ ধাতু।
 - (খ) কর-ধাতুর ভবিষ্যৎ শিজস্ত রূপ।
 - (গ) গাহ-ধাতুর বর্তমান কালের চলিত রূপ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কারক ও বিভক্তি এবং সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ

কারক : ‘কারক’ শব্দটির অর্থ – যা ক্রিয়া সম্পাদন করে।

বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের যে সম্পর্ক, তাকে কারক বলে।

কারক হয় প্রকার :

- | | |
|--------------|-------------------|
| ১. কর্তৃকারক | ৪. সম্প্রদান কারক |
| ২. কর্ম কারক | ৫. অপাদান কারক |
| ৩. করণ কারক | ৬. অধিকরণ কারক |

একটি বাক্যে ছয়টি কারকের উদাহরণ-

* বেগম সাহেবা প্রতিদিন তাঁড়ার থেকে নিজ হাতে গরিবদের চাল দিতেন।

এখানে

- | | | | | | |
|----|--------------|---|----------|-------|-------------------|
| ১. | বেগম সাহেবা | — | ক্রিয়ার | সঙ্গে | কর্তৃসম্বন্ধ |
| ২. | চাল | — | ” | ” | কর্ম সম্বন্ধ |
| ৩. | হাতে | — | ” | ” | করণ সম্বন্ধ |
| ৪. | গরিবদের | — | ” | ” | সম্প্রদান সম্বন্ধ |
| ৫. | তাঁড়ার থেকে | — | ” | ” | অপাদান সম্বন্ধ |
| ৬. | প্রতিদিন | — | ” | ” | অধিকরণ সম্বন্ধ |

বিভক্তি : বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের অব্যয় সাধনের জন্য শব্দের সঙ্গে যে সকল বর্ণ যুক্ত হয়, তাদের বিভক্তি বলে। যেমন – ছাদে বসে মা শিশুকে টাঁদ দেখাচ্ছেন।

বাক্যটিতে ছাদে (ছাদ + এ বিভক্তি), মা (মা + ০ বিভক্তি), শিশুকে (শিশু + কে বিভক্তি), টাঁদ (টাঁদ + ০ বিভক্তি) ইত্যাদি পদে বিভিন্ন বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। বিভক্তিগুলো ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

বিভক্তি চিহ্ন স্পষ্ট না হলে সেখানে শূন্য বিভক্তি আছে মনে করা হয়।

বাঙ্গা শব্দ-বিভক্তি

০ শূন্য বিভক্তি (অথবা অ-বিভক্তি), এ, (য), তে (এ), কে, (ৈ,) র, (এরা) – এ কয়টিই খাটি বাঙ্গা শব্দ বিভক্তি। এ ছাড়া বিভক্তি স্থানীয় কয়েকটি অব্যয় শব্দও কারক-সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য বাঙ্গায় প্রচলিত রয়েছে। যেমন-দ্বারা, দিয়ে, হতে, থেকে ইত্যাদি।

বাঙ্গা শব্দ-বিভক্তি সাত প্রকার : প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী এবং সপ্তমী।

একবচন এবং বহুবচন ভেদে বিভক্তিগুলোর আকৃতিগত পার্থক্য দেখা যায়। যেমন–

বিভক্তির আকৃতি

	একবচন	বহুবচন
গ্রথমা	: o, অ, এ, (য), তে, এতে।	রা, এরা, গুলি (গুলো), গণ।
দ্বিতীয়া	: o, অ, কে, রে (এরে), এ, য, তে।	দিগে, দিগকে, দিগেরে, *দের।
তৃতীয়া	: o, অ, এ, তে, ঘারা, দিয়া (দিয়ে), কর্তৃক।	দিগের দিয়া, দের দিয়া, দিগকে ঘারা, দিগ কর্তৃক, গুলির ঘারা, গুলিকে দিয়ে, * গুলো দিয়ে, গুলি কর্তৃক, * দের দিয়ে।
চতুর্থী	: দ্বিতীয়ার মতো।	দ্বিতীয়ার মতো।
পঞ্চমী	: এ (য়ে, য়), হইতে, *থেকে, *চেয়ে, *হতে।	দিগ হইতে, দের হইতে, দিগের চেয়ে, গুলি হইতে, গুলির চেয়ে, *দের হতে, *দের থেকে, *দের চেয়ে।
ষষ্ঠী	: র, এর।	*দিগের, দের, গুলির, গণের, গুলোর।
স্পন্দনী	: এ, (য়), য়, তে, এতে।	দিগে, দিগেতে, গুলিতে, গণে, গুলির মধ্যে, গুলোতে, গুলোর মধ্যে।

তারকা চিহ্নিত বিভক্তিগুলো এবং ক্ষম্ভনীতে লিখিত শব্দ চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

বিভক্তি যোগের নিয়ম

- (ক) অগ্রাণী বা ইতর প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে ‘রা’ যুক্ত হয় না; গুলি, গুলো যুক্ত হয় যেমন—পাথরগুলো, গরুগুলি।
- (খ) অপ্রাণিবাচক শব্দের উভয় ‘কে’ বা ‘রে’ বিভক্তি হয় না, শূন্য বিভক্তি হয়। যথা—কলম দাও।
- (গ) স্বরান্ত শব্দের উভয় ‘এ’ বিভক্তির রূপ হয়—‘য়’ বা ‘য়ে’। ‘এ’ স্থানে ‘তে’ বিভক্তিও যুক্ত হতে পারে।
যেমন—মা+এ =মায়ে, ঘোড়া + এ = ঘোড়ায়, পানি + তে = পানিতে।
- (ঘ) অ-কারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের উভয় প্রায়ই ‘রা’ স্থানে ‘এরা’ হয় এবং ষষ্ঠী বিভক্তির ‘র’ স্থলে ‘এর’ যুক্ত হয়। যেমন—লোক + রা = লোকেরা। বিদান (ব্যঞ্জনান্ত) + রা = বিদানেরা। মানুষ + এর = মানুষের।
লোক + এর = লোকের। কিন্তু অ-কারান্ত, আ-কারান্ত এবং এ-কারান্ত থাটি বাংলা শব্দের ষষ্ঠীর এক বচনে সাধারণ ‘র’ যুক্ত হয়, ‘এর’ যুক্ত হয় না। যেমন—বড়, মামার, ছেলের।

কর্তৃকারক

বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তা ক্রিয়ার কর্তা বা কর্তৃকারক।

ক্রিয়ার সঙ্গে ‘কে’ বা ‘কারা’ যোগ করে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তা—ই কর্তৃকারক। যেমন— খোকা বই পড়ে। (কে পড়ে? খোকা— কর্তৃকারক)। মেয়েরা ফুল তোলে। (কারা তোলে? মেয়েরা— কর্তৃকারক)।

কর্তৃকারকের প্রকারভেদ

ক. কর্তৃকারক বাক্যের ক্রিয়া সম্পাদনের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চার প্রকারের হয়ে থাকে :

১. মুখ্য কর্তা : যে নিজে নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে সে মুখ্য কর্তা। যেমন— ছেলেরা ফুটবল খেলছে। মুশলধারে বৃক্ষ পড়ছে।
২. প্রযোজক কর্তা : মূল কর্তা যখন অন্যকে কোনো কাজে নিয়োজিত করে তা সম্পন্ন করায়, তখন তাকে প্রযোজক কর্তা বলে। যেমন— শিক্ষক ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াছেন।
৩. প্রযোজ্য কর্তা : মূল কর্তার করণীয় কার্য যাকে দিয়ে সম্পাদিত হয়, তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলা হয়। উপরের বাক্যে ‘ছাত্র’ প্রযোজ্য কর্তা।

তদুপ— রাখাল (প্রযোজক) গুরুকে (প্রযোজ্য কর্তা) ঘাস খাওয়ায়।

৪. ব্যতিহার কর্তা : কোনো বাক্যে যে দুটো কর্তা একত্রে একজাতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাদের ব্যতিহার কর্তা বলে। যেমন—

বাসে—মহিলে এক ঘাটে জল খায়।

মাজাহ—মাজাহ লড়াই, উলুখাগড়ার প্রাণান্ত।

খ. বাক্যের বাচ্য বা প্রকাশতত্ত্ব অনুসারে কর্তা তিনি রাকম হতে পারে। যেমন—

১. কর্মবাচ্যের কর্তা (কর্মপদের প্রাধান্যসূচক বাক্যে) : গুণিশ দারা ঢোর ধূত হয়েছে।
২. ভাববাচ্যের কর্তা (ক্রিয়ার প্রাধান্যসূচক বাক্যে) : আমার যাওয়া হবে না।
৩. কর্ম-কর্তৃবাচ্যের কর্তা (বাক্যে কর্মপদই কর্তৃস্থানীয়) : বাশি বাজে। কলমটা লেখে ভালো।

কর্তৃকারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| ক) প্রথমা শূন্য বা অ বিভক্তি | : হামিদ বই পড়ে। |
| খ) দ্বিতীয় বা কে বিভক্তি | : বশিরকে যেতে হবে। |
| গ) তৃতীয় বা দ্বারা বিভক্তি | : ফেরদৌসী কর্তৃক শাহনামা রচিত হয়েছে। |
| ঘ) ষষ্ঠী বা র বিভক্তি | : আমার যাওয়া হয়নি। |

(গ) সপ্তমী বা এ বিভক্তি : গীঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল।
 বাপে না জিজ্ঞাসে, মায়ে না সন্তানে।
 পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়।
 বাঘে-মহিষে খানা একঘাটে খাবে না।

য়-বিভক্তি : ঘোড়ার গাড়ি টানে।
 তে-বিভক্তি : গম্ভুতে দুখ দেয়।
 বুলবুশিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কীসে?

কর্মকারক

যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে কর্মকারক বলে।

কর্ম দুই প্রকার : মুখ্য কর্ম, গৌণ কর্ম। যেমন-

বাবা আমাকে (গৌণ কর্ম) একটি কশম (মুখ্য কর্ম) কিনে দিয়েছেন।

সাধারণত মুখ্য কর্ম বস্তুবাচক ও গৌণ কর্ম প্রাণিবাচক হয়ে থাকে। এছাড়াও সাধারণত কর্মকারকের গৌণ কর্মে বিভক্তি যুক্ত হয়, মুখ্য কর্মে হয় না।

কর্মকারকের প্রকারভেদ

- ক) সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম : নাসিমা ফুল তুলছে।
- খ) প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম : ছেলেটিকে বিছানায় শোয়াও।
- গ) সমধাতুজ কর্ম : খুব এক সুম ঘূমিয়েছি।
- ঘ) উদ্দেশ্য ও বিধেয় : দ্বিকর্মক ক্রিয়ার দুটি পরস্পর অপেক্ষিত কর্মপদ থাকলে প্রথান কর্মটিকে বলা হয় উদ্দেশ্য কর্ম এবং অপেক্ষিত কর্মটিকে বলা হয় বিধেয় কর্ম। যেমন-

দুর্ধকে (উদ্দেশ্য কর্ম) মোরা দুর্ধ (বিধেয় কর্ম) বলি, হলুদকে (উদ্দেশ্য কর্ম) বলি হরিদ্রা (বিধেয় কর্ম)।

কর্মকারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

- (ক) প্রথমা বা শূন্য বা অ বিভক্তি : ভাস্তার ডাক।
 আমাকে একখানা বই দাও। (দ্বিকর্মক ক্রিয়ার মুখ্য কর্ম)
 রবীন্দ্রনাথ পড়লাম, নজরুল পড়লাম, এর সুরাহা খুঁজে পেলাম না।
 (গ্রন্থ অর্থে বিশিষ্ট গ্রন্থকার প্রয়োগে)

- (খ) দ্বিতীয়া বা কে বিভক্তি
 রে বিভক্তি : তাকে বল।
 ‘আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা’।

- (ଗ) ସତୀ ବା ର ବିଭିନ୍ନ : ତୋମାର ଦେଖା ପେଲାମ ନା ।
 (ଘ) ସଂତମୀର ଏ ବିଭିନ୍ନ : ‘ଜିଜ୍ଞାସିବେ ଜନେ ଜନେ ।’ (ବୀଳ୍ୟା)

କରଣ କାରକ

‘କରଣ’ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ : ସତ୍ର, ସହାୟକ ବା ଉପାୟ ।

କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନେର ସତ୍ର, ଉପକରଣ ବା ସହାୟକକେଇ କରଣ କାରକ ବଳ୍ଳ ହୁଏ ।

ବାକ୍ୟାସିଥିତ କ୍ରିୟାପଦେର ସଙ୍ଗେ ‘କୀସେର ଦାରା’ ବା ‘କୀ ଉପାୟେ’ ପ୍ରଶ୍ନ କରଲେ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗଟି ପାଉୟା ଯାଏ, ତା-ଇ କରଣ କାରକ । ଯେମନ –

ନୀରା କଳମ ଦିଯେ ଲେଖେ । (ଉପକରଣ – କଳମ)

‘ଭଗତେ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ହୁଁ ସାଧନାୟ ।’ (ଉପାୟ – ସାଧନା)

କରଣ କାରକକେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନର ବ୍ୟବହାର

- (କ) ପ୍ରୟେମ ବା ଶୂନ୍ୟ ବା ଅ ବିଭିନ୍ନ : ଛାତ୍ରରା ବଳ ଥେଲେ । (ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା)
 ଡାକାତେରା ଗୃହସ୍ଵାମୀର ମାଥାଯ ଲାଠି ମେରେଛେ । (ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା)
- (ଖ) ତୃତୀୟା ବା ଦାରା ବିଭିନ୍ନ : ଲାଙ୍ଘାଳ ଦାରା ଜମି ଚାସ କରା ହୁଏ ।
- ଦିଯା ବିଭିନ୍ନ : ମନ ଦିଯା କର ସବେ ବିଦ୍ୟା ଉପାର୍ଜନ ।
- (ଗ) ସଂତମୀ ବିଭିନ୍ନ ବା ଏ ବିଭିନ୍ନ : ଝୁଲେ ଝୁଲେ ଘର ଭରେଛେ ।
 ଶିକାରି ବିଡ଼ାଳ ଶୌଫେ ଚେନା ଯାଏ ।
- ତେ ବିଭିନ୍ନ : ‘ଏତ ଶଠତା, ଏତ ଯେ ବ୍ୟଥା,
 ତବୁ ଯେନ ତା ମଧୁତେ ମାଖା ।’ – ନଜରୁଲ ।
 ଲୋକଟା ଜୀବିତେ ବୈକଳ୍ପିକ ।
- ଯ ବିଭିନ୍ନ : ଚେଷ୍ଟାର ସବ ହୁଏ ।
 ଏ ସୁତାୟ କାପଡ଼ ହୁଏ ନା ।

ସମସ୍ତଦାନ କାରକ

ଯାକେ ସତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରେ ଦାନ, ଅର୍ଚନା, ସାହାୟ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କରା ହୁଏ, ତାକେ (ସଂକୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁୟାୟୀ) ସମସ୍ତଦାନ କାରକ ବଲେ । ବନ୍ଦୁ ନୟ – ବ୍ୟକ୍ତିଇ ସମସ୍ତଦାନ କାରକ ।

(ଅନେକ ବୈଯାକରଣ ବାଳ୍କ ବ୍ୟାକରଣେ ସମସ୍ତଦାନ କାରକ ଶ୍ରୀକାର କରେନ ନା; କାରଣ, କର୍ମକାରକ ଦାରାଇ ସମସ୍ତଦାନ କାରକରେ କାଜ ସୁନ୍ଦରଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରା ଯାଏ ।)

সম্প্রদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

(ক) চতুর্থী বা কে বিভক্তি : শিখাইকে তিঙ্গা দাও। (স্বত্তন্ত্র করে না দিলে কর্মকারক হবে। যেমন – খোপাকে কাপড় দাও।)

(খ) সন্তমী বা এ বিভক্তি : সৎপাত্রে কল্যা দান কর। সমিতিতে টাঁদা দাও। ‘অন্ধজনে দেহ আলো’।

জ্ঞাতব্য : নিমিত্তার্থে ‘কে’ বিভক্তি যুক্ত হলে সেখানে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন-‘বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল।’

অপাদান কারক

যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রাস্কিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয়, তাকেই অপাদান কারক বলে। যেমন-

বিচ্যুত : গাহ থেকে পাতা পড়ে।
মেঘ থেকে বৃক্ষ পড়ে।

গৃহীত : সুস্তি থেকে মুক্তো মেলে।
দুখ থেকে দই হয়।

জাত : জমি থেকে ফসল পাই।
খেজুর রাসে গুড় হয়।

বিরত : পাপে বিরত হও।

দূরীভূত : দেশ থেকে পঙ্গাগাল চলে গেছে।

রাস্কিত : বিপদ থেকে বাঁচাও।

আরম্ভ : সোমবার থেকে পরীক্ষা শুরু।

ভীত : বাঘকে তয় পায় না কে?

অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তি ছাড়াও হইতে, হতে, থেকে, দিয়া, দিয়ে ইত্যাদি অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়।

অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ

(ক) প্রথমা বা শূন্য বা অ বিভক্তি : বৌটা-আলগা ফল গাছে থাকে না।’
‘মনে পড়ে সেই জৈষ্ঠ দুপুরে পাঠশালা পলায়ন।’

(খ) দ্বিতীয়া বা কে বিভক্তি : বাবাকে বড় তয় পাই।

(গ) ষষ্ঠী বা এর বিভক্তি : যেখানে বাঘের তয় সেখানে সম্মে হয়।

(ঘ) সন্তমী বা এ বিভক্তি : বিপদে মোরে করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা।
লোকমুখে শুনেছি। তিলে তৈল হয়।

য় বিভক্তি : টাকায় টাকা হয়।

বিভিন্ন অর্থে অপাদনের ব্যবহার

- (ক) স্থানবাচক : তিনি চট্টগ্রাম থেকে এসেছেন।
- (খ) দূরত্বজ্ঞপক : ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম দুশো কিলোমিটারেরও বেশি।
- (গ) নিষ্কেপ : বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়েছে।

অধিকরণ কারক

ক্রিয়া সম্পাদনের কাল (সময়) এবং আধারকে অধিকরণ কারক বলে। অধিকরণ কারকে সম্মত অর্থাৎ ‘এ’ ‘য়’ ‘তে’ ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা-

- আধার (স্থান) : আমরা রোজ স্কুলে যাই। এ বাড়িতে কেউ নেই।
- কাল (সময়) : প্রভাতে সূর্য ওঠে।
- অধিকরণ তিনি প্রকার : ১. কালাধিকরণ।
২. আধারাধিকরণ।
৩. ভাবাধিকরণ।

যদি কোনো ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অন্য ক্রিয়ার কোনোরূপ ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে, তবে তাকে ভাবাধিকরণ বলে। ভাবাধিকরণে সর্বদাই সম্মত বিভক্তির প্রয়োগ হয় বলে একে ভাবে সম্মত বলা হয়। যেমন –

সূর্যোদয়ে অন্ধকার দ্রৌপদৃত হয়। কানুন শোক মন্দীভূত হয়।

আধারাধিকরণ তিনি ভাগে বিভক্ত : ১. ঐকদেশিক, ২. অভিব্যাপক এবং ৩. বৈষয়িক।

১. ঐকদেশিক : বিশাল স্থানের যে কোনো অংশে ক্রিয়া সংঘটিত হলে তাকে ঐকদেশিক আধারাধিকরণ বলে। যেমন –

পুরুরে মাছ আছে। (পুরুরের যে কোনো একস্থানে)

বনে বাঘ আছে। (বনের যে কোনো এক অংশে)

আকাশে চাঁদ উঠেছে। (আকাশের কোনো এক অংশে)

সামীপ্য অর্থেও ঐকদেশিক অধিকরণ হয়। যেমন –

ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে (ঘাটের কাছে)। দূয়ারে দাঁড়ায়ে প্রার্থী,

ভিক্ষা দেহ তারে (দূয়ারের কাছে), রাজার দূয়ারে হাতি বাঁধা।

২. অভিব্যাপক : উদ্দিষ্ট বস্তু যদি সমগ্র আধার ব্যাপ্ত করে বিরাজমান থাকে, তবে তাকে অভিব্যাপক আধারাধিকরণ বলে। যেমন –

তিলে তৈল আছে। (তিলের সারা অংশব্যাপী)

নদীতে পানি আছে। (নদীর সমস্ত অংশ ব্যাপ্ত করে।)

৩. বৈষম্যিক : বিষয় বিশেষে বা কোনো বিশেষ গুণে কারণে কোনো দক্ষতা বা ক্ষমতা থাকলে সেখানে বৈষম্যিক অধিকরণ হয়। যেমন : রাকিব অজ্ঞে কাঁচা, কিন্তু ব্যাকরণে ভালো।

আমাদের সেনারা সাহসে দুর্জয়, মুল্দে অপরাজেয়।

অধিকরণ কারকে অন্যান্য বিভক্তি

- (ক) প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি : আমি ঢাকা যাব। বাৰা বাড়ি নেই।
- (খ) তৃতীয়া বিভক্তি : খিলিপান (এর ভিতরে) দিয়ে ওষুধ থাবে।
- (গ) পদ্ধতিমী বিভক্তি : বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়।
- (ঘ) সম্ভবী বা তে বিভক্তি : এ বাড়িতে কেউ নেই।

অধিকরণে অনুসর্ণের ব্যবহার

ঘরের মধ্যে কে রে ? তোমার আসন পাতিব হাটের মাঝে।

পরিশিষ্ট

১. বিভিন্ন কারকে শূন্য বিভক্তি

- (ক) কর্তৃকারকে — রহিম বাড়ি যায়।
- (খ) কর্মকারকে — ডাঙ্কাই ডাক।
- (গ) করণে — ঘোড়াকে চাবুক মার।
- (ঘ) অপাদানে — গাড়ি স্টেশন ছাড়।
- (ঙ) অধিকরণে — সারারাত বৃক্ষ হয়েছে।

২. বিভিন্ন কারকে সম্ভবী বা এ বিভক্তি

- (ক) কর্তৃকারকে — লোকে বলে। পাগলে কী না বলে।
- (খ) কর্মকারকে — এ অধীনে দায়িত্বার অর্পণ করুন।
- (গ) করণে — এ কলমে ভালো লেখা হয়।
- (ঘ) অপাদানে — ‘আমি কি ডরাই সখি ভিখারি রাখবে?’
- (ঙ) অধিকরণে — এ দেহে প্রাণ নেই।

সম্পর্ক পদ

ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে যে নামপদ ব্যক্তিস্থিত অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে সম্পর্ক পদ বলে। যেমন— মতিনের ভাই বাড়ি যাবে।

এখানে ‘মতিনের’ সঙ্গে ‘ভাই’—এর সম্পর্ক আছে, কিন্তু ‘যাবে’ ক্রিয়ার সাথে সম্বন্ধ নেই।

জ্ঞাতব্য : ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ পদের সম্বন্ধ নেই বলে সম্বন্ধ পদকে কারক বলা হয় না।

সম্বন্ধ পদের বিভক্তি

(ক) সম্বন্ধ পদে ‘র’ বা ‘এর’ বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে। যথা : আমি + র = আমার (ভাই), খালিদ + এর = খালিদের (বই)।

(খ) সময়বাচক অর্থে সম্বন্ধ পদে কার > কের বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা—

আজি + কার = আজিকার > আজকের (কাগজ)। পূর্বে + কার = পূর্বেকার (ঘটনা)

কালি + কার = কালিকার > কালকার > কালকের (ছেলে)।

কিন্তু ‘কাল’ শব্দের উভয় শুধু ‘এর’ বিভক্তিই যুক্ত হয়। যেমন : কাল + এর = কালের। বাক্য : সে কত কালের কথা।

সম্বন্ধ পদের প্রকারভেদ

সম্বন্ধ পদ বহু প্রকারের হতে পারে। যেমন—

(ক) অধিকার সম্বন্ধ	:	রাজাৱ রাজ্য, প্ৰজাৱ জমি।
(খ) জন্ম-জনক সম্বন্ধ	:	গাছেৱ ফল, পুকুৱেৱ মাছ।
(গ) কাৰ্য্যকাৱণ সম্বন্ধ	:	অগ্ৰিৱ উভাপ, ৱোগেৱ কফ।
(ঘ) উপাদান সম্বন্ধ	:	বৃগুৱ থা঳া, সোনাৱ বাটি।
(ঙ) গুণ সম্বন্ধ	:	মধুৱ মিষ্টতা, নিমেৱ তিক্ততা।
(চ) হেতু সম্বন্ধ	:	ধনেৱ অহংকাৱ, বৃগুৱ দেমাক।
(ছ) ব্যাপ্তি সম্বন্ধ	:	ঝোজাৱ ছুটি, শ্ৰবণেৱ আকাশ।
(জ) ক্রম সম্বন্ধ	:	পাঁচেৱ পৃষ্ঠা, সাতেৱ ঘৰ।
(ঝ) অংশ সম্বন্ধ	:	হাতিৱ দৌত, মাথাৱ চুল।
(ঝঃ) ব্যবসায় সম্বন্ধ	:	পাটেৱ গুদাম, আদাৱ ব্যাপারি।
(ট) ভগ্নাংশ সম্বন্ধ	:	একেৱ তিন, সাতেৱ পাঁচ।
(ঠ) কৃতি সম্বন্ধ	:	নজুলেৱ ‘অগ্ৰিবীণা’ মাইকেলেৱ ‘মেঘনাদবধ কাৰ্য্য’।
(ড) আধাৱ-আধেয়	:	বাটিৱ দুধ, শিশিৱ ওষুধ।
(ঢ) অভেদ সম্বন্ধ	:	জ্ঞানেৱ আলোক, দৃঢ়খেৱ দহন।

- (গ) উপমান-উপমেয় সম্বন্ধ : ননীর পুতুল, লোহার শরীর।
- (ত) বিশেষণ সম্বন্ধ : সুখের দিন, ঘোবনের চাষজ্ঞ।
- (থ) নির্ধারণ সম্বন্ধ : সবার সেরা, সবার ছেট।
- (দ) কারক সম্বন্ধ : (১) কর্তৃ সম্বন্ধ — গ্রাজার হুকুম।
(২) কর্ম সম্বন্ধ — প্রতুর সেবা, সাধুর দর্শন।
(৩) করণ সম্বন্ধ — চোখের দেখা, হাতের লাঠি।
(৪) অপাদান সম্বন্ধ — বাবের তয়, বৃক্ষের পানি।
(৫) অধিকরণ সম্বন্ধ — ক্ষেতের ধান, দেশের লোক।

সম্বোধন পদ

‘সম্বোধন’ শব্দটির অর্থ আহবান। যাকে সম্বোধন বা আহবান করে কিছু বলা হয়, তাকে সম্বোধন পদ বলে। যেমন— ওহে মাঝি, আমাকে পার করো। সুমন, এখানে এসো।

আভব্য : সম্বোধন পদ বাক্যের অংশ। কিন্তু বাক্যস্থিতি ক্রিয়াপদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না বলে সম্বোধন পদ কারক নয়।

- অনেক সময় সম্বোধন পদের পূর্বে ওগো, ওরে, হে, ওগো, অয়ি প্রভৃতি অব্যয়বাচক শব্দ বসে সম্বোধনের সূচনা করে। যেমন— ‘ওগো, তোরা জয়ধ্বনি কর।’ ‘ওরে, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।’ ‘অয়ি নিরমল উষা, কে তোমাকে নিরমিল?’
- অনেক সময় সম্বন্ধসূচক অব্যয়টি কেবল সম্বোধন পদের কাজ করে থাকে।
- সম্বোধন পদের পরে অনেক বিস্যসূচক চিহ্ন দেওয়া হয়। এই ধরনের বিস্যসূচক চিহ্নকে সম্বোধন চিহ্ন বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু আধুনিক নিয়মে সম্বোধন চিহ্ন স্থানে কমা (,) চিহ্নের প্রয়োগই বেশি হয়। যেমন— ওরে খোকা, যাবার সময়ে একটা কথা শুনে যাস।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেক প্রশ্নের চারাটি করে উভয় দেওয়া হয়েছে। সর্বোত্তম উভয়টিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

(১) কেন বাক্যে ব্যতিহার কর্তা রয়েছে?

ক. মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন

গ. বাবে-মহিমে খানা একঘাটে খাবে না

খ. রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে

ঘ. তোমাকে পড়তে হবে

(২) কোন বাক্যটিতে কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি হয়েছে?

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| ক. শিক্ষক মহোদয় ছাত্রকে পড়াচ্ছেন | গ. তারা বল খেলে |
| খ. ডাক্তার ডাক | ঘ. আমি ঢাকা যাচ্ছি |

(৩) কোন বাক্যটিতে নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তির প্রয়োগ দেখানো হয়েছে?

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| ক. তেলাপোকাকে তয় পাই | গ. ভিক্ষুককে দান কর |
| খ. তাকে ডেকে আন | ঘ. ‘বেলা যে পড়ে এল জলকে চল’ |

(৪) কোন বাক্যে ভাবে স্মৃতি-র প্রয়োগ রয়েছে?

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| ক. সূর্যস্তে চারদিক অন্ধকারে আবৃত হয় | গ. ‘বিপদে মোরে রক্ষা কর’ |
| খ. গোকে কত কথা বলে | ঘ. ‘অন্ধজনে দেহ আলো’ |

(৫) কোন বাক্যে করণ কারকে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে?

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| ক. আমি স্কুলে যাচ্ছি | গ. ছেলেরা মাঠে বল খেলে |
| খ. সে ঢাকা যাবে | ঘ. তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাক |

(৬) কোন বাক্যে ভাববাচ্যের কর্তার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে?

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| ক. সে গ্রামে যাবে | গ. ছুটি হলে ঘন্টা বাজে |
| খ. তাকে গ্রামে যেতে হবে | ঘ. আমার যাওয়া হবে না |

(৭) কোন বাক্যে বিধেয় কর্ম রয়েছে?

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| ক. তাকে আমরা চিনি না | গ. ‘জিজ্ঞাসিব জনে জনে’ |
| খ. ‘দুধকে আমরা দুগ্ধ বলি’ | ঘ. লাঙল ধারা জমি চাষ করা হয় |

(৮) কোন বাক্যে কর্তায় এ-বিভক্তির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে?

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| ক. পাগলে কী না বলে | গ. ফুলে ফুলে বাগান ভরেছে |
| খ. বনে বাঘ আছে | ঘ. ‘অন্ধজনে দেহ আলো’ |

২। কারক বলতে কী বোঝ? কারক নির্বাচনে শব্দ বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা কী? উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

৩। বাংলা শব্দ বিভক্তিগুলোর নাম লেখ এবং বচন অনুসারে তাদের সাজাও।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর।

- ক. অপ্রাপ্তি বা ইতর প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে ----- বিভক্তি যুক্ত হয় না।
- খ. স্বরাস্ত শব্দের উভয়ের ‘এ’ বিভক্তির রূপ হয় ‘য়’ অথবা -----।
- গ. বাংলা শব্দে, অ, আ এবং এ-কারাস্ত শব্দে বষ্টীর এক বচনে শুধু ‘র’ যুক্ত হয়, --- যুক্ত হয় না।

৫। সহজ লেখ এবং উদাহরণ দাও।

- (ক) প্রযোজক কর্তা (খ) কর্ম-কর্তৃবাচ্যের কর্তা (গ) বিধেয় কর্ম (ঘ) ভাবে সম্পত্তী
- (ঙ) গৌণ কর্ম (চ) অভিব্যাপক অধিকরণ (ছ) নামধাতুজ কর্মকারক।

৬। নিম্নলিখিত বাক্যসমূহের মোটা অক্ষরে লিখিত পদগুলোর কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর।

- (১) আজ আর আমার যাওয়া হবে না।
- (২) গোয়ালা গুরু দোহন করে।
- (৩) নিজের চেক্টায় বড় হও।
- (৪) শিকারি বিড়াল গৌফে চেনা যায়।
- (৫) বাবাকে বড় ভয় পাই।
- (৬) বোঁটা-আলগা ফল গাছে থাকে না।
- (৭) লোকটা কান্নায় ভেজো পড়ল।

৭। বাক্যে উদাহরণ দাও।

- (ক) অপাদান কারকে শূন্য বিভক্তি
- (খ) অপাদান কারকে ‘এ’ বিভক্তি
- (গ) করণ কারকে ‘তে’ বিভক্তি
- (ঘ) কর্তৃকারকে ‘তে’ বিভক্তি

৮। বিভিন্ন কারকে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ দেখিয়ে বাক্য গঠন কর।

৯। সম্বন্ধ পদকে কারক বলা যায় কিনা, উদাহরণসহ বুঝিয়ে লেখ।

১০। খাটি বাংলা সম্বোধন পদের ব্যবহার দেখিয়ে দুটি বাক্য রচনা কর।

১১। বিভিন্ন কারকে সম্পত্তী বিভক্তির ব্যবহার দেখাও।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দ

বাংলা ভাষায় যে অব্যয় শব্দগুলো কখনো স্বাধীন পদ রূপে, আবার কখনো শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে, সেগুলোকে অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলে।

অনুসর্গগুলো কখনো প্রাতিপদিকের পরে ব্যবহৃত হয়, আবার কখনো বা ‘কে’ এবং ‘র’ বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে বসে। যেমন—

বিনা : দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে? (প্রাতিপদিকের পরে)

সনে : ময়ূরীর সনে নাচিছে ময়ূর। (ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে)

দিয়ে : তোমাকে দিয়ে আমার চলবে না। (দ্বিতীয়ার ‘কে’ বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে)

বাংলা ভাষায় বহু অনুসর্গ আছে। যেমন—

প্রতি, বিনা, বিহনে, সহ, উপর, অবধি, হেতু, মধ্যে, মাঝে, পরে, তিন্ন, বই, ব্যতীত, জন্যে, জন্য, পর্যন্ত অপেক্ষা, সহকারে, তরে, পানে, নামে, মতো, নিকট, অধিক, পক্ষে, ঘারা, দিয়া, দিয়ে, কর্তৃক, সঙ্গে, হইতে, হতে, খেকে, চেয়ে, পাছে, ভিতর, ভেতর ইত্যাদি।

এদের মধ্যে ঘারা, দিয়া (দিয়ে), কর্তৃক, হইতে (হতে), চেয়ে, অপেক্ষা, মধ্যে প্রভৃতি কয়েকটি অনুসর্গ বিভক্তিগুলো ব্যবহৃত হয়। কারুক প্রকরণে এদের উদাহরণ সন্তুষ্টিপূর্ণ হয়েছে।

অনুসর্গের প্রয়োগ

- | | | |
|----|-------------|---|
| ১. | বিনা/বিনে : | কর্তৃ কারকের সঙ্গে – তুমি বিনা (বিনে) আমার কে আছে? |
| | বিনি : | করণ কারকের সঙ্গে – বিনি সুতায় গাঁথা মালা। |
| | বিহনে : | উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ? |
| ২. | সহ : | সহগামিতা অর্থে – তিনি পুত্রসহ উপস্থিত হলেন। |
| | সহিত : | সমসূত্রে অর্থে – শত্রুর সহিত সম্পর্ক চাই না। |
| | সনে : | বিরুদ্ধগামিতা অর্থে – ‘দশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গা যুবে ভূজঙ্গা সনে।’ |
| | সঙ্গে : | তুলনায় – মায়ের সঙ্গে এ মেয়ের তুলনা হয় না। |
| ৩. | অবধি : | পর্যন্ত অর্থে – সম্ভ্যা অবধি অপেক্ষা করব। |
| ৪. | পরে : | স্বল্প বিরতি অর্থে – এ ঘটনার পরে আর এখানে থাকা চলে না। |
| | পর : | দীর্ঘ বিরতি অর্থে – শরতের পরে আসে বসন্ত। |

৫. পানে : প্রতি, দিকে অর্থে – ঐ তো ঘর পানে ছুটেছেন।
 ‘শুধু তোমার মুখের পানে চাহি বাহির হনু।’
৬. মতো : ন্যায় অর্থে – বেকুবের মতো কাজ করো না।
 তরে : মত অর্থে – এ জন্মের তরে বিদ্যায় নিশাম।
৭. পক্ষে : সক্ষমতা অর্থে – রাজার পক্ষে সব কিছুই সম্ভব।
 সহায় অর্থে – আসামির পক্ষে উকিল কে?
৮. মাঝে : মধ্যে অর্থে – ‘সীমার মাঝে অসীম তুমি’।
 একদেশিক অর্থে – এ দেশের মাঝে একদিন সব ছিল।
 ক্ষণকাল অর্থে – নিমেষ মাঝেই সব শেষ।
- মাঝারে : ব্যাস্তি অর্থে – ‘আছ তুমি প্রভু, জগৎ মাঝারে।’
৯. কাছে : নিকটে অর্থে – আমার কাছে আর কে আসবে?
 কর্মকারকে ‘কে’ বোঝাতে – ‘রাখাল শুধায় আসি ত্রাঙ্গণের কাছে।’
১০. প্রতি : প্রত্যেক অর্থে – ঘণ্টাত্তি পাঁচ টাকা লাভ দেব।
 দিকে বা ওপর অর্থে – ‘নিদারূণ তিনি অতি অতি, নাহি দয়া তব প্রতি।’
১১. হেতু : নিমিস্ত অর্থে – ‘কী হেতু এসেছ তুমি, কহ বিস্তারিয়া।’
 জন্মে : নিমিস্ত অর্থে – ‘এ ধন-সম্পদ তোমার জন্মে।’
 সহকারে : সঙ্গে অর্থে – আগ্রহ সহকারে কহিলেন।
 বশত : কারণে অর্থে – দুর্ভাগ্যবশত সভায় উপস্থিত হতে পারিনি।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেক প্রশ্নের চারটি উত্তরের সর্বোন্নমটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

(১) অনুসর্গ সাধারণত কোথায় বসে?

ক. শব্দের পূর্বে

গ. শব্দের মধ্যে

খ. শব্দের পরে

ঘ. বাক্যের শেষে

(২) অনুসর্গ কী?

ক. শব্দ-বিভক্তি গ. উপসর্গ

খ. ক্রিয়া-বিভক্তি ঘ. অব্যয়

(৩) ‘শরতের পর আসে বসন্ত’। এখানে ‘পর’ অনুসর্গটি কী অর্থ প্রকাশ করছে?

ক. দীর্ঘ বিরতি গ. বিরতি

খ. অল্প বিরতি ঘ. নৈকট্য

(৪) ‘কী হেতু এসেছ তুমি, কহ বিস্তারিয়া।’—‘হেতু’ অনুসর্গটি কী অর্থ প্রকাশ করেছে?

ক. ব্যাপার গ. নিমিস্ত

খ. প্রার্থনা ঘ. প্রসঙ্গ

(৫) এ দেশের মাঝে এক দিন সব ছিল। এখানে ‘মাঝে’—অনুসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. সর্বত্র গ. মধ্যে

খ. একদেশিক ঘ. ব্যাপ্তি

(৬) তোমার তরে এনেছি মালা গৌড়িয়া।—এখানে ‘তরে’ শব্দটি কী অর্থ প্রকাশ করছে?

ক. মত গ. মধ্যে

খ. নিকট ঘ. নিমিস্ত

(৭) ‘দংশনক্ষত শ্যেন বিহজ্ঞা যুথে ভুজজ্ঞা সনে।’—এখানে ‘সনে’ শব্দটি কী অর্থ প্রকাশ করছে?

ক. বিরুদ্ধগামিতা গ. প্রতি

খ. সঙ্গে ঘ. হেতু

(৮) ‘বিনে স্বদেশী ভাষা, মিটে কি আশা’।—এখানে ‘বিনে’ কী অর্থ প্রকাশ করছে?

ক. সঙ্গে গ. ব্যতিরেকে

খ. প্রয়োজন ঘ. আবশ্যিকতা

(৯) ‘আছ তুমি প্রভু, জগৎ মাঝারে।’—এখানে ‘মাঝারে’ শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. বাইরে গ. মধ্যে

খ. ব্যাপ্তি ঘ. সঙ্গে

(১০) অনুসর্গ কী করে ?

ক. বিভক্তির কাজ করে

গ. শব্দের অর্থ সংষ্টিত করে

খ. শব্দের অর্থের পরিবর্তন করে

ঘ. বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে

২। অনুসর্গ বলতে কী বোঝ ? বাংলা ভাষায় অনুসর্গের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে বল।

৩। অনুসর্গ এবং থাটি বাংলা শব্দ বিভক্তির পার্থক্য উদাহরণসহ নির্দেশ কর।

৪। বাংলা ভাষায় কোন কোন অনুসর্গ কারক-বিভক্তি বূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ?

নিম্নলিখিত বাক্যসমূহে স্থূলাক্ষরে লিখিত অনুসর্গগুলো যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা প্রতিটি বাক্যের ডান
দিকে লেখ।

(ক) শরতের পর আসে হেমন্ত।

(খ) বেকুবের মতো বলেছ।

(গ) গরিবের পক্ষে কথা বলার লোক নেই।

(ঘ) সম্ম্যাঞ্চ অবধি অপেক্ষা করব।

(ঙ) মায়ের কাছে কথাটি শুধাব।

(চ) ‘নিমেষ তরে ইচ্ছা করে বিরাট উল্লাসে।

সকল টুটে যাইতে ছুটে জীবন উচ্ছ্বাসে।

(ছ) শুর সনে আমার আড়ি।

(জ) মণ প্রতি যত তঙ্কা হইবেক দয়।

(ঝঝ) ‘সকলের তরে সকলে আমরা,

প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।’

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাক্য প্রকরণ

যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে।

কতগুলো পদের সমষ্টিতে বাক্য গঠিত হলেও যে কোনো পদসমষ্টিই বাক্য নয়। বাক্যের বিভিন্ন পদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বা অন্য থাকা আবশ্যিক। এ ছাড়াও বাক্যের অঙ্গগত বিভিন্ন পদ দ্বারা মিলিতভাবে একটি অধিক ভাব পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন, তবেই তা বাক্য হবে।

তামার বিচারে বাক্যের নিম্নলিখিত তিনটি গুণ থাকা চাই। যেমন –

- (১) আকাঙ্ক্ষা (২) আসন্তি এবং (৩) যোগ্যতা

১. আকাঙ্ক্ষা : বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে ঘোষার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তা-ই আকাঙ্ক্ষা। যেমন – ‘চন্দ্ৰ পৃথিবীৰ চারদিকে’- এটুকু বললে বাক্যটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে না, আরও কিছু ইচ্ছা থাকে। বাক্যটি এভাবে পূর্ণাঙ্গ করা যায় : চন্দ্ৰ পৃথিবীৰ চারদিকে ঘোৱে। এখানে আকাঙ্ক্ষার নিম্নলিখিত হয়েছে বলে এটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

২. আসন্তি : মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যে শব্দগুলো এমনভাবে পর পর সাজাতে হবে যাতে মনোভাব প্রকাশ বাধায়াস্ত না হয়। বাক্যের অর্থসজ্ঞাতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই আসন্তি। যেমন –

কাল বিতরণী হবে উৎসব স্কুলে আমাদের পুরস্কার অনুষ্ঠিত। সেখা হওয়াতে পদ সন্নিবেশ ঠিকভাবে না হওয়ায় শব্দগুলোর অন্তর্নিহিত ভাবটি যথাযথ প্রকাশিত হয়নি। তাই এটি একটি বাক্য হয়নি। মনোভাব পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করার জন্য পদগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে। যেমন –

কাল আমাদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বাক্যটি আসন্তিসম্পন্ন।

৩. যোগ্যতা : বাক্যস্থিত পদসমূহের অঙ্গগত এবং ভাবগত মিলবন্ধনের নাম যোগ্যতা। যেমন – বর্ষার বৃক্ষিতে প্রাবনের সৃষ্টি হয়। – এটি একটি যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য। কারণ, বাক্যটিতে পদসমূহের অর্থগত এবং ভাবগত সমন্বয় রয়েছে।

কিন্তু ‘বর্ষার রৌদ্র প্রাবনের সৃষ্টি করে।’ – বললে বাক্যটি ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা হারাবে। কারণ, রৌদ্র প্রাবন সৃষ্টি করে না।

শব্দের যোগ্যতার সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জড়িত থাকে

(ক) গীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা : প্রকৃতি-প্রত্যয়জ্ঞাত অর্থে শব্দ সর্বদা ব্যবহৃত হয়। যোগ্যতার দিক থেকে গীতিসিদ্ধ অর্থের প্রতি লক্ষ রেখে কতগুলো শব্দ ব্যবহার করতে হয়। যেমন –

শব্দ	মীতিসিদ্ধ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রকৃতি + প্রত্যয়জাত অর্থ
১. বাধিত	অনুগ্রহীত বা কৃতজ্ঞ	বাধ + ইত	বাধপ্রাপ্ত
২. তিলে	তিল জাতীয় বিশেষ কোনো শব্দের রস	তিল + ক	তিলজাত মেহ পদার্থ

(ধ) দুর্বোধ্যতা : অপ্রচলিত, দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যের যোগ্যতা বিনষ্ট হয়। যেমন – ভূমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছে। (চাতুরী বা মারা অর্থে, কিন্তু বাংলা ‘প্রপঞ্চ’ শব্দটি অপ্রচলিত)।

(গ) উপমার ভূল প্রয়োগ : ঠিকভাবে উপমা অলংকার ব্যবহার না করলে যোগ্যতার হানি ঘটে। যেমন – আমার হৃদয়–মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হলো। বীজ ক্ষেত্রে বপন করা হয়, মন্দিরে নয়। কাজেই বাক্যটি ইওয়া উচিত : আমার হৃদয়–ক্ষেত্রে আশার বীজ উপ্ত হলো।

(ঘ) বাহুল্য–দোষ : প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারে বাহুল্য দোষ ঘটে এবং এর ফলে শব্দ তার যোগ্যতাগুণ হারিয়ে থাকে। যেমন –

দেশের সব আলেমগণই এ ব্যাপারে আমাদের সমর্থন দান করেন। ‘আলেমগণ’ বহু বচনবাচক শব্দ। এর সঙ্গে ‘সব’ শব্দটির অতিরিক্ত ব্যবহার বাহুল্য–দোষ সৃষ্টি করেছে।

(ঙ) বাগধারার শব্দ পরিবর্তন : বাগধারা ভাষাবিশেষের ঐতিহ্য। এর যথেষ্ট পরিবর্তন করলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। যেমন – ‘অরণ্যে রোদন’ (অর্থ : নিষ্কল আবেদন)-এর পরিবর্তে যদি বলা হয়।, ‘বনে ত্রুদন’ তবে বাগধারাটি তার যোগ্যতা হারাবে।

(চ) গুরুচন্দলী দোষ : তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ কখনো কখনো গুরুচন্দলী দোষ সৃষ্টি করে। এ দোষে দুষ্ট শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। ‘গুরুর গাঢ়ি’, ‘শবদাহ’, ‘মড়াপোড়া’ প্রকৃতি স্থলে যথাক্রমে ‘গুরুর শকট’, ‘শবপোড়া’, ‘মড়াদাহ’ প্রকৃতির ব্যবহার গুরুচন্দলী দোষ সৃষ্টি করে।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

প্রতিটি বাক্যে দুটি অর্থ থাকে : উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

বাক্যের যে অংশে কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়, তাকে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়, তাকে বিধেয় বলে। যেমন –

খোকা এখন (উদ্দেশ্য)	বই পড়ছে
	(বিধেয়)

বিশেষ বা বিশেষস্থানীয় অন্যান্য পদ বা পদসমষ্টিযোগে গঠিত বাক্যাংশও বাক্যের উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন –

সৎ লোকেরাই প্রকৃত সুষী।	- বিশেষযুপে ব্যবহৃত বিশেষণ।
মিথ্যা কথা বলা খুবই অন্যায়।	- ক্রিয়াজাত বাক্যাংশ।

উদ্দেশ্যের প্রকারভেদ

- একটিমাত্র পদবিশিষ্ট কর্তৃপদকে সরল উদ্দেশ্য বলে।
- উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিশেষণাদি যুক্ত থাকলে তাকে সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য বলে।

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ:	সম্প্রসারণ	উদ্দেশ্য	বিধেয়
১. বিশেষণ যোগে-	কৃত্যাত	দস্যদল	ধরা পড়েছে।
২. সম্বন্ধ পদযোগে-	হাসিমের	ভাই	এসেছে।
৩. সমার্থক বাক্যাংশ যোগে-	যারা অত্যন্ত পরিশ্রমী,	ভারাই	উন্নতি করে।
৪. অসমাপিকা ক্রিয়াবিশেষণ যোগে-	চাঁচুকার পরিবৃত হয়েই	বড় সাহেব	থাকেন।
৫. বিশেষণ স্থানীয় বাক্যাংশ যোগে-	যার কথা তোমরা বলে থাক,	তিনি	এসেছেন।
বিধেয়ের সম্প্রসারণ:	উদ্দেশ্য	সম্প্রসারণ	বিধেয়
১. ক্রিয়া বিশেষণ যোগে-	যোড়া	দ্রুত	চলে।
২. ক্রিয়া বিশেষণীয় যোগে-	জেট বিমান	অতিশয় দ্রুত	চলে।
৩. কারকাদি যোগে-	ভূবনের	ঘাটে ঘাটে	ভাসিছে।
৪. ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় বাক্যাংশ যোগে-	তিনি	যে ভাবেই হোক	আসবেন।
৫. বিধেয় বিশেষণ যোগে-	ইনি	আমার বিশেব	অন্তরঙ্গ কর্মু (হন)।

গঠন অনুযায়ী বাক্যের প্রকারভেদ

বাক্য তিনি প্রকার : (১) সরল বাক্য, (২) মিশ্র বা জটিল বাক্য, (৩) যৌগিক বাক্য।

১. সরল বাক্য : যে বাক্যে একটিমাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যথা – পুরুরে পদ্ধত্যুল জন্মে। এখানে ‘পদ্ধত্যুল’ উদ্দেশ্য এবং ‘জন্মে’ বিধেয়।

এ রূপক : বৃটি হচ্ছে। তোমরা বাড়ি যাও। যোক আজ সকালে স্কুলে গিয়েছে। স্নেহময়ী জননী (উদ্দেশ্য) স্বীয় সন্তানকে প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসেন (বিধেয়)। বিশ্ববিদ্যালয় মহাকবিরা (উদ্দেশ্য) ঐশ্বর্জালিক শক্তিসম্পন্ন লেখনী দ্বারা অমরতার সঙ্গীত রচনা করেন (বিধেয়)।

২. মিশ্র বা জটিল বাক্য : যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষে তাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যথা—

আশ্রিত বাক্য	প্রধান খণ্ডবাক্য
১. যে পরিশ্রম করে,	সে-ই সুখ লাভ করে।
২. সে যে অপরাধ করেছে,	তা মুখ দেখেই বুঝেছি।

আশ্রিত খণ্ডবাক্য তিনি প্রকার : (ক) বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য, (খ) বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য, (গ) ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য।

ক. বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খঙ্গবাক্য (Noun clause) : যে আশ্রিত খঙ্গবাক্য (Subordinate clause) প্রধান খঙ্গবাক্যের যে কোনো পদের আশ্রিত থেকে বিশেষ্যের কাজ করে, তাকে বিশেষ্যস্থানীয় আশ্রিত খঙ্গবাক্য বলে। যথা :

—আমি মাঠে গিয়ে দেখলাম, খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। (বিশেষ্য স্থানীয় খঙ্গবাক্য ক্রিয়ার কর্মরূপে ব্যবহৃত)

তদুপ : তিনি বাড়ি আছেন কি না, আমি জানি না। ব্যাপারটি নিয়ে ঘাটাঘাটি করলে ফল তালো হবে না।

(খ) বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খঙ্গবাক্য (Adjective clause) : যে আশ্রিত খঙ্গবাক্য প্রধান খঙ্গবাক্যের অন্তর্গত কোনো বিশেষ্য বা সর্বনামের দোষ, গুণ এবং অবস্থা প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খঙ্গবাক্য বলে। যথা :

—লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই। (আশ্রিত বাক্যটি ‘সেই’ সর্বনামের অবস্থা প্রকাশ করছে)।

তদুপ : ‘ঝাটি সোনার চাইতে ঝাটি, আমার দেশের মাটি’।

‘ধনখাল্য পুঁক্ষে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা।’

যে এ সভায় অনুগস্তিত, সে বড় দুর্ভাগ।

গ) ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় খঙ্গবাক্য (Adverbial clause) : যে আশ্রিত খঙ্গবাক্য ক্রিয়াপদের স্থান, কাল ও কারণ নির্দেশক অর্থে ব্যবহৃত হয় তাকে ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খঙ্গবাক্য বলে। যেমন —

‘যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে।’

তুমি আসবে বলে আমি অপেক্ষা করছি।

যেখানে আকাশ আর সমুদ্র একাকার হয়ে গেছে, সেখানেই দিকচক্রবাল।

৩. যৌগিক বাক্য : পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে।

জ্ঞাতব্য : যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত নিরপেক্ষ বাক্যগুলো এবং, ও, কিন্তু, অথবা, অথচ, কিংবা, বরং, তথাপি প্রভৃতি অব্যয় যোগে সংযুক্ত বা সমন্বিত থাকে। যেমন —

নেতা জনগণকে উৎসাহিত করলেন বটে, কিন্তু, কোনো পথ দেখাতে পারলেন না।

বস্ত্র মশিন কেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে সে ধোপাকে গালি পাড়ে, অথচ ধোত বস্ত্রে তাহার গৃহ পরিপূর্ণ।

উদয়াস্ত পরিশ্রম করব, তথাপি অন্যের ধারস্থ হব না।

বাক্য রূপান্তর

অর্থের কোনোরূপ রূপান্তর না করে এক প্রকারের বাক্যকে অন্য প্রকার বাক্যে রূপান্তর করার নামই বাক্য রূপান্তর।

ক. সরল বাক্যকে মিশ্র বাক্যে রূপান্তর

সরল বাক্যকে মিশ্র বাক্যে পরিণত করতে হলে সরল বাক্যের কোনো অংশকে খণ্ডবাক্যে পরিণত করতে হয় এবং উভয়ের সংযোগ বিধানে সম্মতসূচক (যদি, তবে, যে, সে প্রভৃতি) পদের সাহার্যে উক্ত খণ্ডবাক্য ও প্রধান বাক্যটিকে পরস্পর সাপেক্ষ করতে হয়। যথা :

১. সরল বাক্য : তালো ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।
মিশ্র বাক্য : যারা তালো ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।
২. সরল বাক্য : তার দর্শনমাত্রই আমরা প্রস্থান করলাম।
মিশ্র বাক্য : যে-ই তার দর্শন পেলাম, সে-ই আমরা প্রস্থান করলাম।
৩. সরল বাক্য : ভিক্ষুককে দান কর।
মিশ্র বাক্য : যে ভিক্ষু চায়, তাকে দান কর।

খ. মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর : মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মিশ্র বাক্যের অপ্রধান খণ্ডবাক্যটিকে সংকৃতিক করে একটি পদ বা একটি বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়। যথা :

১. মিশ্র বাক্য : যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্঵াস করবে।
সরল বাক্য : নির্বোধরা/বুদ্ধিহীনরা এ কথা বিশ্বাস করবে।
২. মিশ্র বাক্য : যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন এ খণ্ড স্মীকার করব।
সরল বাক্য : আজীবন এ খণ্ড স্মীকার করব।
৩. মিশ্র বাক্য : যে সকল পশু মাস ভোজন করে, তারা অত্যন্ত বলবান।
সরল বাক্য : মাসভোজী পশু অত্যন্ত বলবান।

গ. সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিণত করতে হলে সরল বাক্যের কোনো অংশকে নিরপেক্ষ বাক্যে রূপান্তর করতে হয়। এবং যথাসম্ভব সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয়ের প্রয়োগ করতে হয়। যেমন –

১. সরল বাক্য : তিনি আমাকে পাঁচ টাকা দিয়ে বাঢ়ি যেতে বললেন।
যৌগিক বাক্য : তিনি আমাকে পাঁচটি টাকা দিলেন এবং বাঢ়ি যেতে বললেন।
২. সরল বাক্য : পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত।
যৌগিক বাক্য : এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত, তবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে।
৩. সরল বাক্য : আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি।
যৌগিক বাক্য : আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।

ষ. ঘোগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলো

- (১) বাক্যসমূহের একটি সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রাখতে হয়।
- (২) অন্যান্য সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করতে হয়।
- (৩) অব্যয় পদ থাকলে তা বর্জন করতে হয়।
- (৪) কোনো কোনো স্থলে একটি বাক্যকে হেতুবোধক বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়। যথা :

- | | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|
| (১) ঘোগিক বাক্য | : | সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি। |
| সরল বাক্য | : | সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি। |
| (২) ঘোগিক বাক্য | : | তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বৃদ্ধি হয়নি। |
| সরল বাক্য | : | তার বয়স হলেও বৃদ্ধি হয়নি। |
| (৩) ঘোগিক বাক্য | : | মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে। |
| সরল বাক্য | : | মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে। |

ঙ. ঘোগিক বাক্যকে মিশ্র বাক্যে রূপান্তর

ঘোগিক বাক্যের অন্তর্গত পরস্পর নিরপেক্ষ বাক্য দুটির প্রথমটির পূর্বে ‘যদি’ কিংবা ‘যদিও’ এবং দ্বিতীয়টির পূর্বে ‘তাহলে’ (তাহা হইলে) কিংবা ‘তথাপি’ অব্যয়গুলো ব্যবহার করতে হয়। যেমন –

- | | | |
|-----------------|---|--|
| (১) ঘোগিক বাক্য | : | দোষ স্বীকার কর, তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না। |
| মিশ্র বাক্য | : | যদি দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না। |
| (২) ঘোগিক বাক্য | : | তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ। |
| মিশ্র বাক্য | : | যদিও তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, তথাপি তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ। |

সাপেক্ষ অব্যয়ের সাহায্যেও ঘোগিক বাক্যকে মিশ্র বাক্যে পরিবর্তন করা যায়। যথা :

- | | | |
|-------------|---|---|
| ঘোগিক বাক্য | : | এ গ্রামে একটি দরগাহ আছে, সেটি পাঠানযুগে নির্মিত হয়েছে। |
| মিশ্র বাক্য | : | এ গ্রামে যে দরগাহ আছে, সেটি পাঠানযুগে নির্মিত হয়েছে। |

চ. মিশ্রবাক্যকে ঘোগিক বাক্যে রূপান্তর

মিশ্র বাক্যকে ঘোগিক বাক্যে পরিবর্তন করতে হলে খণ্ডবাক্যগুলোকে এক একটি স্বাধীন বাক্যে পরিবর্তন করে তাদের মধ্যে সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার করতে হয়। যেমন –

- | | | |
|-----------------|---|---|
| (১) মিশ্র বাক্য | : | যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাব। |
| ঘোগিক বাক্য | : | সে কাল আসবে এবং আমি যাব। |
| (২) মিশ্র বাক্য | : | যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে। |
| ঘোগিক বাক্য | : | বিপদ এবং দুঃখ এক সময়ে আসে। |
| (৩) মিশ্র বাক্য | : | যদিও তাঁর টাকা আছে, তথাপি তিনি দান করেন না। |
| ঘোগিক বাক্য | : | তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না। |

বাক্য বিশ্লেষণ

সংজ্ঞা : বাক্যের বিভিন্ন অংশ পৃথক করে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় প্রণালীকে বাক্য বিশ্লেষণ বলে।

ক. সরল বাক্যের বিশ্লেষণ

১. মহারাজ শুদ্ধোদনের পুত্র শাক্যসিংহ যৌবনে সৎসার ত্যাগ করেন।

২. ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর (রা) দীন ইসলামের জন্য তাঁর যথার্থব্দ দান করেছিলেন।

উপরে লিখিত বাক্য দুটিকে (১) উদ্দেশ্য, (২) উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক, (৩) বিধেয়, (৪) বিধেয়ের সম্প্রসারক – এ চারটি অংশে বিশ্লেষণ করতে হবে।

বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক	উদ্দেশ্য	বিধেয়ের সম্প্রসারক	বিধেয়
(১) মহারাজ শুদ্ধোদনের পুত্র	শাক্যসিংহ	যৌবনে সৎসার	ত্যাগ করেন।
(২) ইসলামের প্রথম খলিফা	হজরত আবু বকর (রা)	দীন ইসলামের জন্য তাঁর যথার্থব্দ	দান করেছিলেন।

খ. মিশ্র বাক্যের বিশ্লেষণ

মিশ্র বাক্যের বিশ্লেষণ করতে হলে

১. প্রথমে প্রধান বাক্যটি প্রদর্শন করতে হয়।

২. অন্তবাক্য (গুলো) প্রদর্শন করে তাদের সঙ্গে প্রধান বাক্যের সম্বন্ধ উল্লেখ করতে হয়।

৩. প্রধান এবং অপ্রধান অন্তবাক্যের মধ্যে কোনো সংযোজক পদ থাকলে তাও দেখাতে হয়। যেমন-আমি স্থির করলাম যে, এরূপ অন্ন বয়স্ক বালককে পাঠাব না। এখানে প্রধান বাক্য- (১) আমি স্থির করলাম; সংযোজক পদ-যে; বিশেষ্য-স্থানীয় অন্তবাক্য - (২) অন্ন বয়স্ক বালককে পাঠাব না।

বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক	উদ্দেশ্য	বিধেয়ের সম্প্রসারক	বিধেয়	সংযোজক বা সাপেক্ষ অব্যয়
(১)	আমি	অন্ন বয়স্ক বালককে	স্থির করলাম	যে
(২)	(আমি) (উহ্য)		পাঠাব না।	এবং

গ. ঘৌষিক বাক্যের বিশ্লেষণ

ঘৌষিক বাক্যের বিশ্লেষণ করতে হলে

১. প্রত্যেকটি স্বাধীন বা নিরপেক্ষ বাক্যকে সরল বাক্যের ন্যায় বিশ্লেষণ করতে হবে।
২. কোনো সংযোজক অব্যয় থাকলে তা প্রদর্শন করতে হবে। যেমন – ত্যাগ এবং জ্ঞান মানুষকে মুক্তির পথে পরিচালিত করে। এখানে দুটি বাক্য আছে। যেমন –
 - (১) ত্যাগ মানুষকে মুক্তির পথে পরিচালিত করে।
 - (২) জ্ঞান মানুষকে মুক্তির পথে পরিচালিত করে। বাক্য দুটির সংযোজক অব্যয় ‘এবং’।

বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক	উদ্দেশ্য	বিধেয়ের সম্প্রসারক	বিধেয়	সংযোজক অব্যয়
(১)	ত্যাগ	মানুষকে মুক্তির পথে	পরিচালিত করে	এবং
(২)	জ্ঞান	মানুষকে মুক্তির পথে	পরিচালিত করে	

বাক্য সংক্ষেপণ

একাধিক পদ বা উপবাক্যকে একটি শব্দে প্রকাশ করা হলে, তাকে বাক্য সংক্ষেপণ বলে। এটি বাক্য সংকোচন বা এক কথায় প্রকাশেরই নামান্তর। এখানে বাক্য সংকোচনের উদাহরণ দেওয়া গেল।

বাক্য সংক্ষেপণের বা বাক্য সংকোচনের উদাহরণ

অকালে পক্ষ হয়েছে যা – অকালপক্ষ।

অঙ্গির সমক্ষে বর্তমান – প্রত্যক্ষ।

অভিজ্ঞতার অভাব আছে যার – অনভিজ্ঞ।

অহংকার নেই যার – নিরহংকার।

অনেকের মধ্যে একজন – অন্যতম।

অনুত্তে (বা পচাতে) জন্মেছে যে – অনুজ।

আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত – আদ্যন্ত, আদ্যোপান্ত।

আকাশে বেড়ায় যে – আকাশচারী, খেচের।

আচারে নিষ্ঠা আছে যার – আচারনিষ্ঠ।

আপনাকে কেন্দ্র করে যার চিন্তা – আআকেন্দ্রিক।

আপনাকে যে পঞ্চিত মনে করে-পঞ্চিতন্ত্য।

আদ্বাহ্য অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে যার – আস্তিক।

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই যার - নাস্তিক।
 ইতিহাস রচনা করেন যিনি - ঐতিহাসিক।
 ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি - ইতিহাসবেত্তা।
 ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে যে - জিতেন্দ্রিয়।
 ঈষৎ আমিষ (আষ) গুরু যার - আষটে।
 উপকারীর উপকার যে স্বীকার করে - কৃতজ্ঞ।
 উপকারীর উপকার যে স্বীকার করে না - অকৃতজ্ঞ।
 উপকারীর অপকার করে যে - কৃতয়।
 একই মাতার উদরে জাত যে - সহোদর।
 এক থেকে শুরু করে ঝুমাগত - একাদিক্রমে।
 কর্ম সম্পাদনে পরিশূমী - কর্মঠ।
 কোনো ভাবেই যা নিবারণ করা যায় না - অনিবার্য।
 চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত - চাক্ষুষ।
 জীবিত থেকেও যে মৃত - জীবন্ত।
 তল স্পর্শ করা যায় না যার - অতলসঙ্গী।
 দিনে যে একবার আহার করে - একাহারী।
 নষ্ট হওয়াই স্বত্ত্বাব যার - নশ্বর।
 নদী মেখলা যে দেশের - নদীমেখলা।
 নৌকা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে যে - নাবিক।
 পা থেকে মাথা পর্যন্ত - আপাদমস্তক।
 ফল পাকলে যে গাছ মরে যায় - ওষধি।
 বিদেশে থাকে যে - প্রবাসী।
 বিশ্বজনের হিতকর - বিশ্বজনীন।
 মৃতের মতো অবস্থা যার - মৃমুর্ষু।
 যা দমন করা যায় না - অদম্য।
 যা দমন করা কষ্টকর - দুর্দমনীয়।
 যা নিবারণ করা কষ্টকর - দুর্নির্বার।
 যা পূর্বে ছিল এখন নেই - ভূতপূর্ব।
 যার উপস্থিত বৃদ্ধি আছে - প্রত্যুৎপন্নমতি।

ଯାର ସର୍ବଦ୍ୱ ହାରିଯେ ଗେଛେ – ସର୍ବହାରା, ହୃତସର୍ବଦ୍ୱ ।
 ଯାର କୋନୋ କିଛୁ ଥେକେଇ ଭାବ ନେଇ – ଅକୁତୋଭାବ ।
 ଯାର ଆକାର କୁଣ୍ଡସିତ – କଦାକାର ।
 ଯା ବିନା ଯତ୍ନେ ଲାଭ କରା ଗିଯେଛେ – ଅସ୍ତ୍ରଲକ୍ଷ୍ୟ ।
 ଯା ବାର ବାର ଦୂଳହେ – ଦୋଦୁଳ୍ୟମାନ ।
 ଯା ଦୀପିତ ପାଞ୍ଚେ – ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ।
 ଯା ସାଧାରଣେର ମଧ୍ୟେ ଦେଖା ଯାଇ ନା ଏମନ – ଅନନ୍ୟସାଧାରଣ ।
 ଯା ପୂର୍ବେ ଦେଖା ଯାଇନି ଏମନ – ଅଦୃଷ୍ଟପୂର୍ବ ।
 ଯା କଟେ ଜୟ କରା ଯାଇ – ଦୂର୍ଜୟ ।
 ଯା କଟେ ଲାଭ କରା ଯାଇ – ଦୂର୍ଜନ ।
 ଯା ଅଧ୍ୟୟନ କରା ହେଁଥେ – ଅଧୀତ ।
 ଯା ଜଳେ ଚରେ – ଜଳଚର ।
 ଯା ସ୍ଥଳେ ଚରେ – ସ୍ଥଳଚର ।
 ଯା ଜଳେ ଓ ସ୍ଥଳେ ଚରେ – ଉଭଚର ।
 ଯା ବଳା ହେଁନି – ଅନୁକ୍ତ ।
 ଯା କଥନୋ ନଷ୍ଟ ହେଁ ନା – ଅବିନଶ୍ଵର ।
 ଯା ମର୍ମ ସର୍ଷ କରେ – ମର୍ମସର୍ଷୀ ।
 ଯା ବଳାର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ – ଅବର୍ଥ୍ୟ ।
 ଯା ଅତି ଦୀର୍ଘ ନାହିଁ – ନାତିଦୀର୍ଘ ।
 ଯାର ବଂଶ ପରିଚଯ ଏବଂ ସଭାବ କେତେଇ ଜାନେ ନା – ଅଞ୍ଜାତକୁଳଶୀଳ ।
 ଯାର ପ୍ରକୃତ ବର୍ଣ୍ଣ ଧରା ଯାଇ ନା – କର୍ଣ୍ଚୋରା ।
 ଯା ଚିନ୍ତା କରା ଯାଇ ନା – ଅଚିନ୍ତନୀୟ, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ।
 ଯା କୋଥାଓ ଉଚ୍ଚ କୋଥାଓ ନିଚ୍ଚ–ବନ୍ଧୁର ।
 ଯା ସମ୍ମଳ କରତେ ବତୁ ବ୍ୟା ହେଁ–ବ୍ୟାବତୁଳ ।
 ଯା ଥୁବ ଶୀତଳ ବା ଉଷ୍ଣ ନାହିଁ – ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ।
 ଯାର ବିଶେଷ ଖ୍ୟାତି ଆହେ – ବିଖ୍ୟାତ ।
 ଯା ଆଘାତ ପାଇନି – ଅନାହତ ।
 ଯା ଉଦିତ ହଙ୍ଗେ – ଉଦୀଯମାନ ।
 ଯାର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନେଇ – ଅନନ୍ୟୋପାୟ ।
 ଯାର କୋନୋ ଉପାୟ ନେଇ – ନିରୂପାୟ ।

যা ক্রমশ বৰ্ধিত হচ্ছে – বৰ্ধিক্ষু।
 যা পূর্বে শোনা যায়নি – অগ্নুতপূর্ব।
 যে শুনেই মনে রাখতে পারে – ধ্যাতিধর।
 যে বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে – উদ্বাস্তু।
 যে নারী নিজে বর বরণ করে নেয় – স্বয়ংবরা।
 যে গাছে ফল ধরে, কিন্তু ফল ধরে না – বনস্পতি।
 যে রোগ নির্ণয় করতে হাতড়ে মরে – হাতুড়ে।
 যে নারীর সন্তান বাঁচে না – মৃতবস্তা।
 যে গাছ কোনো কাজে লাগে না – আগাছা।
 যে গাছ অন্য গাছকে আশ্রয় করে বাঁচে – পরগাছা।
 যে পুরুষ বিয়ে করেছে – কৃতদার।
 যে মেয়ের বিয়ে হয়নি – অনুঢ়া।
 যে ক্রমাগত ঝোদন করছে – ঝোরুদ্যমান।
 যে ভবিষ্যতের চিঞ্চা করে না বা দেখে না – অপরিগামদশী।
 যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে – অবিমৃত্যকারী।
 যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক (বা বিসৎবাদ) নেই – অবিসৎবাদিত।
 যে বন হিন্দু জন্মতে পরিপূর্ণ – শ্঵াপদসংকুল।
 যিনি বক্তৃতা দানে পটু – বাগী।
 যে সকল অত্যাচারই সয়ে যায় – সর্বহস্তা।
 যে নারী বীর সন্তান প্রসব করে – বীরপ্রসূ।
 যে নারীর কোনো সন্তান হয় না – বৃক্ষ্যা।
 যে নারী জীবনে একমাত্র সন্তান প্রসব করেছে – কাকবৃক্ষ্যা।
 যে পুরুষের চেহারা দেখতে সুন্দর – সুদর্শন।
 যে রব শুনে এসেছে – রবাহুত।
 লাভ করার ইচ্ছা – শিঙ্কা।
 শুভ ক্ষণে জন্ম যার – ক্ষণজন্মা।
 সম্মুখে অঞ্চল হয়ে অভ্যর্থনা – প্রভুদ্যগমন।
 সকলের জন্য প্রযোজ্য – সর্বজনীন।
 হনন করার ইচ্ছা – জিঘাংসা।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেক প্রশ্নের চারটি উভয়ের সর্বোচ্চমাটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(১) ভাষার মূল উপকরণ কী ?

- | | |
|----------|----------|
| ক. ধ্বনি | গ. বাক্য |
| খ. শব্দ | ঘ. বৰ্ণ |

(২) বাক্যে এক পদের পর অন্য পদ শোনার ইচ্ছাকে কী বলে ?

- | | |
|------------|---------------|
| ক. আসন্নি | গ. আকাঞ্চন্না |
| খ. যোগ্যতা | ঘ. আসন্তি |

(৩) ‘শবপোড়া’ শব্দটিতে কী দোষ দেখা যায় ?

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| ক. গুরুচন্দ্রালী | গ. আকাঞ্চন্নার ভুল প্রয়োগ |
| খ. উপমা প্রয়োগে ভুল | ঘ. দুর্বোধ্যতা |

(৪) কোনটি বাগধারার শব্দ পরিবর্তনজনিত ভুলের উদাহরণ ?

- | | |
|----------------|-------------------|
| ক. ঘোড়ার ডিম | গ. গৌরীসেনের টাকা |
| খ. গোড়ায় গলদ | ঘ. ঘোটকের ডিম্ব |

(৫) কোন বাক্যাংশটি গুরুচন্দ্রালী দোষযুক্ত ?

- | | |
|-----------------|--------------|
| ক. ঘোড়ার গাঢ়ি | গ. শবদাহ |
| খ. ঘোটকের গাঢ়ি | ঘ. মড়াপোড়া |

(৬) উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে—এর সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি ?

- | | |
|-------------------|-----------|
| ক. উপকার—স্বীকারী | গ. কৃতম্ব |
| খ. অকৃতজ্ঞ | ঘ. কৃতজ্ঞ |

(৭) নষ্ট হওয়া স্বত্ব যার — এক কথায় কী হবে ?

- | | |
|-------------|-----------------|
| ক. অবিনশ্বর | গ. নষ্টস্বত্বাব |
| খ. নশ্বর | ঘ. বিনষ্ট |

(৮) যা পূর্বে দেখা যায়নি — এক কথায় কী হবে ?

- | | |
|---------------|----------------|
| ক. অদৃষ্ট | গ. অপূর্ব |
| খ. দৃষ্টপূর্ব | ঘ. অদৃষ্টপূর্ব |

২। বাক্য বলতে কী বোঝা? কোনো একটি সার্থক বাক্য গঠনে কী কী গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যিক? সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেখ।

৩। ‘শব্দের যোগ্যতা বিচার নীতিমত কঠিন কাজ, কেননা শব্দের যোগ্যতার সঙ্গে অনেক বিষয় জড়িত থাকে।’ – এ উক্তিটির সমর্থনে তোমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ কর।

৪। কী কী উপায়ে বিধেয়ের সম্প্রসারণ হতে পারে? স্বরচিত বাক্যে উপায়সমূহের উদাহরণ দাও।

৫। সংজ্ঞা লেখ এবং উদাহরণ দাও :

(ক) মিশ্রবাক্য, (খ) আশ্রিত খণ্ডবাক্য, (গ) বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য, (ঘ) ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য

৬। যৌগিক বাক্য ও সরল বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক কী? উদাহরণযোগে বুঝিয়ে দাও।

৭। নিম্নলিখিত বাক্যগুলোকে নির্দেশিত বস্থনীযুক্ত বাক্যে রূপান্তর কর

(ক) সত্য কথা বল নি, সুতরাং বিপদে পড়েছ। (সরল বাক্য)

(খ) অপরাধ স্বীকার কর, তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না। (মিশ্র বাক্য)

(গ) যদিও তাঁর টাকা আছে, তথাপি তিনি দান করেন না। (যৌগিক বাক্য)

(ঘ) যখন দুর্দিন আসে তখন দুঃখও আসে। (যৌগিক বাক্য)

(ঙ) যে ডিক্ষা করতে এসেছে, তাকে ডিক্ষা দাও। (সরল বাক্য)

(চ) তাকে দেখা মাত্রই আমরা চলে গেলাম। (মিশ্র বাক্য)

৮। নিম্নলিখিত বাক্য তিনটি বিশ্লেষণ কর :

(ক) যাঁরা সত্যিকার কর্মী, তাঁরাই জীবনযুদ্ধে জয়ী হন।

(খ) মানব-সেবায় আত্মোৎসর্গ কর।

(গ) পথিক বিবেচনা করলেন যে, পথচারী মহিলাটি ঝাড়-বৃক্ষের মধ্যে বিপদে পড়েছেন।

৯। বাক্য সংক্ষেপণ করতে কী বোঝা? কী কী উপায়ে বাক্যাংশের সংক্ষেপণ হতে পারে? উদাহরণসহ বিশদ আলোচনা কর।

১০। ঠিক উন্নরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) আকাশে চরে বেড়ায় যে : আকাশচারী/চিপ/খেচের।

(খ) যে উপকারীর অপকার করে : অপকারক/কৃতন্ত/অকৃতসং।

(গ) যা দমন করা যায় না : দুর্দম/দুর্দমনীয়/ অদম্য।

(ঘ) যা দীপ্তি পাচ্ছে : সম্মীপন/দীপ্তিমান/দেদীপ্যমান।

- (ঙ) যা বলা হয়নি : অকথিত/অনুস্কৃত/অবাচ্য।
 (চ) যার কোনো উপায় নেই : নাচার/অনুপায়/নিরূপায়।
 (ছ) হলন করার ইচ্ছা : হলনেচ্ছা/জিয়াংসা/জিজ্ঞাসা।

১১। এক শব্দে পরিণত কর এবং এই শব্দ ঘারা সার্থক বাক্য রচনা কর :

- (ক) সকলের ঘারা অনুষ্ঠিত।
 (খ) লাভ করার ইচ্ছা।
 (গ) যে ক্রমাগত কাঁদছে।
 (ঘ) যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই।
 (ঙ) যা বলার যোগ্য নয়।
 (চ) যার স্বাভাবিক বর্ণ ধরা যায় না।
 (ছ) যার আকার কুৎসিত।
 (জ) যে গাছ অন্য গাছের ওপর নির্ভর করে বাঁচে।
 (ঘ) যা আঘাত পায়নি।
 (এ) যে বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শব্দের যোগ্যতার বিকাশ ও বাগ্ধারা

বাংলা ভাষায় এমন বহু শব্দ আছে, যাদের আতিথানিক অর্থের সঙ্গে ব্যবহারিক অর্থের যথেষ্ট প্রভেদ আছে। বহুভাবে এ ধরনের পার্থক্য দৃষ্ট হয়ে থাকে। যেমন—

- (১) শিষ্টবীতি বা স্লাভিসিঞ্চ প্রয়োগঘটিত : ছাত্রটির মাথা ভালো। এখানে ‘মাথা’ কলতে ‘দেহের অঙ্গবিশেষ’ বোঝায় না, বোঝায় ‘মেধা’।
- (২) শব্দের অর্থ সংকোচে : ইনি আমার বৈবাহিক। এখানে ‘বৈবাহিক’ শব্দে ‘বিবাহ সূত্রে সম্পর্কিত’ অর্থ না বুঝিয়ে ‘ছেলে বা মেয়ের শুশুর সম্পর্কিত’ ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে।
- (৩) শব্দের অর্থনীতির প্রাপ্তিতে : মেয়ের শুশুরবাড়ি তত্ত্ব পাঠানো হয়েছে। এখানে ‘তত্ত্ব’ শব্দটির আতিথানিক অর্থ ‘সহবাদ’ না বুঝিয়ে ‘উপটোকন’ অর্থ বোঝাচ্ছে। একে নতুন অর্থের আবির্ভাব বলা চলে।
- (৪) শব্দের উৎকর্ষ প্রাপ্তিতে : শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। এখানে ‘পরমহংস’ শব্দের সঙ্গে ইসের কোনো সম্পর্ক নেই, এর অর্থ ‘সন্ম্যাসী’।
- (৫) শব্দের অপকর্ত্তা (বা অধোগতি) বোঝাতে : জ্যাঠামি করো না। এখানে ‘জ্যাঠামি’ শব্দের সঙ্গে ‘জ্যাঠা’র (পিতার বড় ভাইয়ের) কোনো সম্পর্ক নেই; শব্দটি ‘ধূষ্টতা’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
- কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, শব্দের ব্যবহার দুই প্রকার : (১) বাচ্যার্থ ও (২) লক্ষ্যার্থ।
১. বাচ্যার্থ : যে সকল শব্দ তাদের আতিথানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, আতিথানিক অর্থই তাদের বাচ্যার্থ।
২. লক্ষ্যার্থ : যে সকল শব্দ তাদের আতিথানিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে, অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়, এই অন্য অর্থগুলো তাদের লক্ষ্যার্থ।

বাগ্ধারা বা বাক্যবীতি

কোনো শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে অর্থের দিক দিয়ে যখন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে উঠে, তখন সে সকল শব্দ বা শব্দ-সমষ্টিকে বাগ্ধারা বা বাক্যবীতি বলা হয়।

‘মুখ’ শব্দযোগে বাগ্ধারার উদাহরণ

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| (ক) এ ছেলে বৎশের মুখ রক্ষা করবে | — | (সম্মান বাচানো) |
| (খ) শুধু শুধু ছেলেটাকে মুখ করছ কেন? | — | (গোলমূল করা) |
| (গ) এবার গিন্নির মুখ ছুটেছে। | — | (গালিগালাজের আরম্ভ) |
| (ঘ) টক খেয়ে মুখ ধরে আসছে। | — | (মুখের স্বাদ নষ্ট হওয়া) |
| (ঙ) খোদা মুখ তুলে চাইলে অবশ্যই ব্যবসায়ে লাভ হবে। | — | (অনুগ্রহ লাভ করা) |

বিশেষ শব্দের প্রয়োগভেদে অর্থ পার্থক্য

১. হাত

- (ক) হাত আসা — কাজ করতে করতেই কাজে হাত আসবে। (দক্ষতা)
- (খ) হাত গুটান — হাত গুটিয়ে বসে আছ কেন? (কার্যে বিরতি)
- (গ) হাত করা — সাহেবকে হাত করতে পারলেই কাজ হবে। (আয়ত্তে আনা)
- (ঘ) হাত ছাড়া — টাকাগুলো হাত ছাড়া করো না। (হস্তচূর্ণ)
- (ঙ) হাত থাকা — এ ব্যাপারে আমার কোনো হাত নেই। (প্রতাব)

দ্রষ্টব্য : বাঙ্গালা গঠনে বিভিন্ন পদের ব্যবহারকে সীতিসিদ্ধ প্রয়োগও বলে।

‘হাত’ শব্দের সীতিসিদ্ধ প্রয়োগ

- | | |
|--|---|
| (ক) হাতের পাঁচ (শেষ সম্পদ) | : এ টাকা কঠিই ছিল আমার হাতের পাঁচ। |
| (খ) হাতে হাতে (অবিলম্বে) | : হাতে হাতে এ কাজের ফল পাবেন। |
| (গ) হাতে খড়ি (বিদ্যারম্ভ) | : এ মাসেই খোকার হাতে খড়ি হবে। |
| (ঘ) হাতে কলমে (স্বহস্তে, কার্যকর ভাবে) | : হাতে—কলমে শিক্ষা কেতাবি শিক্ষার চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী। |

২. মাথা

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (ক) মাথা ধরা — রোগ বিশেষ | (খ) গীয়ের মাথা — মোড়ল। |
| (গ) মাথা ব্যথা — আগ্রহ | (ঘ) মাথা খাওয়া — শপথ করা। |
| (ঙ) মাথা দেওয়া — দায়িত্ব গ্রহণ | (চ) মাথা ঘামানো — ভাবনা করা। |
| (ছ) মাথাপিছু — জনপ্রতি | |

মাথা শব্দের সীতিসিদ্ধ প্রয়োগ

বাক্য গঠন

- | | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------|
| রাস্তার মাথায় | — মিলন স্থলে। | রাস্তার মাথায় তার সঙ্গে দেখা। |
| মাথা গরম করা | — রাগান্বিত হওয়া। | মাথা গরম করে আর কী হবে? |
| রাগের মাথায় | — হঠাতে ক্রোধবশত। | রাগের মাথায় কথাটা বলেছি। |
| মাথা হেঁট করা | — লজ্জায় মাথা নিচু করা। | মাথা হেঁট হবে কেন? |
| মাথা উঁচু করে চলা | — গর্বভরে চলা। | মাথা উঁচু করেই চলতে চাই। |

বিশেষণ শব্দের গ্রাহিতসিদ্ধি প্রয়োগ

১. কাঁচা

কাঁচা আম	—	অপরিপন্থ আম।	কাঁচা খাতা	—	খসড়া।
কাঁচা কথা	—	গুরুত্বহীন কথা।	কাঁচা ইট	—	অদৃশ ইট।
কাঁচা মূম	—	অল্প ক্ষণের মূম।	কাঁচা চুল	—	কালো চুল।
কাঁচা বয়স	—	অপরিণত বয়স।	কাঁচা সোনা	—	নিখাদ সৰ্ব।

বাক্য গঠন : কাঁচা সোনার মতো তার গায়ের রং।

কাঁচা (আনাড়ি) লোকই কাঁচা (অনিপুণভাবে) কাজ করে থাকে।

বাক্যে ‘পাকা’ বিশেষণ শব্দের গ্রাহিতসিদ্ধি প্রয়োগ

পাকা কথা (শেষ সিদ্ধান্তসূচক) চাই।

পাকা বল্দোবস্ত (স্থায়ী) করে এসেছি।

এ হচ্ছে পাকা রাঁধুনির (দক্ষ) রান্না।

ইচড়ে পাকা (অকালে পরিপন্থ) ছেলেদের কথা অসহ্য।

একেবারে পাকা হাতের (দক্ষ লেখকের) লেখা।

আমি কি তোমার পাকা খালে মই দিয়েছি (হক নষ্ট করা) যে, আমার সঙ্গে শত্রুতা করছ?

‘করা’ ক্রিয়াপদের গ্রাহিতসিদ্ধি প্রয়োগ

মনে করলাম এবার তীর্থে যাব। (সংকল্প করা)

সে ফুটবল খেলায় নাম করেছে। (যশস্বী হওয়া)

টাকা করে নাম কিনতে চাও? (খ্যাতি লাভের চেষ্টা করা)

চাকরি পাওয়ার কোনো জো করে উঠতে পারিনি। (সুযোগ পাওয়া)

‘ধরা’ ক্রিয়াপদের গ্রাহিতসিদ্ধি প্রয়োগ

কান ধরা	—	কর্ণ মর্দন করা।	মনে ধরা	—	পছন্দ হওয়া।
দোষ ধরা	—	অপরাধ গণনা করা।	আগুন ধরা	—	আগুন লাগা।
পথ ধরা	—	উপায় দেখা।	ম্যাও ধরা	—	দায়িত্ব নেওয়া।
হাতে-পায়ে ধরা	—	অনুরোধ করা।	গো ধরা	—	একঙ্গুয়েমি করা।
গলা ধরা	—	কষ্ট বৃদ্ধ হওয়া। (কথা বল্ব হয়ে যাওয়া)			

মুক্তিব্য : শব্দাত্মক ও পদাত্মক বাগ্ধারার অর্থের পার্থক্য ঘটে। যেমন—

{ গা সওয়া	— অভ্যস্ত হওয়া	{ গা লাগা	— মনোযোগ দেওয়া।
গায়ে সওয়া	— দেহে সহ্য হওয়া।	গায়ে লাগা	— অনুভূত হওয়া।
{ পায়ে পড়া	— ক্ষমা প্রার্থনা করা।	{ হাত আসা	— অভ্যস্থ হওয়া।
পায় পড়া	— খোশামুদ্দে।	হাতে আসা	— আয়স্ত হওয়া।
{ রোগ ধরা	— রোগ নির্ণয়।		
রোগে ধরা	— রোগাত্মক হওয়া।		

বাগ্ধারার ব্যবহার

- অকাল কুষ্যান্ত (অপদার্থ, অকেজে) — অকাল কুষ্যান্ত ছেলেটার উপর এ কাজের দায়িত্ব দিও না।
- অঙ্কা পাওয়া (মারা যাওয়া) — অনেক রোগতোগের পর শয়তানটা শেষ পর্যন্ত অঙ্কা পেয়েছে।
- অগস্ত্য যাত্রা (চিরদিনের জন্য প্রস্থান) — ডাকাতি মামলার আসামি হওয়ায় করিম গ্রাম থেকে অগস্ত্য যাত্রা করেছে।
- অগাধ জলের মাছ (সুচকুর ব্যক্তি) — সরল মনে হলেও লোকটা আসলে অগাধ জলের মাছ।
- অর্ধচন্দ্র (গলা ধাক্কা) — শয়তানটাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দাও।
- অম্বের ষষ্ঠি } (একমাত্র অবশ্যন) — বিধবার একমাত্র সন্তান তার অম্বের ষষ্ঠি/অম্বের নড়ি।
- অম্বের নড়ি } (একমাত্র অবশ্যন) — তিনি ক্রোধে অগ্নিশৰ্মা হলেন।
- অগ্নিশৰ্মা (নিরতিশয় ক্রুদ্ধ) — জাতিকে এ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে, তব পেলে চলবে না।
- অশ্বকারে টিল মারা (আমাজে কাজ করা) — অশ্বকারে টিল মেরে সব কাজ ঠিকভাবে করা যায় না।
- অকূল পাথার (ভীষণ বিপদ) — অকূল পাথারে আঞ্চাহাই একমাত্র সহায়।
- অনুরোধে টেকি গেলা (অনুরোধে দুরুহ কাজ সম্পন্ন করতে সম্ভৱ জ্ঞাপন) — অনুরোধে টেকি গেলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমি এ কাজ করতে পারব না।
- অদৃষ্টের পরিহাস (ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা) — অদৃষ্টের পরিহাসে রাজাও ভিখারি হয়।
- অল্লবিদ্যা ভয়ংকরী (সামান্য বিদ্যার অহংকার) — কিছুই জানে না, আবার দেমাক কত — অল্লবিদ্যা ভয়ংকরী আর কি।
- অনধিকার চৰ্চা (সীমার বাইরে পদক্ষেপ) — কারও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আমি অনধিকার চৰ্চা করি না।
- অরণ্যে রোদন (নিষ্কল আবেদন) — কৃপণের নিকট চাঁদা চাওয়া অরণ্যে রোদন মাত্র।
- অহিনকূল সম্বন্ধ (ভীষণ শত্রুতা) — দুভাইয়ের মধ্যে অহিনকূল সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে।

- অস্থকার দেখা (দিশেহারা হয়ে পড়া) — এ বিপদে আমি যে সব অস্থকার দেখছি।
- অমাবস্যার চাঁদ (দূর্জন্ত বস্তু) — তোমার দেখা পাওয়াই ভার, অমাবস্যার চাঁদ হয়ে পড়েছ।
- আকাশ কুসুম (অসম্ভব কল্পনা) — মূর্খরাই আকাশ কুসুম চিন্তা করে।
- আকাশ পাতাল (প্রচুর ব্যবধান) — ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।
- আকেল সেলামি (নির্বাচিতার দণ্ড) — বিনা টিকেটে রেলগাড়িতে চড়ে আকেল সেলামি দিতে হলো।
- আঙুল ফুলে কলাগাছ (হঠাতে বড়লোক) — যুক্তের বাজারে দেদার টাকা পয়সা কামাই করে অনেকেই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে।
- আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া (দূর্জন্ত বস্তু প্রাপ্তি) — হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে বাপ-মা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন।
- আদায় কাঁচকলায় (শত্রুতা) — তার সঙ্গে আমার আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক, সে আমার দুশ্মন।
- আদা জল খেয়ে লাগা (প্রাণপণ চেষ্টা করা) — কাজটি শেষ করার জন্য সে আদা জল খেয়ে লেগেছে।
- আকেল গুড়ুম (হতবুদ্ধি, স্তম্ভিত) — ইচ্ছে পাকা ছেলেটার কথা শুনে আমার আকেল গুড়ুম।
- আমড়া কাঠের টেকি (অপদৰ্থ) — ও হচ্ছে ধনীর দুলাল, আমড়া কাঠের টেকি, ওকে দিয়ে কিছুই হবে না।
- আকাশ ভেঙ্গে পড়া (ভীষণ বিপদে পড়া) — ব্যাংক ফেল করেছে শুনে তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল।
- আমতা আমতা করা (ইতস্তত করা, দিখা করা) — আমতা আমতা না করে স্পষ্ট কথায় দোষ স্বীকার কর।
- আটকপালে (হতভাগ্য) — ছেলেটা এতিম, আটকপালে।
- আঠার মাসে বছর (দীর্ঘসূত্রতা) — তোমার তো আঠার মাসে বছর, কোনো কাজই তাড়াতাড়ি করতে পার না।
- আলালের ঘরের দুলাল (ঘৃতি আলালে বড় লোকের নষ্ট পুত্র) — বড়লোকের ঘরে দু-একজন আলালের ঘরের দুলাল মিলবেই।
- আকাশে তোলা (অতিরিক্ত প্রশংসা করা) — চাঁচুকাররা ধনী ব্যক্তিদের কথায় আকাশে তোলে।
- আঘাতে গর (আজগুবি কেছা) — চাঁদে যাওয়ার কথাটা একসময় ছিল আঘাতে গর।
- ইদুর কপালে (নিতান্ত মন্দ ভাগ্য) — আমার মতো ইদুর কপালে লোকের দাম এক কানাকড়িও না।
- ইচ্ছে পাকা (অকালপক্ষ) — অতবড় মানুষটার সাথে তর্ক করছে, কী ইচ্ছে পাকা হলে বাবা।
- ইতর বিশেষ (পার্থক্য) — সৃষ্টিকর্তার নিকট সব মানুষই সমান, ইতর বিশেষ নেই।
- উভয় মধ্যম (প্রহার, পিটুনি) — গৃহস্থ চোরটাকে উভয় মধ্যম দিয়ে ছেড়ে দিল।
- উড়নচঞ্চী (অমিতব্যয়ী) — এমন উড়নচঞ্চী হলে দুদিনে টাকাকড়ি সব শেষ হবে।
- উভয় সংক্রত — ‘শাখের করাত’ দেখ।

- উলুবনে মুক্ত ছড়ানো (অস্থানে মূল্যবান দ্রব্য প্রদান)** – তাকে সদৃশদেশ দান, উলুবনে মুক্ত ছড়ানোর মতোই নিষ্কল ।
- উড়েচিটি (বেলামি পত্র)** – ডাকাতরা জমিদার বাড়িতে উড়েচিটি দিয়ে ডাকাতি করেছিল ।
- উড়ে এসে জুড়ে বসা (অনধিকারীর অধিকার)** – লোকটার মাতবারি দেখলে গা জুলে যায় । ও এখানকার লোক নয়, উড়ে এসে জুড়ে বসেছে ।
- একঙ্কুরে মাথা মুড়ানো (একই স্বভাবের)** – সকলেই একঙ্কুরে মাথা মুড়িয়েছে দেখছি, পরীক্ষায় সবাই ফেল করেছে ।
- একচোখা (পক্ষপাতিত্ব, পক্ষপাতদুষ্ট)** – একচোখা লোকের কাছে সুবিচার পাওয়া যায় না ।
- এক মাঘে শীত যায় না (বিপদ একবারই আসে না)** – আবাকে ফাঁকি দিলে, মনে রেখো, এক মাঘে শীত যায় না ।
- এলোপাতাড়ি (বিশৃঙ্খলা)** – এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়লে শতুদলের ক্ষতি করতে পারবে না ।
- এসপার ওসপার (মীমাংসা)** – চুপ করে থেকে লাভ কী, এসপার ওসপার একটা করে ফেল ।
- একাদশে বৃহস্পতি (সৌভাগ্যের বিষয়)** – এখন তার একাদশে বৃহস্পতি, ধূলোমুঠোও সোনামুঠো হচ্ছে ।
- এলাহি কাণ্ড (বিরাট আয়োজন)** – বড় বাড়িতে বিয়ে, সেতো এক এলাহি কাণ্ড হবে ।
- কল্পুর বলদ (একটানা খাটুনি)** – কল্পুর বলদের মতো সৎসারের চাকায় ঘুরে মরাই ।
- কথার কথা (গুরুত্বহীন কথা)** – কারও মনে আঘাত দেওয়ার জন্য একথা বলিনি, এটা একটা কথার কথা ।
- কপাল ফেরা (সৌভাগ্য লাভ)** – লটারির টিকেট কিনে সে তার কপাল ফেরাতে চায় ।
- কত ধানে কত চাল (হিসাব করে চলা)** – নিজেকে তো আর উপার্জন করতে হয় না, কত ধানে কত চাল হয় বুঝবে কেমন করে ।
- কড়ায় গড়ায় (সম্পূর্ণ, পুরোপুরি)** – সে কড়ায় গড়ায় তার পাঞ্জলা বুরো নিল ।
- কান খাড়া করা (মনোযোগী হওয়া)** – আমি কী বলি তা শোনার জন্য সে কান খাড়া করে রইল ।
- কাঁচা পয়সা (নগদ উপার্জন)** – কাঁচা পয়সা পাও কি না, তাই ধরচ করতে বাধে না ।
- কাঁঠালের আমসন্ত (অসম্ভব বস্তু)** – এই হাড়কিপ্ট করবে দান, কাঁঠালের আমসন্ত আর কি ।
- কূপমন্ডুক (ঘরকুনো, সীমাবদ্ধ জান সম্পন্ন)** – তুমি তো কূপমন্ডুক, ‘ঘরে হৈতে আঞ্জিনা বিদেশ’ ।
- কেতাদুরস্ত (পরিপাটি)** – কথাবার্তায়, পোশাকপরিচ্ছদে কেতাদুরস্ত হলেও সে অন্তঃসারশূন্য ।

কাঠের পুতুল (নির্জীব, অসার) — রাজা কাঠের পুতুলের মতো সিংহাসনে বসেছিলেন, প্রধানমন্ত্রীই দেশ শাসন করতেন।

কথায় চিড়ে ভেজা (ফাঁকা বুলিতে কার্যসাধন) — কাজটি করাতে হলে নগদ কিছু ঢালো, শুধু কথায় চিড়ে ভেজে না।

কান পাতলা (সহজেই বিশ্বাসপ্রবণ) — কান পাতলা লোকের অধীনে কাজ করা কঠিন।

কাছা টিলা (অসাবধান) — কাছা টিলা লোককে কোনো বড় দায়িত্ব দিতে নেই।

কুলকাঠের আগুন (তীব্র জ্বালা) — তোমার কথার খোঁচায় আমার সারা দেহে কুলকাঠের আগুন ঝলছে।

কেঁচো খুঁড়তে সাপ (সামান্য থেকে অসামান্য পরিস্থিতি) — ব্যাপারটা নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবে।

কেউকেটা (সামান্য) — ও একেবারে কেউকেটা লোক নয়, তার সঙ্গে লাগতে যেও না।

কেঁচে গড়ুস (পুনরায় আরম্ভ) — সবটাই ভুল হয়েছে, আবার কেঁচে গড়ুস করতে হবে দেখছি।

কৈ মাছের প্রাণ (যা সহজে মরে না) — লোকটা এত অত্যাচারেও মরেনি, কৈ মাছের প্রাণ দেখছি।

খয়ের ঝাঁ (চাটুকর) — ভূমি তো বড় সাহেবের খয়ের ঝাঁ, তিনি যা বলেন ভূমি তাই বল।

খন্দ প্রলয় (তুমুল কাণ্ড, ভীষণ ব্যাপার) — সামান্য ঘটনা থেকে এমন খন্দ প্রলয় হবে তাবিনি।

গজ্জলিকা প্রবাহ (অল্প অনুকরণ) — গজ্জলিকা প্রবাহে যারা গা ভাসিয়ে দেয়, আমি তাদের দলে নেই।

গদাই শস্করি চাল (অতি ধীর গতি, আলসেমি) — এমন গদাই শস্করি চালে চললে ট্রেন ফেল করবে।

গণেশ উল্টানো (উঠে যাওয়া, ফেল মারা) — কর্মচারীদের চুরির ফলে দোকানটা গণেশ উল্টিয়েছে।

গলগ্রহ (পরের বোঝাস্বরূপ থাকা) — কারো গলগ্রহ হয়ে থাকা যে কী কষ্ট, তা আমার বিলক্ষণ জ্ঞান আছে।

গৌয়ার গোবিন্দ (নির্বোধ অথচ হঠকারী) — সে যেমন জেদি তেমনি রাগী, তার মতো গৌয়ার গোবিন্দকে নিয়ে পথ চলা যায় না।

গোল্লায় যাওয়া (নষ্ট হওয়া, অধঃপাতে যাওয়া) — কুসঙ্গে পড়ে ছেলেটা গোল্লায় গেছে।

গোবর গণেশ (মূর্খ) — না জানে লেখাপড়া, না আছে বুদ্ধি — ছেলেটা একেবারে গোবর গণেশ।

গাছে তুলে মই কাড়া (আশা দিয়ে আশ্বাস ভজা করা) — আমাকে এগিয়ে দিয়ে সরে পড়েছ, একেই বলে গাছে তুলে মই কাড়া।

গায়ে ঝুঁ দিয়ে বেড়ানো (কোনো দায়িত্ব গ্রহণ না করা) — গায়ে ঝুঁ দিয়ে বেড়ালে সংসার চলবে কেমন করে?

গৌফ খেজুরে (নিতান্ত অলস) — গৌফ খেজুরে লোক দিয়ে কোনো কাজই হয় না।

- গোড়ায় গলদ (শুরুতে ভুল)** — অঙ্ক মিলবে কেমন করে? গোড়াতেই তো গলদ।
- গুড়ে বালি (আশায় নৈরাশ্য)** — আশা করেছিলাম মামার সম্পত্তি পাব, এখন দেখছি সে গুড়ে বালি।
- ঘর ভাঙানো (সংসার বিনষ্ট করা)** — তোমার মতো ঘর ভাঙানো বৌ আর দেখিনি।
- ঘাটের মড়া (অতি বৃদ্ধ)** — টাকার লোভে ঘাটের মড়ার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিও না।
- ঘোড়ারোগ (সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ)** — মাসে তিন হাজার টাকা মাইনে পেয়ে গাঢ়ি কিনতে চাও, একেই
বলে গরিবের ঘোড়ারোগ।
- যোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া (মধ্যবর্তীকে অতিক্রম করে কাজ করা)** — অফিসের বড় সাহেবকে না জানিয়ে ছোট সাহেবকে
বলা, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার মতো।
- চাঁদের হাট (আনন্দের প্রাচুর্য)** — ধনেজনে চৌধুরী সাহেবের সংসার যেন চাঁদের হাট।
- চিনির বলদ (ভারবাহী তবে ফল লাভের অংশীদার নয়)** — সংসারে চিনির বলদের মতো খেটে মরাছি, কিছুই
পাই না।
- চোখের বালি (চক্ষুশুল্ক)** — বখাটে ছেলেটা সকলের চোখের বালি।
- চোখের পর্দা (লজ্জা)** — তোমার দেখছি চোখের পর্দা নেই; কেমন করে এ কাজ করলে?
- ছকড়া নকড়া (সম্মত দর)** — নিলামের মাল, তাই ছকড়া নকড়ায় বিক্রি হয়ে গেল।
- ছাপোষা (অত্যন্ত গরিব)** — আমার মতো ছাপোষা লোকের কোনো শখ থাকতে নেই।
- ছিনিমিনি খেলা (নষ্ট করা)** — পরের টাকায় ছিনিমিনি খেলতে লজ্জা করল না?
- ছেলের হাতের মোয়া (সহজলভ্য বস্তু)** — রত্নহার ছেলের হাতের মোয়া নয় যে চাইলেই পাবে।
- জগাখিচুড়ি পাকানো (গোলমাল বাধানো)** — ব্যাপারটা জগাখিচুড়ি পাকিয়ে সে সরে পড়ল।
- জিলাপির পঁয়াচ (কুটিলতা)** — ভালোমানুষ মনে হলেও তার তেতরে রয়েছে জিলাপির পঁয়াচ।
- বোপ বুবো কোপ মারা (সুযোগ মতো কাজ করা)** — বোপ বুবো কোপ মারতে পেরেছে বগেই সে কৃতকার্য হয়েছে।
- টনক নড়া (চেতন্যোদয় হওয়া/বুবো উঠা)** — ব্যবসায় ক্ষতি হতেই তার টনক নড়ল।
- ঠাট বজায় রাখা (অঙ্গ চাপা রাখা)** — অঙ্গে পড়লেও তিনি ঠাট বজায় রেখে চলেছেন।
- ঠোঁটকাটা (বেহায়া)** — তোমার মতো ঠোঁট কাটা হলে আর দেখিনি, মুখের ওপর এ
কথা বললে।
- ডুমুরের ফুল** — ‘অমাবস্যার চাঁদ’ দেখ।

- চাক চাক গুড় গুড় (গোপন রাখার চেষ্টা)** — চাক চাক গুড় গুড় করে শান্ত কী, ব্যাপারটা খুলে বল।
- চাকের কাঠি (মোসাহেব)** — ‘খয়ের থা’ দেখ।
- তালকানা (বেতাল হওয়া)** — চোখে চশমা, আর চশমা ঝুঁজে বেড়াচ্ছে, আচ্ছা তালকানা লোক।
- তাসের ঘর (ক্ষণস্থায়ী বস্তু)** — টুনকো বস্থুত্ব স্বার্থের সামান্য আঘাতেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে যায়।
- তামার বিষ (অর্থের কু প্রভাব)** — হঠাত বড় লোক কি না, তাই তামার বিষে বিবেকহীন হয়ে পড়েছ।
- থ বনে যাওয়া (স্তন্ত্রিত হওয়া)** — তোমার কাউ দেখে আমি তো থ বনে গেলাম।
- দা-কুমড়া** — ‘আইনকুল’ দ্রষ্টব্য।
- দহরম মহরম (ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক)** — সাহেবের সাথে তোমার যথন এত দহরম মহরম, তখন কাজটা করিয়ে দাও তাই।
- দুমুখো সাপ (দুজনকে দুরকম কথা বলে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টিকারী)** — লোকটা একটা দুমুখো সাপ; আমাদের দুজনকে দুরকম কথা বলে দুজনের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করেছে।
- দুধের মাছি (সুসময়ের বন্ধু)** — সুদিনে যে দুধের মাছি, দুর্দিনে তার সাক্ষাৎ মেলে না।
- ধরাকে সরা জ্ঞান করা (সকলকে তুচ্ছ তাবা)** — বড়লোক হয়েছ বলে ধরাকে সরা জ্ঞান করো না।
- ধরি মাছ না ঝুই পানি (কৌশলে কার্যোদ্ধার)** — এ ব্যাপারে আমার ভূমিকা হবে ধরি মাছ না ঝুই পানি।
- ননীর পুতুল (শ্রমবিমুখ)** — ছেলেটি একেবারে ননীর পুতুল, একটু পরিশ্রমেই হাপিয়ে উঠে।
- নয়ছয় (অপচয়)** — সে বাড়ি বিক্রির টাকাগুলো নয়ছয় করে ফেলল।
- নেই আঁকড়া (একগুয়ে)** — এমন নেই আঁকড়া ছেলে আর তো দেখিনি বাবা যা বলবে তাই।
- পটল তোলা (অক্ষা পাওয়া)** — শয়তানটা পটল তুলেছে, এবার গৌয়ের লোকের হাড় জুড়াবে।
- পালের গোদা (দলপত্তি)** — পুরুষ পালের গোদাকে ধরতে পারেনি, সাধারণ মানুষের হাতে হাতকড়া পরিয়েছে।
- পুকুরচুরি (বড় রকমের চুরি)** — কিছু কর্মচারী পুকুরচুরি করে প্রতিষ্ঠানে লালবাতি ছালিয়েছে।
- ফপর দালালি (অতিরিক্ত চালবাজি)** — সবথামে ফপর দালালি চলে না, জায়গা বুঝে কাজ করতে হয়।
- ফোড়ন দেওয়া (টিপ্পনি কাটা)** — কথায় কথায় ফোড়ন দিলে কাজ করা দায় হয়ে উঠবে।
- বক ধার্মিক/বিড়াল তপস্তী (তড় সাধ)** — মুখে ধর্মের কথা বললেও লোকটা আসলে বক ধার্মিক।
- বর্ণচোরা (কপট ব্যক্তি)** — লোকটা বর্ণচোরা, তার আসল রূপ ধরা যায় না।
- বালির বাঁধ (অস্থায়ী বস্তু)** — ‘বড়ুর পিরিতি যেন বালির বাঁধ।’
- বাঁ হাতের ব্যাপার (ঘূঘ প্রহণ)** — এ অফিসের কিছু কর্মচারী বাঁ হাতের ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত।

- বাঘের দুধ/চোখ (দুঃসাধ্য বস্তু)**
- বিসমিল্লায় গলদ**
- বৃক্ষির টেকি (নিরোট মূর্ধা)**
- ব্যাঙের আধুলি (সামান্য সম্পদ)**
- ব্যাঙের সর্দি (অসম্ভব ঘটনা)**
- ভরাজুবি (সর্বনাশ)**
- ভূতের বেগার (অযথা শ্রম)**
- ভিজে বিড়াল (কপটাচারী)**
- ভূষণির কাক (দীর্ঘজীবী)**
- মগের মুল্লুক (অরাজক দেশ)**
- মণিকাঞ্চন যোগ (উপযুক্ত মিলন)**
- মন না মতি (অস্থির মানব মন)**
- মাছের মায়ের পুত্রশোক (কপট বেদনাবোধ)**
- মিছরির ছুরি (মুখে মধু অন্তরে বিষ)**
- যক্ষের ধন (কৃপণের কড়ি)**
- রাঘব বোয়াল (সর্পাসী ক্ষমতাসীন ব্যক্তি)**
- রাবণের চিতা (চির অশান্তি)**
- রাশভারি (গম্ভীর প্রকৃতির)**
- বুই-কাতলা (গদস্থ বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি)**
- লেফাফা দুরস্ত (বাইরের ঠাট বজায় রেখে চলেন যিনি)**
- শাঁখের করাত (উত্ত সংকট)**
- টাকায় বাঘের দুধ মেলে।
 - ‘গোড়ায় গলদ’ দ্রষ্টব্য।
 - ‘ইুকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বৃক্ষির টেকি।’
 - এই সামান্য কটা টাকা ব্যাঙের আধুলি আর কি।
 - জেল খাটা আসামিকে দেখাছ জেলের তয়- ব্যাঙের আবার সর্দি।
 - আমি কারো ভরাজুবি করিনি যে সবাই আমার বিশুদ্ধে লেগেছে।
 - জীবনভর ভূতের বেগার খেটে গেলাম, লাভ কিছুই হলো না।
 - সমাজে ভিজে বেড়ালদের চেনা সহজ নয়।
 - স্ত্রী, পুত্র, কল্যা— সবার মৃত্যুর পরও বৃদ্ধ ভূষণির কাকের মতো বেঁচে আছে।
 - এটা কি মগের মুল্লুক পেয়েছ যে যা খুশি তাই করবে?
 - যেমন বর, তেমনি কনে, একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ।
 - মানুষের মন তো বদলেই থাকে; কথায় বলে— ‘মন না মতি’।
 - নিজের পুত্রের মৃত্যুতে একফোটা চোখের পানি পড়ল না— অথচ অন্যের জন্য কাঁদছে, এ যে মাছের মায়ের পুত্রশোক।
 - শুনতে মধুর হলেও তার কথাগুলো মিছরির ছুরির মতো অন্তরকে বিদ্ধ করে।
 - যক্ষের ধনের মতো সে তার টাকাকড়ি আগলে আছে, এক পয়সাও দান করে না।
 - সমাজপত্রিকা রাঘব বোয়াল হয়ে গরিবের সর্বনাশ করে।
 - ‘রাবণের চিতাসম জঙ্গিছে হৃদয় মম।’
 - আমাদের বড় সাহেব খুব রাশভারি লোক, তাঁর সাথে বুঝেসুবো কথা বলো।
 - দেশের সুযোগ সুবিধা বুই-কাতলারাই বেশি ভোগ করে।
 - এই লেফাফা দুরস্ত লোকটিকে দেখে কি মনে হয় যে, ইনি কপৰ্দিকশূন্য?
 - সত্যকথা বললে বাবার ক্ষতি, আবার মিথ্যাকথা বললে মায়ের ক্ষতি, আমার হয়েছে শাঁখের করাতের অবস্থা।

- শাপে বর (অনিষ্টে ইষ্ট লাভ) — আমাকে ফেলে যাওয়ায় আমার রোজগার হলো হাজার টাকা—একেই বলে শাপে বর।
- সোনায় সোহাগা — ‘মণি কাখল যোগ’ দ্রষ্টব্য।
- সাক্ষী গোপাল (নিষ্ক্রিয় দর্শক) — তোমাদের এই পারিবারিক কলহে আমার সাক্ষী গোপাল হওয়া ছাড়া উপায় নেই।
- হাটে হাঁড়ি ভাঙা (গোপন কথা প্রকাশ করা) — আমাকে থাঁটিও না বলছি, তা হলে আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব।
- হাতটান (চুরির অভ্যাস) — দামি জিনিসপত্র সাবধানে রেখ, ছেলেটার হাতটান অভ্যাস আছে।
- হাড় হাতাতে (হতভাগ্য) — সব হারিয়ে ছেলেটি একেবারে হাড় হাতাতে এর কিছু হবে না।
- হালে পানি পাওয়া (সুবিধা করা) — ব্যবসায় অনেক চেষ্টাই তো করলাম, কিন্তু হালে পানি পেলাম না।

সমার্থক শব্দ

যেসব শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে, তাদের সমার্থক বা একার্থক শব্দ বলে। রচনার মাধ্যম সৃষ্টির জন্য অনেক সময় একটা অর্থকেই বিভিন্ন বাক্যে বিভিন্ন শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা প্রয়োজন হয়। কবিতায় এর প্রয়োগ বেশি। এখানে কতগুলো সমার্থক শব্দের উদাহরণ দেওয়া হলো :

অস্থকার	— আধার, তমসা, তিমির।	পৃথিবী	— অবনী, ধরা, ধরণী, ধরিত্বা, বসুন্ধরা, ভূ, মেদিনী।
আকাশ	— অস্মর, গগন, নতৎ, ব্যোম।	পর্বত	— অচল, অদ্রি, গিরি, পাহাড়, ভূধর, শৈল।
আগুন	— অগ্নি, অনগ্ন, পাবক, বহি, ঝুতাশন।	পিতা	— আববা, জনক, বাবা।
ঈশ্বর	— আল্লাহ, খোদা, জগদীশ্বর, ধাতা, বিধাতা, তগবান, সৃষ্টিকর্তা, স্রষ্টা।	পুত্র	— ছেলে, তনয়, লদন, সুত।
কান	— কর্ণ, শ্রবণ।	মাতা	— গর্ভধারণী, প্রসূতি, মা, জননী।
চূল	— অলক, কুস্তল, কেশ, চিকুর।	কোকিল	— পরাভূত, পিক।
চোখ	— অক্ষি, চক্ষু, নয়ন, নেত্র, লোচন।	গরু	— গো, গাভী, খেনু।
জল	— অস্মু, জীবন, নীর, পানি, সলিল।	চাঁদ	— চন্দ্ৰ, নিশাকর, বিশু, শশধর, শশাঙ্ক, সুধাখু, হিমাখু।
তীর	— কূল, তট, সৈকত।	রাজা	— নৃপতি, নরপতি, ভূপতি।
দিন	— দিবস, দিবা।	সূর্য	— আদিত্য, তপন, দিবাকর, ভাস্কর,
দেবতা	— অমর, দেব, সূর।		তানু, মার্ত্তন, রবি, সবিতা।
দেহ	— গত্ত, গা, তনু, শরীর।	স্বর্গ	— দেবগোক, দুঃগোক, বেহেশত।
ধন	— অর্থ, বিস্ত, বিভব, সম্পদ।		

নদী	- তটিনী, স্নোতস্বতী, স্নোতস্বিনী।	সাপ - অহি, আশীবিষ, নাগ, ফণী, ভুজঙ্গা,
নারী	- অবলা, কামিনী, মহিলা, স্ত্রীলোক, রামণী।	সর্প।
মৃত্যু	- ইল্লেকাল, ইহলীলা-সংবরণ, ইহলোক ত্যাগ, চিরবিদায়, জান্মাতবাসী হওয়া। দেহত্যাগ, পধন্ত্রপ্রাপ্তি, পরলোকগমন, লোকাস্তরগমন, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ, সর্গলাভ।	সমৃদ্ধ - অর্ণব, জলধি, জলনিধি, পারাবার, বারিধি, রত্নাকর, সাগর, সিন্ধু।
		হাত - কর, বাহু, ভুজ, হস্ত।

বাক্যে প্রয়োগ

- * ‘কী যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দৎশেনি যারে।’
- * ‘গগনে উদিল রবি লোহিত বরণ।’
- * দিবসে আলসে নিদ্রা অতি দূরশীয়।
- * অবলা সবলা আজ নহে তো দুর্বলা।
- * প্রচণ্ড মার্জন তাপে গলিছে তুষারপিণ্ড।

বিভিন্নার্থক শব্দ

একই শব্দের নানা প্রকার অর্থ থাকলে তাকে বিভিন্নার্থক শব্দ বলে। উদাহরণ-

- | | | |
|----------|--------------------------|---|
| ১। অঙ্ক- | (১) সংখ্যা | - টাকার অঙ্ক কত হবে? |
| | (২) আঁক | - অঙ্কটা কষ। |
| | (৩) চিহ্ন | - পদাঙ্ক (পদচিহ্ন) অনসুরণ কর। |
| | (৪) কোল | - শিশুকন্যাটিকে অঙ্কে নিয়ে জননী আদর করছেন। |
| | (৫) নাটকের প্রধান পরিচেদ | - এই নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি খুব করুণ। |
| ২। অচল- | (১) গতিহীন | - শরীর অচল হয়ে পড়েছে। |
| | (২) একনিষ্ঠ | - ইশ্বরে অচল ভক্তি হোক। |
| | (৩) যেকি, অব্যবহার্য | - এ অচল টাকা কে নেবে? |
| | (৪) অপ্রচলিত | - হাজার টাকার এই নোটটি অচল। |
| | (৫) নির্বাহ করা কঠিন | - অর্ধের অভাবে সংসার অচল হয়ে গেছে। |
| | (৬) পর্বত | - ‘উচল বলিয়া অচলে বাঢ়িনু পড়িনু অগাধ জলে।’ |

- ৩। অন্তর— (১) মন
 (২) অন্য
 (৩) ব্যবধান, পার্থক্য
 (৪) আত্মায়
- ‘অন্তর মম বিকশিত কর।’
 — তিনি দেশান্তরে গিয়েছেন।
 — এখান থেকে একঘণ্টা অন্তর বাস ছাড়ে।
 — ‘অন্তর মম বিকশিত কর, অন্তরতর হে।’
- ৪। কূট— (১) কৃটিল
 (২) জটিল
 (৩) কপট, জল
 (৪) পর্বতশৃঙ্গা
- তার কূট বৃদ্ধির সঙ্গে পারবে কেন?
 — এটা কূট প্রশংসন, উন্নত দেওয়া কঠিন।
 — কূট সাক্ষী সাক্ষ্য দিতে সে এসে ধরা পড়েছে।
 — পর্বতকূটে আরোহণ করা দুর্ভু।
- ৫। গুণ— (১) ধর্ম
 (২) ক্রিয়া
 (৩) উৎকর্ষ
 (৪) দাঙি
- দ্রব্যের গুণ জানতে হয়।
 — ওষুধে গুণ করেছে।
 — ভূমি তো নিজের গুণকীর্তন করছ।
 — মাখিরা নৌকার গুণ টেনে এসেছে।
- ৬। ধর্ম— (১) সৎকাজ, পুণ্যকাজ
 (২) সুনীতি
 (৩) সম্প্রদায় বিশেষের উপাসনাপদ্ধতি ইত্যাদি – প্রত্যেক ধর্মই মানুষের চরিত্রকে উন্নত করে।
 (৪) স্বভাব
- অহিংসা পরম ধর্ম।
 — এটা ধর্মসংগত কাজ।
 — মানুষ ও পশুর ধর্ম পৃথক।
- ৭। পক্ষ (১) দল
 (২) মাসার্ধ
 (৩) টাঁদের ক্ষয় বা বৃদ্ধি কাল
 (৪) পাথির ডানা
 (৫) বিয়ে সংখ্যা
- ভূমি কোন পক্ষে?
 — দুই পক্ষ নিয়ে এক মাস।
 — এখন শুক্লপক্ষ।
 — যাদের পক্ষ আছে তাদের পাথি বলে।
 — ছেলেটি তাঁর প্রথম পক্ষের সন্তান।

বিপরীতার্থক শব্দ

একটি শব্দের বিপরীত অর্থবাচক শব্দকে বিপরীতার্থক শব্দ বলে।

শব্দের পূর্বে সাধারণত অ, অন, অনা, অপ, অব, দুর, ন, না, নি, নির প্রায়ই না-বাচক বা নিষেধবোধক অর্থ প্রকাশ করে। তাই শব্দের বিরোধার্থক শব্দ তৈরিতে এই উপসর্গগুলো কিছুটা সাহায্য করে। তবে গঠনগত দিক থেকে শব্দের বিপরীতার্থক শব্দগুলো প্রায়ই মূল শব্দের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। উদাহরণ :

শব্দ	বিপরীতার্থক	শব্দ	বিপরীতার্থক
কাজ	অকাজ	সংগ্রহ	ব্যয়
উপচয়	অপচয়	উন্নত	অবনত, অনুন্নত
কৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞ, কৃতন্ত	উৎকর্ষ	অপকর্ষ
কেজো	অকেজো	ষশ	অপষশ
চেতন	অচেতন	সবল	দুর্বল
চেনা	অচেনা	সুকৃত	দুর্কৃত
জানা	অজানা	সুখ	দুঃখ
জ্ঞানী	অজ্ঞান	সুলভ	দুর্লভ
ধর্ম	অধর্ম	সুশীল	দৃঢ়শীল
নশুর	অবিনশ্বর	আসল	নকল
লক্ষ্মী	অলক্ষ্মী	আস্তিক	নাস্তিক
শাস্তি	অশাস্তি	আয়েক	নালায়েক
শিষ্ট	অশিষ্ট	ঝুত	নিখুত
শুভ	অশুভ	ঝোঁজ	নিখোঁজ
শ্রম্ভা	অপ্রাপ্য	বিরত	নিরত
অস্ত	অনস্ত	অস্তরঙ্গ	বহিরঙ্গ
স্থাবর	অস্থাবর, অঙ্গাম	আশা	নিরাশা
অতিবৃক্ষি	অনাবৃক্ষি	অথমর্গ	উত্তমর্গ
অভিজ্ঞ	অনভিজ্ঞ	অর্ধ	অনর্ধ
আচার	অনাচার	ধনী	নির্ধন, দরিদ্র
আত্মীয়	অনাত্মীয়	প্রবল	দুর্বল
আদর	অনাদর	রোগ	নীরোগ
আবশ্যিক	অনাবশ্যিক	সচেষ্ট	নিচেষ্ট
আবিল	অনাবিল	সদয়	নির্দয়
আস্থা	অনাস্থা	সম্বল	নিঃসম্বল
ইচ্ছা	অনিচ্ছা	সরস	নীরস
ইষ্ট	অনিষ্ট	সাকার	নিরাকার
উপস্থিত	অনুপস্থিত		

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	শব্দ	বিপরীতার্থক
আকর্ষণ	বিকর্ষণ	অঙ্গ	বিজ্ঞ
পথ	বিপথ	অনুরক্ত	বিরক্ত
বাদী	বিবাদী	অনুরাগ	বিরাগ
যুক্ত	বিযুক্ত	ডোবা	ভাসা
সফল	বিফল	তিরস্কার	পুরস্কার
সুশী	বিশী	উচ্চ	নিচ
স্মৃতি	বিস্মৃতি	উথান	পতন
ঠিক	বেঠিক	উদয়	অস্ত
তাল	বেতাল	উন্নতি	অবনতি
হাল	বেহাল	উর্ধ্ব	অধ
ইঁশ	বেইঁশ	এলোমেলো	গোছানো
অংশ	পচাং	ওঠা	নামা
অচল	সচল	ওস্তাদ	সাগরোদ
অনুকূল	প্রতিকূল	কুঁতিম	স্বাভাবিক
অন্তর	বাহির	কোমল	কর্কশ
অধম	উন্নত	ক্রয়	বিক্রয়
টুঁসাহ	নিরুৎসাহ	ক্ষুদ্র	বৃহৎ
অল	অধিক	খাটি	ভেজাল
দোষী	নির্দোষ	খাতক	মহাজন
আকুণ্ডন	প্রসারণ	খুচরা	পাইকারি
আগে	পিছে	খোলা	কল্প
আপদ	নিরাপদ	গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ
আপন	পর	গুরু	লঘু
আদান	প্রদান	গৃহী	সন্ম্যাসী
আদি	অন্ত	গ্রহণ	বর্জন
আবির্ভাব	তিরোভাব	ঘাটতি	বাঢ়তি
আমদানি	রপ্তানি	ঘাত	প্রতিঘাত
আয়	ব্যয়	চোর	সাধু
		চোখা	তোতা
		ছাত্র	অছাত্র
		জন্ম	মৃত্যু
		জয়	পরাজয়
		জড়	চেতন
		তোতা	ধারালো

শব্দ	বিপরীতার্থক	শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
আসল	নকল	উপকার	অপকার
ইতর	অন্তর	মান	অপমান
ইদানীং	তদানীং	ইহলোক	পরলোক
লঘু	গুরু	ইহা	উহা
লাভ	ক্ষতি, লোকসান	মি঳ন	বিরহ
ভেজী	নিষ্ঠেজ		
দাতা	গ্রহীতা	শত্ৰু	মিত্র
দিন	রাত	শীত্র	বিশুদ্ধ
দীর্ঘ	ক্রম	সত্য	মিথ্যা
দুষ্ট	শিষ্ট	সমষ্টি	ব্যাক্তি
দূর	নিকট	সার্থক	ব্যৰ্থ
দেওয়া	নেওয়া	সুস্মর	কৃৎসিত
দেনা	পানোনা	স্মৃতি	ধৰন
ধনী	নির্ধন, গরিব	স্থির	চপ্তল
নতুন	পুরাতন	মৃত্তি	বিমৃত্তি
নরম	শক্ত	স্বকীয়	পরকীয়
নিন্দিত	জাহ্নবি	স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র
নিষ্পদা	প্রশংসা	স্বর্গ	নরক
বন্ধন	মুক্তি	স্বাধীন	পরাধীন
বন্ধু	শত্ৰু	হৱণ	পূৱণ
বৰ	বৌ	হার	জিত
বৰ্ধমান	ক্ষীয়মান	হাঙা	ভারি
বড়	ছোট	হাসি	কান্দা
বাচল	স্বরভাষী	ত্রাস	বৃদ্ধি
জীবন	মৃগণ	জোয়ার	ভাটা
বেহেশত্	দোজখ	মুখ্য	গৌণ
বোকা	চালাক	টাটকা	বাসি
ব্যৰ্থ	সার্থক	মৃদু	প্রবল
ভয়	সাহস	ঠকা	জেতা
ভিতর	বাহির	রাজা	প্রজা
ভীতু	সাহসী	ঠাণ্ডা	গরম
ভীৱু	নির্ভীক	বুগ্ধ	সুস্থ
ভূত	ভবিষ্যৎ	জাগৱিত	নিন্দিত
উক্তি	দক্ষিণ	পূৰ্ব	পশ্চিম

বাক্যে বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োগ

- ◆ যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে।
- ◆ ব্যবসায়ে লাভ-ক্ষতি আছেই।
- ◆ জীবনে হাসি-কান্না পর্যায়ক্রমে আসে।
- ◆ সাগরে জোয়ার-ভাটা পানির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।
- ◆ হালকা আর ভারি যন্ত্রগুলো ধোয়ামোছা কর।
- ◆ ‘কোথায় সর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর?’
- ◆ এ জগৎ হরণ-পূরণের মেলা।
- ◆ খেলায় হার-জিত থাকবেই।
- ◆ পরাধীন হয়ে সুখতোগের চেয়ে স্বাধীন হয়ে দুঃখ ভোগ করাও ভালো।
- ◆ ছেলেটি বড়ই চঞ্চল, কিন্তু মেয়েটি কেমন ধীরস্থির।
- ◆ সবলের সদস্ত অত্যাচার দুর্বল আর কতদিন সইবে?
- ◆ সাহস দিয়ে ভয়কে জয় কর।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেকটি প্রশ্নের চারটি করে উত্তর দেওয়া হলো। ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

(১) ‘কার্যে বিরতি’ অর্থে কোন বাগ্ধারাটি প্রযোজ্য?

- | | |
|-------------|--------------|
| ক. হাত করা | গ. হাত গুটান |
| খ. হাত থাকা | ঘ. হাত আসা |

(২) ‘পছন্দ হওয়া’ অর্থে রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ কোনটি?

- | | |
|------------|--------------|
| ক. গৌঁ ধরা | গ. ম্যাও ধরা |
| খ. মনে ধরা | ঘ. পথ ধরা |

(৩) কোন বাগ্ধারাটির অর্থ ‘বেহায়া’?

- | | |
|-------------------|--------------|
| ক. চিনির বলদ | গ. কান কাটা |
| খ. জিলাপির পঁয়াচ | ঘ. ঠোঁট কাটা |

(৪) ‘সর্বনাশ’ বোঝাতে কোন বাগ্ধারাটি প্রযোজন?

- | | |
|---------------|-----------------|
| ক. ভরাডুবি | গ. পুরুর চুরি |
| খ. বালির বাঁধ | ঘ. মগের মুল্লুক |

(৫) কোন বাগ্ধারাটির অর্থ ‘সম্মান বাঁচানো’?

- | | |
|-------------|--------------|
| ক. মুখ ছোটা | গ. মুখ রক্ষা |
| খ. মুখ করা | ঘ. মুখ ধরা |

(৬) কেন বাগ্ধারাটির অর্থ ‘বিরাট আয়োজন?’

ক. কপাল ফেরা

গ. আধকপালে

খ. কড়ায় গড়ায়

ঘ. এলাহিকাউ

(৭) ‘এসপার ওসপার’ বাগ্ধারাটির অর্থ কী?

ক. এদিক অথবা ওদিক

গ. এই পাড়ে অথবা ওই পাড়ে

খ. মীমাংসা

ঘ. এ রকম অথবা ওই রকম

(৮) ‘গোবর গণেশ’ বাগ্ধারাটির অর্থ কী?

ক. গোবরের মতো আবর্জনা

গ. চালাক

খ. বোকা

ঘ. মুর্খ

(৯) ‘গোড়ায় গলদ’ বাগ্ধারাটির অর্থ কী?

ক. বেশি ভুল

গ. শুরুতে ভুল

খ. ভুল জিনিস

ঘ. অল্প ভুল

(১০) ‘গোল্লায় যাওয়া’ বাগ্ধারাটির অর্থ কী?

ক. নষ্ট হওয়া

গ. অসৎ কাজ করা

খ. খারাপ কাজে যাওয়া

ঘ. দোষের কাজ করা

২। বাংলা শব্দের ব্যবহারে বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ বলতে কী বোঝায়?

৩। শব্দের আভিধানিক অর্থের সঙ্গে তার ব্যবহারিক অর্থের যে ধরনের পার্থক্য দেখা যায়, তা উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর।

৪। বাগ্ধারা বা বাক্যরীতি বলতে কী বোঝা? ‘মুখ’ অথবা ‘হাত’ শব্দের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ দেখিয়ে পাঁচটি বাক্য রচনা কর।

৫। বিশেষ্যস্থানীয় ও বিশেষণস্থানীয় বাক্যাংশের প্রয়োগ দেখিয়ে চারটি করে বাক্য গঠন কর।

৬। নিম্নলিখিত রীতিসিদ্ধ বাক্যাংশগুলোর অর্থ পাশাপাশি লিখে দাও :

পাকা হাতের লেখা—

|

গায়ে বাতাস লাগা—

মাথা কাটা যাওয়া—

|

গা ঢেলে দেওয়া—

হাত গুটিয়ে বসা—

|

হাত দেওয়া—

হাতে পায়ে ধরা—

|

বুকে লাগা—

(৭) অর্থের পার্থক্য দেখাও

{ গা লাগা

{ নাম কাটা

{ ভাক দেওয়া

{ গায়ে লাগা

{ নামে কাটা

{ ভাকে দেওয়া

{ হাত আসা

{ মন করা

{ মাথা দেওয়া

{ হাতে আসা

{ মনে করা

{ মাথায় দেওয়া।

৮। ডানপাশে শব্দ দেওয়া আছে। তার উপর ভিত্তি করে বাগ্ধারা যোগে বী পাশের শূন্যস্থান পূরণ কর।

- (ক) লোকটার চোখের নেই। (লজ্জা)
- (খ) ভাইয়ের সঙ্গে সম্মতি। (ভীষণ গরমিল)
- (গ) এত শোকতাপের পরেও যে বেঁচে আছি তার কারণ আমার তো। (যা সহজে মরে না)
- (ঘ) লোককে বড় কাজের দায়িত্ব দিতে নেই। (অসাবধান)
- (ঙ) পরের টাকা হাতে পেলেই অনেক করে। (নষ্ট করা)
- (চ) এমন লোক কমই দেখা যায়। (নির্গত)
- (ছ) তোমার কান্তকারখনা দেখে আমি তো বনে গেছি। (স্তম্ভিত হওয়া)
- (জ) বাইরে ধর্মের কথা বলে বেড়ালেও লোকটা আসলে। (ডড়)
- (বা) ‘আমি তো তরী করি.....’ (সর্বনাশ)
- (এও) সমাজপতিরাই হয়ে গরিবের সর্বনাশ করে। (ক্ষমতাশালী ব্যক্তি)
- (ট) কে যেন আমার কলমটার করেছে। (অপহরণ)

৯। উভয় সারির সামঞ্জস্য বিধান কর।

- | | |
|-----------------|--------------------|
| (১) হাড় হাতাতে | (১) অবধা শুম |
| (২) ভূতের বেগার | (২) একঙ্গীয়ে |
| (৩) বালির বাঁধ | (৩) ক্ষণস্থায়ী |
| (৪) নেই আঁকড়া | (৪) অস্থায়ী বস্তু |
| (৫) তাসের ঘর | (৫) আশায় নৈরাশ্য |
| (৬) গুড়ে বালি | (৬) হতভাগ্য |

১০। নিম্নলিখিত বাগ্ধারাসমূহ দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা কর।

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| (১) অমাবস্যার টাঁদ | (১) কেঁচো থুঁড়তে সাপ |
| (২) আকাশ কুসুম | (১০) গজলিকা প্রবাহ |
| (৩) আবাঢ়ে গজ | (১১) তাসের ঘর |
| (৪) গোড়ায় গলদ | (১২) নয় ছয় |
| (৫) টাঁদের হাট | (১৩) বালির বাঁধ |
| (৬) চিনির বলদ | (১৪) রাশভারি |
| (৭) দুমুরের ফুল | (১৫) ঝুই কাতলা |
| (৮) কলুর বলদ | (১৬) হাতটান |

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাচ্য এবং বাচ্য পরিবর্তন

১. রবীন্দ্রনাথ ‘গীতাঞ্জলি’ লিখেছেন।
২. রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ‘গীতাঞ্জলি’ লিখিত হয়েছে।
৩. আমার খাওয়া হলো না।

ওপরের প্রথম বাক্যে কর্তার, দ্বিতীয় বাক্যে কর্মের, তৃতীয় বাক্যে ক্রিয়ার প্রাধান্য রয়েছে।

বাক্যের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশভঙ্গিকে বলা হয় ‘বাচ্য’।

বাচ্য প্রধানত তিন প্রকার : (১) কর্তৃবাচ্য (২) কর্মবাচ্য ও (৩) ভাববাচ্য।

কর্তৃবাচ্য : যে বাক্যে কর্তার অর্থ-প্রাধান্য রাখিত হয় এবং ক্রিয়াপদ কর্তার অনুসারী হয়, তাকে কর্তৃবাচ্যের বাক্য বলে। যেমন— ছাত্ররা অঙ্গ করছে।

১. কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়াপদ সর্বদাই কর্তার অনুসারী হয়।

২. কর্তৃবাচ্যে কর্তায় প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি এবং কর্মে দ্বিতীয়া, ষষ্ঠী বা শূন্য বিভক্তি হয়। যথা— শিক্ষক ছাত্রদের পড়ান। রোগী পথ্য সেবন করে।

কর্মবাচ্য : যে বাক্যে কর্মের সাথে ক্রিয়ার সম্বন্ধ প্রধানভাবে প্রকাশিত হয়, তাকে কর্মবাচ্য বলে। যেমন—
শিকারি কর্তৃক ব্যাস্ত্র নিহত হয়েছে।

১. কর্মবাচ্যে কর্মে প্রথমা, কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি ও দ্বারা দিয়া (দিয়ে), কর্তৃক অনুসর্ণের ব্যবহার এবং ক্রিয়াপদ কর্মের অনুসারী হয়। যথা— আলেকজান্ডার কর্তৃক পারস্য দেশ বিজিত হয়। চোরটা ধরা পড়েছে।

২. কখনো কখনো কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হতে পারে। যথা— আসামিকে জরিমানা করা হয়েছে।

ভাববাচ্য : যে বাচ্যে কর্ম থাকে না এবং বাক্যে ক্রিয়ার অর্থই বিশেষভাবে ব্যক্ত হয় তাকে ভাববাচ্য বলে।

১. ভাববাচ্যের ক্রিয়া সর্বদাই নাম পুরুষের হয়। ভাববাচ্যের কর্তায় ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া অথবা তৃতীয়া বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যেমন—

(ক) আমার (কর্তায় ষষ্ঠী) খাওয়া হলো না।

(নাম পুরুষের ক্রিয়া)

(খ) আমাকে (কর্তায় দ্বিতীয়া) এখন যেতে হবে।

(নাম পুরুষের ক্রিয়া)

(গ) তোমার দ্বারা (কর্তায় তৃতীয়) এ কাজ হবে না।

(নাম পুরুষের ক্রিয়া)

২. কখনো কখনো ভাববাচ্যে কর্তা উহ্য থাকে, কর্ম দ্বারাই ভাববাচ্য গঠিত হয়। যেমন-

এ পথে চলা যায় না।

এবার ট্রেনে ওঠা যাক।

কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

৩. মূল ক্রিয়ার সঙ্গে সহযোগী ক্রিয়ার সহযোগ ও বিভিন্ন অর্থে ভাববাচ্যের ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন- এ ব্যাপারে আমাকে দায়ী করা চলে না। এ রাস্তা আমার চেনা নেই।

বাচ্য পরিবর্তন

কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্য

নিয়ম : কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে-

(১) কর্তায় তৃতীয়া (২) কর্মে প্রথমা বা শুন্য বিভক্তি এবং (৩) ক্রিয়া কর্মের অনুসারী হয়।

আতব্য : কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া অকর্মক হলে সেই বাক্যের কর্মবাচ্য হয় না।

কর্তৃবাচ্য

(ক) বিদানকে সকলেই আদর করে।

(খ) খোদাতায়ালা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন।

(গ) মুবারক পুস্তক পাঠ করছে।

কর্মবাচ্য

(ক) বিদান সকলের দ্বারা আদৃত হন।

(খ) বিশ্বজগৎ খোদাতায়ালা কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছে।

(গ) মুবারক কর্তৃক পুস্তক পাঠিত হচ্ছে।

শক্তীয় : কর্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত তৎসম যিশ্রক্রিয়াটি কর্মবাচ্যে যৌগিক ক্রিয়াজাত ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়।

কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্য

নিয়ম : কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে ভাববাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে-

(১) কর্তায় বষ্টী বা দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং (২) ক্রিয়া নাম পুরুষের হয়। যেমন-

কর্তৃবাচ্য

(ক) আমি যাব না।

(খ) তুমিই ঢাকা যাবে।

(গ) তোমরা কখন এলে?

ভাববাচ্য

(ক) আমার যাওয়া হবে না।

(খ) তোমাকেই ঢাকা যেতে হবে।

(গ) তোমাদের কখন আসা হলো?

কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য

নিয়ম : কর্মবাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে—

(১) কর্তায় প্রথমা, কর্মে দ্বিতীয়া বা শুন্য বিভক্তি প্রযুক্ত হয় এবং (২) ক্রিয়া কর্তা অনুযায়ী হয়। যেমন—

কর্মবাচ্য

(ক) দস্যুদল কর্তৃক গৃহটি দুষ্টি হয়েছে।

(খ) হালাকু খী কর্তৃক বাগদাদ বিধ্বস্ত হয়।

কর্তৃবাচ্য

(ক) দস্যুদল গৃহটি দুষ্টন করেছে।

(খ) হালাকু খী বাগদাদ ধ্বস করেন।

ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য

নিয়ম : ভাববাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরিত করতে হলে—

(১) কর্তায় প্রথমা বিভক্তি প্রযুক্ত হয় এবং (২) ক্রিয়া কর্তার অনুসারী হয়। যেমন—

ভাববাচ্য

(ক) তোমাকে ইঁচ্টতে হবে।

(খ) এবার একটি গান করা হোক।

(গ) তার যেন আসা হয়।

কর্তৃবাচ্য

(ক) তুমি ইঁচ্টবে।

(খ) এবার (তুমি) একটি গান কর।

(গ) সে যেন আসে।

কর্মকর্তৃবাচ্য

যে বাক্যে কর্মপদই কর্তৃস্থানীয় হয়ে বাক্য গঠন করে, তাকে কর্মকর্তৃবাচ্যের বাক্য বলা হয়। যেমন—

কাজটা ভালো দেখায় না।

ঁাণি বাজে এ মধুর লগনে।

সুতি কাগড় অনেক দিন টেকে।

অনুশীলনী

১। ঠিক উন্নরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

(১) কর্মবাচ্যে কর্তার কোন বিভক্তি হয়?

ক. প্রথমা

গ. দ্বিতীয়া

খ. তৃতীয়া

ঘ. ষষ্ঠী

(২) ভাববাচ্যের কর্তায় কোন বিভক্তি হয়?

ক. ষষ্ঠী

গ. প্রথমা

খ. দ্বিতীয়া

ঘ. ষষ্ঠী বা দ্বিতীয়া

(৩) কর্তৃবাচ্যে কর্মে কোন বিভক্তি হয়?

ক. দ্বিতীয়া

গ. শূন্য

খ. ষষ্ঠী

ঘ. দ্বিতীয়া, ষষ্ঠী বা শূন্য

(৪) কর্মবাচ্যে কর্মে কোন বিভক্তি হয়?

ক. প্রথমা

গ. তৃতীয়া

খ. দ্বিতীয়া

ঘ. কখনো প্রথমা, কখনো দ্বিতীয়া

(৫) দোষী ছাত্রাটিকে জরিমানা করা হয়েছে। – এখানে ‘ছাত্রাটিকে’ কোন কারকে কোন বিভক্তি?

ক. কর্তায় দ্বিতীয়া

গ. করণে দ্বিতীয়া

খ. কর্মে দ্বিতীয়া

ঘ. অধিকরণে দ্বিতীয়া

(৬) কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া কী হলে কর্মবাচ্য হয় না?

ক. সমাপিকা

গ. সকর্মক

খ. অসমাপিকা

ঘ. অকর্মক

(৭) ভাববাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে বৃপ্তান্তরিত করলে কর্তায় কোন বিভক্তি হয়?

ক. দ্বিতীয়া

গ. তৃতীয়া

খ. প্রথমা

ঘ. ষষ্ঠী

(৮) ‘করিম পুস্তক পাঠ করছে।’ বাক্যটিকে কর্মবাচ্যে পরিণত করলে হবে—

ক. পুস্তক করিম কর্তৃক পাঠ হচ্ছে। গ. পুস্তক কর্তৃক করিম পঠিত হচ্ছে।

খ. করিম কর্তৃক পুস্তক পঠিত হচ্ছে। ঘ. করিম কর্তৃক পুস্তক পাঠ করছে।

(৯) তুমি কখন এলো? — বাক্যটিকে ভাববাচ্যে পরিণত করলে কোনটি হবে?

ক. তোমার দ্বারা কখন আসা হলো?

গ. তুমি দ্বারা কখন আসা হলো?

খ. তুমি কখন আসা হলো?

ঘ. তোমার কখন আসা হলো?

২। ‘বাক্যের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গিকেই বাচ্য বলা হয়।’ — এ উক্তিটির সমর্থনে বাক্যের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গিগুলির উদাহরণ দাও।

৩। কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের মৌলিক পার্থক্য সংক্ষেপে বুবিয়ে লেখ।

৪। বাক্যে উদাহরণ দাও।

ক) ভাববাচ্যের কর্তায় ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া অথবা তৃতীয়া বিভক্তি হতে পারে।

খ) কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া অকর্মক হলে তার কর্মবাচ্য হয় না।

ঘ) কর্তৃবাচ্যের তৎসম মিশ্রক্রিয়াটি কর্মবাচ্যে ক্রিয়াজ্ঞাত বিশেষণ (Participle) — রূপে ব্যবহৃত হয়।

৫। কর্মকর্তৃবাচ্য বলতে কী বোঝা? উদাহরণযোগে বিশদ আলোচনা কর।

৬। বাচ্যান্তর কর।

(ক) কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্য

- ক) আলেকজান্ডার পারস্য দেশ জয় করেন।
- খ) মহাকবি ফেরদৌসী শাহনামা মহাকাব্য রচনা করেছেন।
- গ) শিকারি বাঘ মেরেছে।
- ঘ) আমি বইটি পড়েছি।

(খ) কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য

- ক) কাফেলা দস্যুদল দারা আক্রান্ত হলো।
- খ) স্বপ্নতি ঈসা খুমীর তন্ত্রাবধানে তাজমহল নির্মিত হয়েছে।
- গ) বেদব্যাস কর্তৃক মহাভারত রচিত হয়েছিল।
- ঘ) পিতা কর্তৃক পুত্র বিভাগিত হয়েছে।

৭। কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে ভাববাচ্যে এবং ভাববাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন কর।

- ক) আমি একাই যাব।
- খ) এবার একখানা গান হোক।
- গ) আজ আর তোমার খাওয়া হবে না।

৮। বাচ্যের ব্যবহারে ভূল ধাকলে শুন্দ করে শেখ।

- ক) পিতা কর্তৃক আমি একটি কলম দান করা হইয়াছি।
- খ) আজি নিমুম রাতে কে বাঁশি বাজে।
- গ) তোমার যাওয়া হটক আমি যাওয়া হবে না।
- ঘ) ছাত্রগণ তোমাদিগ কর্তৃক ব্যাকরণের পাঠ শুনা হটক।
- ঙ) শাসন করা তাকেই সাজে, সোহাগ করে যে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উক্তি পরিবর্তন

কোনো কথকের বাক কর্মের নামই উক্তি। উক্তি দুই প্রকার : প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি।

যে বাকেয় বক্তার কথা অবিকল উদ্ধৃত হয়, তাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলে। যথা – তিনি বললেন, “বইটা আমার দরকার।”

যে বাকেয় বক্তার উক্তি অন্যের জবানিতে বুপাত্তিরিতভাবে প্রকাশিত হয়, তাকে পরোক্ষ উক্তি বলা হয়। যথা : তিনি বললেন যে বইটা তাঁর দরকার।

উক্তি পরিবর্তনের নিয়ম

১. প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার বক্তব্যটুকু উদ্ধরণ চিহ্নের (“ ”) অন্তর্ভুক্ত থাকে। পরোক্ষ উক্তিতে উদ্ধরণ চিহ্ন লোপ পায়। প্রথম উদ্ধরণ চিহ্ন স্থানে ‘যে’ এই সংযোজক অব্যয়টি ব্যবহার করতে হয়। বাকেয়ের সঙ্গতি রক্ষার জন্য উক্তিতে ব্যবহৃত বক্তার পুরুষের পরিবর্তন করতে হয়। যেমন-

প্রত্যক্ষ উক্তি : খোকা বলল, “আমার বাবা বাড়ি নেই।”

পরোক্ষ উক্তি : খোকা বলল যে, তার বাবা বাড়ি ছিলেন না।

২. বাকেয়ের অর্থ-সঙ্গতি রক্ষার জন্য সর্বনামের পরিবর্তন করতে হয়। যেমন-

প্রত্যক্ষ উক্তি : রশিদ বলল, “আমার ভাই আজ্ঞাই ঢাকা যাচ্ছেন।”

পরোক্ষ উক্তি : রশিদ বলল যে, তার ভাই সেদিনই ঢাকা যাচ্ছিলেন।

৩. প্রত্যক্ষ উক্তির কালবাচক পদকে পরোক্ষ উক্তিতে অর্থ অনুসারী করতে হয়। যেমন-

প্রত্যক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন, “কাল তোমাদের ছুটি থাকবে।”

পরোক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন যে, পরদিন আমাদের ছুটি থাকবে।

৪. প্রত্যক্ষ উক্তির বাকেয়ের সর্বনাম এবং কালসূচক শব্দের পরোক্ষ উক্তিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
এই	সেই	আগামীকাল	পরদিন	এখানে	সেখানে
ইহা	তাহা	গতকাল	আগেরদিন	এখন	তখন
এ	সে	গতক্ষণ্য	পূর্বদিন		
আজ	সেদিন	ওধানে	ঐখানে		

৫. অর্থ সঙ্গতি রক্ষার জন্য পরোক্ষ উক্তিতে ক্রিয়াপদের পরিবর্তন হতে পারে।

যেমন- প্রত্যক্ষ উক্তি রহমান বলল, ‘আমি এখনই আসছি’।

পরোক্ষ উক্তি : রহমান বলল যে, সে তখনই যাচ্ছে।

৬. আশ্চর্য খন্দ বাকেয়ের ক্রিয়ার কাল পরোক্ষ উক্তিতে সব সময় মূল বাক্যাধিশের ক্রিয়ার কালের উপর নির্ভর করে না।

ক) প্রত্যক্ষ উক্তি : ছেলেটি গিখেছিল, “শহরে খুব গরম পড়েছে।”

পরোক্ষ উক্তি : ছেলেটি গিখেছিল যে, শহরে খুব গরম পড়েছিল।

অথবা, ছেলে শিখেছিল শহরে খুব গরম পড়েছে।

খ) প্রত্যক্ষ উক্তি : করিম বলেছিল, “আমি বাজারে যাচ্ছি।”

পরোক্ষ উক্তি : করিম বলেছিল যে, সে বাজারে যাচ্ছে।

গ) প্রত্যক্ষ উক্তি : মনসুর বলল, “আমি ঢাকা যাব।”

পরোক্ষ উক্তি : মনসুর বলল যে, সে ঢাকা যাবে।

প্রত্যক্ষ উক্তিতে কোনো চিরন্তন সত্ত্বের উদ্ধৃতি থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে কালের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন-

ক) প্রত্যক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন, “পৃথিবী গোলাকার।”

পরোক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন যে, পৃথিবী গোলাকার।

খ) প্রত্যক্ষ উক্তি : বৈজ্ঞানিক বললেন, “চূম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।”

পরোক্ষ উক্তি : বৈজ্ঞানিক বললেন যে, চূম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।

৭। প্রশ্নবোধক, অনুজ্ঞাসূচক ও আবেগসূচক প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করতে হলে প্রধান খন্ডবাকের ক্রিয়াকে ভাব অনুসারে পরিবর্তন করতে হয়। যেমন-

প্রশ্নবোধক বাক্য

ক) প্রত্যক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন, “তোমরা কি ছুটি চাও?”

পরোক্ষ উক্তি : আমরা ছুটি চাই কি না, শিক্ষক তা জিজ্ঞাসা করলেন।

খ) প্রত্যক্ষ উক্তি : বাবা বললেন, “কবে নাগাদ তোমাদের ফল বের হবে?”

পরোক্ষ উক্তি : আমাদের ফল কবে নাগাদ বের হবে, বাবা তা জানতে চাইলেন।

অনুজ্ঞাসূচক বাক্য

ক) প্রত্যক্ষ উক্তি : হামিদ বলল, “তোমরা আগামীকাল এসো।”

পরোক্ষ উক্তি : হামিদ তাদের পরদিন আসতে (বা যেতে) বলল।

খ) প্রত্যক্ষ উক্তি : তিনি বললেন, “দয়া করে তেতরে আসুন।”

পরোক্ষ উক্তি : তিনি (আমাকে) তেতরে যেতে অনুরোধ করলেন।

আবেগসূচক বাক্য

ক) প্রত্যক্ষ উক্তি : লোকটি বলল, “বাঃ! পাখিটি তো চমৎকার।”

পরোক্ষ উক্তি : লোকটি আনন্দের সাথে বলল যে, পাখিটি চমৎকার।

খ) প্রত্যক্ষ উক্তি : তিখারিনী বলল, “শীতে আমরা কতই না কষ্ট পাচ্ছি।”

পরোক্ষ উক্তি : তিখারিনী দুঃখের সাথে বলল যে, তারা শীতে বড়ই কষ্ট পাচ্ছে।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেকটি প্রশ্নের চারটি উভয় দেওয়া হয়েছে। সর্বোন্মতিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

(১) খোকা তোমাকে বলল, “আমার বাবা বাড়ি নেই।” এর পরোক্ষ উক্তি হবে-

- ক. খোকা তোমাকে বলল যে, তার বাবা বাড়ি নেই।
- খ. খোকা তোমাকে বলল যে, তার বাবা বাড়ি ছিলেন না।
- গ. খোকা তোমাকে বলল যে তোমার বাবা বাড়ি নেই।
- ঘ. খোকা তোমাকে বলল যে, আমার বাবা বাড়ি ছিলেন না।

(২) রহমান আমাকে বলল, “আমি এক্সুণি আসছি।” – পরোক্ষ উক্তিতে হবে-

- ক. রহমান আমাকে বলল যে আমি এক্সুণি যাচ্ছি।
- খ. রহমান আমাকে বলল যে সে এক্সুণি আসছে।
- গ. রহমান আমাকে বলল যে, তুমি তক্ষুণি যাচ্ছ।
- ঘ. রহমান আমাকে বলল যে সে তক্ষুণি যাচ্ছে।

(৩) হামিদ বলল, “তোমরা আগামীকাল এসো।” – পরোক্ষ উক্তিতে হবে-

- ক. হামিদ তাদের পরদিন আসতে বলল।
- খ. হামিদ তাদের বলল যে তারা যেন আগামীকাল আসে।
- গ. হামিদ বলল যে তোমরা পরদিন এসো।
- ঘ. হামিদ তাদের বলল যে তারা যেন পরদিন আসে।

(৪) করিম তোমাকে বলল, “আমি গতকাল ঢাকা গিয়েছিলাম।” – পরোক্ষ উক্তিতে কী হবে?

- ক. করিম তোমাকে বলল যে সে গতকাল ঢাকা গিয়েছিল।
- খ. করিম তোমাকে বলল যে সে আজ ঢাকা গিয়েছিল।
- গ. করিম তোমাকে বলল যে, তুমি গতকাল ঢাকা গিয়েছিলে।
- ঘ. করিম তোমাকে বলল যে সে আগেরদিন ঢাকা গিয়েছিল।

(৫) রেবা আমাকে বলল, “ভাই, তুমি কবে এখানে আসবে?” – পরোক্ষ উক্তিতে হবে-

- ক. রেবা আমাকে ভাই সম্বোধন করে বলল যে আমি কবে এখানে আসব।
- খ. রেবা আমাকে ভাই সম্বোধন করে জানতে চাইল যে আমি কবে সেখানে যাব।
- গ. রেবা আমাকে ভাই সম্বোধন করে বলল যে আমি কবে সেখানে যাব।
- ঘ. রেবা আমাকে বলল, তুমি কবে সেখানে আসবে।

- ২। উক্তি বলতে কী বোঝা? উক্তি কয় প্রকার ও কী কী?
- ৩। প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তিত করতে হলে নিম্নলিখিত বিশেষ স্থলে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তা পাশাপাশি লিখে শূন্যস্থান পূরণ কর।
- প্রত্যক্ষ উক্তির..... উঠে যায় এবং প্রথম উদ্ধরণ চিহ্ন স্থানে সংযোজক অব্যয়টি বসাতে হয়।
 - প্রত্যক্ষ উক্তির সর্বনাম পদ পরোক্ষ উক্তিতে বাকের..... রক্ষা করে পরিবর্তন করতে হয়।
 - প্রত্যক্ষ উক্তির স্থানবাচক ও কালবাচক শব্দ পরোক্ষ উক্তিতে..... হয়।
 - প্রত্যক্ষ উক্তির প্রধান খঙ্গবাকেয়ের ক্রিয়া বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালের হলে পরোক্ষ উক্তিতে তা.....
..... কালের কিম্বা..... কালেরও হতে পারে।
- ৪। সংক্ষেপে জবাব দাও : প্রত্যক্ষ উক্তির কোন কোন স্থলে পরোক্ষ উক্তিতে কোনো পরিবর্তন হয় না?
- ৫। নিম্নলিখিত প্রত্যক্ষ উক্তিগুলো পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন কর।
- সে বলল, “তা কি হয়? তোমাকে এখন যেতে দিচ্ছে কে? দয়া করে আমার সঙ্গে চল।”
 - সেনাপাতি বললেন, “মহারাজ আমরা ধাকতে আপনি কেন যুদ্ধে যাবেন? আজই শত্রুদের বন্দি করে আনব। অনুগ্রহ করে আপনি আমাদের যেতে অনুমতি দিন।”
 - শিক্ষক বললেন, “পৃথিবী গোলাকার। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ণ শক্তির জন্যই ফল মাটিতে পড়ে।”
 - মা বললেন, “সুমন, দেরি না করে চলে এসো। পড়তে বসো। মন দিয়ে পড়ো। কাল তোমার পরীক্ষা মনে নেই?”
 - নিম্নুক শক্ষীছাড়া রাটাইল, “পাখি মরিয়াছে।” ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, “ভাগিনা, কী কথা শুনি।” ভাগিনা বলিল, “মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পূরা হইয়াছে।” রাজা শুধাইলেন, “ও কি আর জাফায়?” ভাগিনা বলিল, “আরে রাম।” “আর কি উড়ে?” “না।” “দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়?” “না।” রাজা বলিলেন, “একবার পাখিটাকে আন দেখি।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যতি বা ছেদচিহ্নের লিখন কৌশল

বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য বাক্যের মধ্যে বা বাক্যের সমাপ্তিতে কিংবা বাক্যে আবেগ (হর্ষ, বিষাদ), জিজ্ঞাসা ইত্যাদি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বাক্য-গঠনে যেভাবে বিরতি দিতে হয় এবং লেখার সময় বাক্যের মধ্যে তা দেখানোর জন্য যেসব সাধকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তা-ই যতি বা ছেদচিহ্ন।

নিচে বিভিন্ন প্রকার যতিচিহ্নের নাম, আকৃতি এবং তাদের বিরতি কালের পরিমাণ নির্দেশিত হলো:

যতিচিহ্নের নাম	আকৃতি	বিরতি-কাল-পরিমাণ
ক্যা	,	১ (এক) বলতে যে সময় প্রয়োজন।
সেমিকোলন	;	১ বলার দ্বিগুণ সময়।
দ্বাড়ি (পূর্ণচ্ছেদ)		এক সেকেন্ড।
প্রশ্নবোধক চিহ্ন	?	ঐ
বিশ্বায় ও সম্বোধন চিহ্ন	!	ঐ
কোলন	:	ঐ
ড্যাস	-	ঐ
কোলন ড্যাস	:-	ঐ
হাইফেন	-	থামার প্রয়োজন নেই।
ইলেক বা লোপ চিহ্ন	,	থামার প্রয়োজন নেই।
উচ্চরণ চিহ্ন	" "	‘এক’ উচ্চারণে যে সময় লাগে।
ব্র্যাকেট (বন্ধনী-চিহ্ন)	()	থামার প্রয়োজন নেই।
	{ }	থামার প্রয়োজন নেই।
	[]	থামার প্রয়োজন নেই।

যতি বা ছেদচিহ্নের ব্যবহার

১. ক্যা (পাদচ্ছেদ (,))

- ক) বাক্য পাঠকালে সুস্পষ্টতা বা অর্থ-বিভাগ দেখানোর জন্য যেখানে স্বল্প বিরতির প্রয়োজন, সেখানে ক্যা ব্যবহৃত হয়। যেমন— সুখ চাও, সুখ পাবে পরিশ্রমে।

- খ) পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত একাধিক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ একসঙ্গে বসলে শেষ পদটি ছাড়া বাকি সবগুলোর পরই কমা বসবে। যেমন— সুখ, দুঃখ, আশা, লৈরাশ্য একই মালিকার পুষ্প।
- গ) সম্বোধনের পরে কমা বসাতে হয়। যেমন— রশিদ, এদিকে এসো।
- ঘ) জাটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খণ্ডবাক্যের পরে কমা বসবে। যেমন— কাল যে লোকটি এসেছিল, সে আমার পূর্বপরিচিত।
- ঙ) উন্ধরণ চিহ্নের পূর্বে (খণ্ডবাক্যের শেষে) কমা বসাতে হবে। যেমন— সাহেব বললেন, “ছুটি পাবেন না।”
- চ) মাসের তারিখ লিখতে বার ও মাসের পর ‘কমা’ বসবে। যেমন— ১৬ই পৌষ, বুধবার, ১৩৯৯ সন।
- ছ) বাড়ি বা রাস্তার নম্বরের পরে কমা বসবে। যেমন— ৬৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১০০০।
- জ) নামের পরে ডিপ্লিসুচক পরিচয় সংযোজিত হলে সেগুলোর প্রত্যোকটির পরে কমা বসবে। যেমন— ডষ্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, এম.এ. পি-এইচ.ডি।

২. সেমিকোলন (;)

কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির প্রয়োজন হলে, সেমিকোলন বসে। যথা— সৎসারের মায়াজালে আবদ্ধ আমরা; এ মায়ার বাঁধন কি সত্যিই দুশ্চেদ্য?

৩. দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ ()

বাক্যের পরিসমাপ্তি বোঝাতে দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করতে হয়। যথা— শীতকালে এ দেশে আবহাওয়া শুষ্ক থাকে।

৪. প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?)

বাক্যে কোনোকিছু জিজ্ঞাসা করা হলে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে। যেমন— তুমি এখন এলে? সে কি যাবে?

৫. বিঅয় ও সম্বোধন চিহ্ন (!)

হৃদয়াকে প্রকাশ করতে হলে এ সম্বোধন পদের পরে (!) চিহ্নটি বসে। যেমন—

আহা! কী চমৎকার দৃশ্য।

জননী! আজ্ঞা দেহ মোরে যাই রণস্থলে।

কিন্তু আধুনিক নিয়মে সম্বোধন স্থলে কমা চিহ্নের ব্যবহার করা হয়।

৬. কোলন (:)

একটি অপূর্ণ বাক্যের পরে অন্য একটি বাক্যের অবতারণা করতে হলে কোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন—

সভায় সাব্যস্ত হলো : একবাস পরে নতুন সভাপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৭. ড্যাস চিহ্ন (-)

যৌগিক ও মিশ্র বাক্যে পৃথক তাবাগন্ন দুই বা তার বেশি বাক্যের সমন্বয় বা সংযোগ বোঝাতে ড্যাস চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন-

তোমরা দরিদ্রের উপকার কর- এতে তোমাদের সম্মান যাবে না-বাড়বে।

৮. কোলন ড্যাস (:-)

উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করতে হলে কোলন এবং ড্যাস চিহ্ন একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়। যেমন-পদ পাঁচ প্রকার:-

বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।

৯. হাইফেন বা সংযোগ চিহ্ন (-)

সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর জন্য হাইফেনের ব্যবহার হয়। যেমন- এ আমাদের শুল্ক-অভিনন্দন, আমাদের প্রীতি-উপহার।

১০. ইলেক (") বা লোপ চিহ্ন

কোনো বর্ণ বিশেষের লোপ বোঝাতে বিলুপ্ত বর্ণের জন্য (") লোপচিহ্ন দেওয়া হয়। যেমন-

মাথার ‘পরে ঝলছে রবি (‘পরে=ওপরে)

পাগড়ি বাঁধা যাচ্ছে কা'রা? (কা'রা=কাহারা)

১১. উন্ধরণ চিহ্ন (" ")

বক্ত্বার প্রত্যক্ষ উক্তিকে এই চিহ্নের অনুরূপ করতে হয়। যথা-শিক্ষক বললেন, “গতকাল তুরস্কে তরানক ভূমিকাপ্ল হয়েছে।”

১২. ক্রাকেট বা বৰ্ধনী চিহ্ন (), { }, || |

এই তিনটি চিহ্নই গণিতশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে প্রথম বৰ্ধনীটি বিশেষ ব্যাখ্যামূলক অর্থে সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন - ত্রিপুরায় (বর্তমানে কুমিল্লা) তিনি জনাগ্রহণ করেন।

ব্যাকরণিক চিহ্ন

বিশেষভাবে ব্যাকরণে নিম্নলিখিত চিহ্নগুলো ব্যবহৃত হয়।

(ক) ধাতু বোঝাতে (V) চিহ্ন : √স্বা =স্বা ধাতু।

(খ) প্রবর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে (<) চিহ্ন: জৌদরেল < জেনারেল।

(গ) পূর্ববর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে (>) চিহ্ন: গজা > গাঙ।

(ঘ) সমানবাচক বা সমস্তবাচক বোঝাতে সমান (=) চিহ্ন : নর ও নারী = নরনারী।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেকটি প্রশ্নের চারটি উভয়ের মধ্যে সর্বোক্তমটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

(i) বাক্যে কমা (,) থাকলে কতক্ষণ থামতে হয়?

ক. $\frac{1}{2}$ সেকেন্ড

গ. এক সেকেন্ড

খ. $\frac{3}{4}$ সেকেন্ড

ঘ. এক বলতে যে সময় লাগে

(ii) বাক্যে সেমিকোলন (;) থাকলে কতক্ষণ থামতে হয়?

ক. ১ বলতে যে সময় লাগে

গ. ১ সেকেন্ড

খ. ১ বলার দ্বিগুণ সময়

ঘ. ২ সেকেন্ড

(iii) বাক্যের শেষে দাঁড়ির পর কতক্ষণ খেমে পরের বাক্য পড়তে হয়?

ক. ১ সেকেন্ড

গ. ২ সেকেন্ড

খ. $1\frac{1}{2}$ সেকেন্ড

ঘ. সেকেন্ড

(iv) হাইফেন (-) এরপর কতক্ষণ থামতে হয়?

ক. ১ সেকেন্ড

গ. ২ সেকেন্ড

খ. $1\frac{1}{2}$ সেকেন্ড

ঘ. থামার প্রয়োজন নেই।

(v) সম্মোধনের পর কোন চিহ্ন বসে?

ক. সেমিকোলন

গ. দাঁড়ি

খ. কমা

ঘ. কোনো চিহ্নই নয়

(vi) ধাতু বোঝাতে কোন চিহ্ন বসে?

ক. <

গ. ✓

খ. -

ঘ. >

(vii) পূর্ববর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে কোন চিহ্ন বসে?

ক. >

গ. ✓

খ. <

ঘ. :

(viii) পরবর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে কোন চিহ্ন বসে?

ক. ✓

গ. >

খ. :

ঘ. <

- ২। যতিচিহ্ন বা ছেদচিহ্ন বলতে কী বোবা? বাংলা ভাষায় যতিচিহ্নের আবশ্যিকতা কী? সংক্ষেপে আলোচনা কর।
- ৩। আমরা বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে কী কী ছেদচিহ্নের ব্যবহার করে থাকি? প্রত্যেকটি চিহ্নের নাম, রূপ এবং তজ্জনিত বিভাগের কাল-পরিমাণ নির্দেশ কর।
- ৪। স্বরচিত বাক্যে ব্যবহার দেখাও :
- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| (ক) বিশ্বায় চিহ্ন ও সম্মোধন চিহ্ন | (গ) ড্যাস চিহ্ন ও হাইফেন চিহ্ন |
| (খ) উন্ধরণ চিহ্ন ও গোপ চিহ্ন | (ঘ) ধাতুর চিহ্ন ও সমানবাচক চিহ্ন। |
- ৫। সংক্ষেপে জবাব দাও :
- (ক) কোলন ও কোলন-ড্যাস চিহ্ন ব্যবহারের পার্থক্য কী?
 - (খ) সদেহ বা ব্যঙ্গ বোঝাতে তুমি কোন প্রকারের যতিচিহ্নের ব্যবহার করবে?
 - (গ) কোন কোন ক্ষেত্রে কমা চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়?
- ৬। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটিতে যতিচিহ্ন বসিয়ে আবার লেখ।
- প্রভাত হলো সোহরাব ময়দানে এসে হাঁকলেন ইরানশাহ কায়কাউস আমি প্রতিশোধ নিতে এসেছি ইরান শাহ চুপ কেন উন্মত্ত তবে কি ইরানী ফৌজে এমন পাহলোয়ান নেই যে আমার সঙ্গে অস্ত্র পরীক্ষা করতে পারে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছদ

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

স্বরভঙ্গি ও বাগ্নভঙ্গি

১. অ-নে-ক অ-নে-ক দিন আগে বাংলাদেশে বিজয় সিংহ নামে খুব সাহসী এক রাজপুত্র ছিলেন।
২. প্রকৃতি কী সুন্দর সাজেই না সেজেছে!
৩. তাঙ্গব ব্যাপার!
৪. দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?
৫. ‘আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে।’
৬. ‘দীর্ঘজীবী হও।’
৭. ‘সবারে বাস রে ভালো।’
৮. উঠে বস।

ওপরের প্রথম বাক্যটি বিবৃতিমূলক; দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্য দুটি বিঅয়সূচক; চতুর্থ বাক্যটি প্রশ্নসূচক; পঞ্চম বাক্যটি প্রার্থনামূলক; ষষ্ঠ বাক্যটি আশীর্বাদবোধক; সপ্তম বাক্যটি অনুরোধমূলক; অষ্টম বাক্যটি আদেশসূচক।

হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আবেগ-উচ্ছ্঵াস, অনুরোধ-প্রার্থনা, আদেশ-মিনতি, শাসন-তিরস্কার কঠস্বরের নানা ভঙ্গিতে উচ্চারণের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

বিশেষ জ্ঞান দিয়ে কথা বলা, কঠস্বরের উষ্টা-নামা, কাঁপন, টেনে টেনে শব্দ উচ্চারণ ইত্যাদির ধারা বাক্যের বিশেষ বিশেষ অর্থ ও ভাব প্রকাশ করা সম্ভব। বিভিন্ন ভঙ্গিতে কঠধ্বনি উচ্চারণের ফলে যে ধ্বনি-তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, তা নানা প্রকার ভাব ও অর্থ সৃষ্টি করে। এই ধ্বনি-তরঙ্গ বা স্বরভঙ্গাকে স্বরভঙ্গি বলে। এই স্বরভঙ্গিই বাগ্নভঙ্গির ভিত্তি।

স্বরভঙ্গির ধারা যে শব্দ ও বাক্য সৃষ্টি ও উচ্চারিত হয়, তাকে শিখিত আকারে এবং উচ্চারিত অবস্থায় বাগ্নভঙ্গি বলা যেতে পারে।

বাক্য নিয়ন্ত্রিত কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত হতে পারে।

১. **বিবৃতিমূলক বাক্য** (Assertive sentence) : সাধারণভাবে হ্যাঁ বা না বাচক বাক্য। বিবৃতিমূলক বাক্য দুই প্রকার হতে পারে : হ্যাঁবাচক বাক্য (Affirmative sentence) এবং না বাচক বাক্য (Negative sentence)।

উদাহরণ- হ্যাঁ বাচক বাক্য : সে ঢাকা যাবে। আমি বলতে চাই।

না বাচক বাক্য : সে ঢাকা যাবে না। আমি বলতে চাই না।

২. প্রশ্নসূচক বাক্য (Interrogative sentence) : এ ধরনের বাক্যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। যথা :

কোথায় যাচ্ছ? কী পড়ছ? কেন এসেছ? যাবে নাকি?

৩. বিমর্শসূচক বাক্য (Exclamatory sentence) : যে বাক্যে আশ্রয়জনক কিছু বোঝায় তাকে বিমর্শসূচক বাক্য বলে। যথা :

তাজব ব্যাপার! সমন্দের সে কী ভীষণ গর্জন, ঢেউগুলো পাহাড়ের ছড়ার মতো উঁচু- আমি তো ভয়ে মরি! হুররে, আমরা জিতেছি!

৪. ইচ্ছসূচক বাক্য (Optative sentence) : এ ধরনের বাক্যে শুভজনক প্রার্থনা, আশিস, আকাঙ্ক্ষা করা হয়। যথা :

তোমার মঞ্জল হোক। ঈশ্বর তোমাকে জয়ী করুন। পরীক্ষায় সফল হও। দীর্ঘজীবী হও।

৫. আদেশ বাচক বাক্য (Imperative sentence) : এ ধরনের বাক্যে আদেশ করা হয়। যথা :

শিক্ষক মহোদয় শ্রেণিকক্ষে এলে উঠে দাঁড়াবে। চুপটি করে বস। উঠে দাঁড়াও। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ কর।

স্বরভঙ্গ তথা বাগ্ভঙ্গের সাহায্যে ক্রোধ, আদর, আনন্দ, দৃঢ়ত্ব, বিরক্তি, বিমর্শ, সজ্জা, মৃণা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার অনুভূতি প্রকাশ করা যায়। যথা :

১. সাধারণ বিবৃতিতে : সে আজ যাবে।
২. জিজ্ঞাসায় : সে আজ যাবে?
৩. বিমর্শ প্রকাশে : সে আজ যাবে!
৪. ক্রোধ প্রকাশে : আমি তোমাকে দেখে নেব।
৫. আদর বোঝাতে : বড় শুকিয়ে গেছিস রে।
৬. আনন্দ প্রকাশে : বেশ বেশ, খুব ভালো হয়েছে!
৭. দৃঢ়ত্ব প্রকাশে : আহা, গাছ থেকে পড়ে পা ভেঙ্গেছে!
৮. বিরক্তি প্রকাশে : আঃ, ভালো লাগছে না, এখন এখান থেকে যাও তো।
৯. সৌভাগ্য প্রদর্শনে : যাবি কি না বল?
১০. সজ্জা প্রকাশে : ছিঃ ছিঃ, তার সজ্জা পারলে না।
১১. ধিক্কার দিতে : ছিঃ, তোমার এই কাজ।
১২. মৃণা প্রকাশে : তুমি এত নীচ।
১৩. অনুরোধ প্রকাশে : কাজটি করে দাও না ভাই।
১৪. প্রার্থনা : ঈশ্বর তোমার মঞ্জল করুন।

ছেদ ও বিরতিসূচক চিহ্নগুলো বাগ্ভঙ্গের লিখিত আকার প্রকাশে সাহায্য করে। দাঁড়ি, কমা, প্রশ্নবোধক ও বিমর্শসূচক চিহ্ন বাক্যের ভাব ও অর্থবোধের জন্য উপকারক।

অনুশীলনী

১। চারটি উভয়ের সর্বোভূমিটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(১) কোনটি আদেশসূচক বাক্য ?

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| ক. তোমাকে বসতে বলেছি। | গ. তুমি কি বসবে ? |
| খ. এখানে এস। | ঘ. বসলে খুশি হব |

(২) “সে কি যাবে” – এটি কী ধরনের বাক্য ?

- | | |
|-----------------|---------------|
| ক. আদেশসূচক | গ. বিবৃতিমূলক |
| খ. বিশ্বায়সূচক | ঘ. প্রশ্নসূচক |

(৩) “আমি তোমাকে মেহ করি।” এটি কী ধরনের বাক্য ?

- | | |
|---------------|-----------------|
| ক. প্রশ্নসূচক | গ. বিশ্বায়সূচক |
| খ. বিবৃতিমূলক | ঘ. আদেশমূলক ? |

(৪) কোনটি প্রশ্নসূচক বাক্য ?

- | | |
|----------------------|------------------|
| ক. কী খেলাই খেললে | গ. আমি খেলব না |
| খ. তুমি অবশ্যই খেলবে | ঘ. তুমি কি খেলেছ |

(৫) “তোমাকে আজই যেতে হবে।” এটা কী ধরনের বাক্য ?

- | | |
|------------------|---------------|
| ক. বিশ্বায়সূচক | গ. আদেশসূচক |
| খ. প্রার্থনামূলক | ঘ. বিবৃতিমূলক |

(৬) “কী সাংঘাতিক ব্যাপার !” – এটা কী ধরনের বাক্য ?

- | | |
|-----------------|---------------|
| ক. বিবৃতিমূলক | গ. প্রশ্নমূলক |
| খ. বিশ্বায়সূচক | ঘ. অনুরোধবাচক |

(৭) “কোথায় যাচ্ছ ?” – এটা কী ধরনের বাক্য ?

- | | |
|-----------------|---------------|
| ক. বিশ্বায়সূচক | গ. প্রশ্নমূলক |
| খ. বিবৃতিমূলক | ঘ. অনুরোধমূলক |

(৮) “এখানে এসো।”— এটা কী ধরনের বাক্য ?

ক. অনুরোধজ্ঞাপক

গ. বিবৃতিমূলক

খ. আদেশমূলক

ঘ. বিঅয়সূচক

(৯) বাগ্ভঙ্গি কী ?

ক. শব্দভঙ্গি

গ. নানা ভঙ্গিতে উচ্চারণ

খ. বাক্যভঙ্গি

ঘ. মুখভঙ্গি

(১০) কোনটি বিঅয়সূচক বাক্য ?

ক. কী করবে ?

গ. সকলের মঙ্গল হোক।

খ. জয়ী হও।

ঘ. কী সুন্দর ফুল!

২। স্বরভঙ্গি কাকে বলে ?

৩। বাগ্ভঙ্গি বলতে কী বোঝ ?

৪। বাগ্ভঙ্গি অনুযায়ী কয় প্রকার বাক্য গঠন সম্ভব ?

৫। বাগ্ভঙ্গির সাহায্যে কী কী ধরনের বাক্য গঠন করা যায় ?

৬। আদেশসূচক বাক্য কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

৭। বিঅয়সূচক বাক্য বলতে কী বোঝ ? এ ধরনের দুটি বাক্যের উদাহরণ দাও।

৮। বিবৃতিমূলক বাক্য কাকে বলে ? এ ধরনের বাক্য কয় প্রকার ও কী কী ? উদাহরণসহ লেখ।

৯। প্রার্থনামূলক বাক্য কাকে বলে উদাহরণসহ লেখ।

১০। ক্ষোধ প্রকাশক এবং আনন্দবাচক বাক্যের উদাহরণ দাও।

সপ্তম পরিচেছন
বাক্যে পদ সংস্থাপনার ক্রম
(Syntax)

বাক্যের অন্তর্ভুক্ত পদগুলো উপযুক্ত স্থানে বসানোই পদ সংস্থাপনার ক্রম। একে কেউ কেউ পদক্রম বলে থাকেন।

নিয়মাবলি

১. সাধারণ বাক্যের প্রথমে সম্প্রসারকসহ উদ্দেশ্য (বা কর্তা) এবং বাক্যের শেষে সম্প্রসারকসহ বিধেয় (বা ক্রিয়াপদ) বসবে। যেমন –

মনোযোগী	ছাত্ররাই	বীতিমত	পড়াশোনা করে।
(সম্প্রসারক)	কর্তৃপদ	(সম্প্রসারক)	(ক্রিয়াপদ)

কিন্তু বাক্যকে শক্তিশালী করার জন্য এর ব্যতিক্রমও হতে পারে। যেমন –

লোকটি ছিল অত্যন্ত চতুর।

২. সম্মত পদ বিশেষ্যের পূর্বে বসবে। যেমন – “ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে।”

অর্থ সংজ্ঞি রক্ষার জন্য বা ছন্দের অনুরোধে সম্মত পদ পরেও বসতে পারে। যেমন –
“হে আদি জননী সিদ্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার।”

৩. কারক-বিভক্তিযুক্ত পদ বা অসমাপিকা ক্রিয়াপদ বিশেষণের আগে বসে। যেমন –

লোকটি ব্যবহারে খুবই ভদ্র। রাজশাহীর আম খেতে চমৎকার।

৪. বিধেয় বিশেষণ সর্বদাই বিশেষ্যের পরে বসে। যথা : লোকটি যে জানী তাতে সন্দেহ নেই।

৫. বাক্যের প্রথমে কর্তা, পরে কর্ম এবং শেষে ক্রিয়াপদ বসে। যেমন – আমি ‘শাহনামা’ পড়েছি।

(ক) কবিতায় এর ব্যতিক্রম হতে পারে। যেমন – ‘লহ নমস্কার, সুন্দর আমার।’

(খ) বাক্যে জোর দিতে গেলেও নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে। যেমন – জানি, তোমার মুরোদ কতটুকু।

৬. বহুপদময় বিশেষণ অবশ্যই বিশেষ্যের পূর্বে বসে। যেমন – তোমার দাঁত বের-করা হাসি দেখলে সবাই পিণ্ড ছালে যায়।

বাক্যে ‘না’ বা ‘নে’ অব্যয়ের ব্যবহার

(ক) সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে। যথা – আমি যাব না। আমি ভাত খাই নে, ঝুঁটি খাই।

(খ) অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যথা – না চাইতে দানের কোনো মর্যাদা নেই।

(গ) বিশেষণীয় বিশেষণ রূপে বিশেষণের পূর্বে বসে। যেমন – না ভালো, না মন্দ।

(ঘ) ‘যদি’ দিয়ে বাক্য আরম্ভ করলে ‘না’ সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসে। মেয়ন : তুমি যদি আজ না যাও, তা হলে খুবই ক্ষতি হবে।

‘না’ (নঞ্চ ব্যতীত) অন্য অর্থে

ক. বিকল্পার্থে : জিঞ্জাসাবাচক বাক্যে – তুমি বাড়ি যাবে, না আমি যাব?

খ. অনুরোধ বা আদেশ অর্থে (নির্ধারিতভাবে বাক্যের শেষে) : একটা গান গাও না ভাই।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেকটি প্রশ্নের চারটি করে উভয় দেওয়া হলো। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উভয়টিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও:

(i) বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়াপদ কোথায় বসে?

ক. প্রথমে	গ. উদ্দেশ্যের পূর্বে
-----------	----------------------

খ. শেষে	ঘ. অব্যয় পদের পর
---------	-------------------

(ii) অসমাপিকা ক্রিয়াপদ বাক্যের কোথায় বসে?

ক. প্রথমে	গ. বিশেষণের পূর্বে
-----------	--------------------

খ. শেষে	ঘ. বিশেষ্যের পর
---------	-----------------

(iii) বাক্যে বিধেয়-বিশেষণ কোথায় বসে?

ক. প্রথমে	গ. বিশেষণের পূর্বে
-----------	--------------------

খ. শেষে	ঘ. বিশেষ্যের পর
---------	-----------------

(iv) বাক্যে বহুপদময় বিশেষণ কোথায় বসে?

ক. প্রথমে	গ. সর্বনামের পূর্বে
-----------	---------------------

খ. বিশেষ্যের পূর্বে	ঘ. শেষে
---------------------	---------

(v) ‘না’ শব্দটি বাক্যে কোথায় বসে?

ক. সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে	গ. অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে
----------------------------	--------------------------

খ. সমাপিকা ক্রিয়ার পরে	ঘ. বিশেষণের পরে
-------------------------	-----------------

(vi) বাকে কারক-বিভক্তিমুক্ত পদ কোথায় বসে?

- | | |
|-----------|-------------------|
| ক. প্রথমে | গ. বিশেষের পূর্বে |
| খ. শেষে | ঘ. বিশেষণের আগে |

(vii) সম্বন্ধ পদ বাকে কোথায় বসে?

- | | |
|--------------------|------------------|
| ক. বিশেষের পূর্বে | গ. বিশেষের পরে |
| খ. বিশেষণের পূর্বে | ঘ. বিশেষণের পরে। |

২। বাকে পদ সংস্থাপনের ক্রম বলতে কী বোঝা? এর উদ্দেশ্য কী? সংক্ষেপে বুঝিয়ে লেখ।

৩। বাকে পদ সংস্থাপনের ক্রম বিষয়ে পাঁচটি নিয়ম আলোচনা কর।

৪। ‘না’ অব্যয়টি যদি নওঃ ব্যতীত অন্য অর্থে বাকে প্রযুক্ত হয়, তবে সেটি কী কী অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে?
উদাহরণসহ আলোচনা কর।

৫। বাকে উদাহরণ দাও :

- (ক) বাকে জোর দিতে গেলে ক্রিয়াপদ বাকের প্রথমেও ব্যবহৃত হতে পারে।
- খ) স্থান ও কালের অর্থ বিশদভাবে বোঝানোই অধিকরণ কারকের উদ্দেশ্য, কাজেই বাকে অধিকরণ কারকের অবস্থানে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই।

২০১৮
শিক্ষাবর্ষ
৯-১০ ব্যাকরণ

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কারও মনে কষ্ট দিও না

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য